মা হওয়ার আগে ও পরে

বইয়ের সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের ও সংবাদপত্রের অভিমত

ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পালের **"মা হওয়ার আগে ও পরে"** বইখানিতে বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া যৌনমিলন, গর্ভসঞ্চার, সন্তান প্রসব—ইহার জন্য প্রস্তুতি এবং প্রসবান্তে ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, ডক্টর পাল শুধু বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসক নন, রস-সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এই বইখানিতে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে কোনও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এই বইখানি হইতে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্ধান পাইবেন। **বইখানির বহুল প্রচার হইলে সুখী হইব।**

Subodh Mitra

M. B. (Cal), Dr. Med. (Berlin) FRCS (Ed). FRCOG, FACS. FNI.

4, Chowringhee Terrace, Calcutta—20

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ডি. এস্-সি (এডিন) এম. এস্-সি. ; এম্-বি. (কলি), এম্. আর. সি. পি. ; এফ. আর. এস. ই. ; এফ. এন. আই.

আপনার **"মা হওয়ার আগে ও পরে"** বইখানি দেখিলাম। বইখানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। আজ আমাদের গভর্ণমেণ্ট পরিবার পরিকল্পনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি ব্যাপারে জ্ঞান যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—**কাত্যায়নী বুক ষ্টল,** ২০৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬

ইহা খুবই আশাপ্রদ। কিন্তু আপনাদের মত জনকতক মননশীল ব্যক্তি যে বহু পূর্ব হইতেই এবিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন এবং বহু বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও এ বিষয়ে প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন সে কথা সকলের কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করি।

স্ত্রীপুরুষ সঙ্গম যে কেবলমাত্র একটি দৈহিক ব্যাপার নহে এবং উহার উপর মানসিক স্বাস্থ্য যে বহু পরিমাণে নির্ভর করে তাহা আপনি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন। দৈহিক ব্যাপারটিও [illegible] সম্মতভাবে এবং প্রাঞ্জল ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সহবাস সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আপনি আলোচনা করিয়াছেন। আমি জানি অনেকের অনেক বিষয় জানিবার ইচ্ছা থাকে কিন্তু হয়ত লজ্জাবশতঃ কাহাকেও প্রশ্ন করিতে পারেন না। আপনার পুস্তকখানিতে সকল প্রশ্নেরই উত্তর আছে। চতুর্থ, অষ্টম এবং নবম অধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধেও প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানির দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমি একান্তভাবে কামনা করি যাঁরা মা হইবেন এবং হইয়াছেন তাঁহাদের সকলের হাতেই যেন এই বইখানি থাকে। তাঁহারা যদি মনোযোগ সহকারে ইহা পাঠ করেন এবং ইহার নির্দেশমত চলেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাদের সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

S. C. Mitra, M. A., D. Phil (Lip)
F. N. I. Professor of Experimental Physiology
University College of Science,
92, Upper Circular Road,
Calcutta.

"**মা হওয়ার আগে ও পরে**" কিছুকাল আগে ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের যৌনবিদ্যা বইটি পড়ার ও সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ হয়েছিল। যৌনবিদ্যা বিষয় বস্তু অতি বিস্তৃত। এই বিস্তৃত বিষয়ে যে অংশ মা হওয়ার সঙ্গে জড়িত, সেই অংশটুকু, ডাঃ পাল তাঁর এই নতুন বই "**মা হওয়ার আগে ও পরে**"-তে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন……।

মা হওয়া ও মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করা মেয়েদের জীবনে সর্বপ্রধান ও আমি বলব সর্বশ্রেষ্ঠ করণীয়। জীবনের এই প্রধান করণীয় বিষয় বিবাহ থেকে আরম্ভ করে গর্ভসঞ্চার, গর্ভিনীর স্বাস্থ্য, সন্তান প্রসব, শিশুপালন, শিশুর শিক্ষা পর্যন্ত সমস্তই লেখক অতি সুন্দর মনোজ্ঞ ভাবে আলোচনা করেছেন। আবশ্যক মতে ছবি দেওয়ার জন্য বক্তব্য অনেক বিষয় সহজেই বোধগম্য হয়েছে। যে কোন মেয়ে, যে বিবাহ করতে বা মা হ'তে যাচ্ছে তার পক্ষে বইটি অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি।

আমাদের দেশে দ্রুত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এত বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে ও গর্ভাধান নিয়ন্ত্রণের অধ্যায়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

আর একটি কথা বলি, লেখক তাঁর বিষয়-বস্তু অবতারণা করার জন্য যে উপক্রমণিকাটুকু লিখেছেন, তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। মা হওয়ায় গৌরব বিষয়; কিন্তু মা হওয়া ব্যাপারকে সাধারণ লোক অনেক সময়েই কি সংকীর্ণ চক্ষে দেখে এবং এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে দ্বিধা পায়। কিন্তু এই উপক্রমণিকাটুকু লেখক এমন এক উচ্চতর থেকে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লিখেছেন যে বইটি, যে কোন মা ও মেয়ে যে বয়সের হোক না, এক সঙ্গে বসে পড়তে পারে। শিশুকে মা কোথায়

পেল ? এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা কয়েক পংক্তি অতি সার্থকভাবে উদ্ধৃত করেছেন।

তুই দিলি সৌরবের মত মিলায়ে
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে দিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে

এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র, ডি. এস্. সি., এফ্. এন. আই.
মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ অধিকর্তা

মা হওয়ার আগে ও পরে

আলোচ্য পুস্তকখানির লেখক স্বয়ং একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। পুস্তকখানি তিনি "যাহারা মা হইয়াছেন, যাহারা হইতে চলিয়াছেন আর যাহারা ভবিষ্যতে হইবেন" তাঁহাদের করকমলে অর্পণ করিয়াছেন। পুস্তকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে উৎসর্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুপ্রজনন ও পরিবার, পরিকল্পনা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। লিখিবার প্রস্তাব হইতেই আলোচ্য পুস্তকের উদ্ভব। ডাঃ পাল বিশেষ সতর্ক সংযমের সঙ্গে এবং সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মনুষ্য সমাজের একটি অপরিহার্য সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাহা সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাতে বিবাহের উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য ও গর্ভাবস্থায় অবশ্য পালনীয় নিয়ম, নরনারীর শারীরিক পরিচয় এবং পরিশেষে শিশুর খাদ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। **বইখানি পাঠে ও সংরক্ষণে সকলেই নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবেন।**

দৈনিক আনন্দবাজার

—হ্যাঁ। বাইরে থেকে পুরুষ যখন ঘরে ফেরে তখন নারীর হাতে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয় ;—আজ তো আর আপনি জেলে নেই ; আজ আমার হাতে বন্দী।

কথাটা বড় বেশি মিষ্টি লেগেছিল উমাশঙ্করের কানে··· সুধাবৎ মিষ্টি। কিন্তু এই সাবলীল বাচনভঙ্গীকে আঘাত করবার জন্যই তিনি বলেছিলেন,

—বন্ধনকে অস্বীকার করবার জন্যই আমাদের সাধনা, ইলা দেবী, আমরা কোথাও বন্দী হই নে—মুক্তির মার্গই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।

ইলার মুখের আলোটা মুহূর্তের জন্য নিবুনিবু হয়ে গিয়েছিল, মনে পড়ে, তারপরই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখের দীপ্তি, মুখের রেখা-সুষমা।

—নারীর বন্ধনকে অস্বীকার করা পুরুষের সাধ্যাতীত! আপনি যদি সেটা পারেন, তাহলে বোঝা যাবে, আপনি হয় অতি মানুষ না হয় অমানুষ।

—ও দু'টোর কোনোটাই নই। আমি সাধারণ মানুষ, দেশমাতার বন্ধন মোচনের চেষ্টায় হয়তো সময় সময় অতিমানুষ বা অমানুষের কোঠায় আমাদের উঠতে হয়; কিন্তু সেইটাই আমাদের সত্য স্বরূপ নয়—এ কথা সত্যি।

—তাহলে নারীর হাতে আপনাদের বন্ধনটাও সত্যি ; আজ না হয়, একদিন সত্যি হবে—বলে হেসে চলে গিয়েছিল ইলা ওকে ঘুমুতে দিয়ে। ঘুম আসে নি বহুক্ষণ—বহুক্ষণ ধরে ভেবেছিলেন তিনি—কোনো বন্ধনকে, কারো বন্ধনকে তিনি

থাকার করবেন না জীবনে। করেনও নি; কিন্তু—প্রকাণ্ড নিশ্বাসটা চেপে চেপে পড়লো বৃদ্ধের বুক থেকে, সত্যি কি তিনি আজও মুক্ত?—নাকি অন্তরের গোপন পুরে একান্ত অসহায়ভাবে তিনি বন্দী?—আত্মপ্রতারণা করবার কীই বা দরকার আজ! তিনি বন্দী—এবং এ বন্ধনকে স্বীকার করতে লজ্জা নেই আজ আর। অথচ এই বন্ধনের অসীম মাধুর্যটিকে জীবনের একটা দিনের জন্যও উপভোগ করতে পারলেন না তিনি। এটা তাঁর দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, কে বলে দেবে? জীবনের খাতার শেষ হিসাব নিকাশ করবার জন্য ইলা আজ আর আসবে না; তিনি নিজেও সে হিসাব করতে পারবেন না; কিন্তু আজ সারা মনপ্রাণ জুড়ে যেন ব্যথা-বেদনার আর্তনাদ জাগছে—তিনি বন্দী, অথচ সেটা অকারণ অস্বীকার করেছেন। স্বীকার করার মধ্যে যে ঔদার্য এবং মাধুর্য ছিল, তাকে অবহেলায় হারিয়েছেন,—ভুল, নির্বুদ্ধিতা, আত্মম্ভরিতার শাস্তি!

নিজেকে আর একবার সংবৃত করে তুললেন উমাশঙ্কর। অলক্ষণ নিবে যাওয়া গড়গড়ার নলটা ধরে টান দিলেন—শুধু জলের শব্দ আর নেবানো তামাকের বিশ্রী গন্ধ—ফেলে দিলেন নলটা! মনের কোনায় কোনায় বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এই বিরক্তিকে আরো অধিকমাত্রায় সঞ্চিত হতে দিলে অস্বস্তি চরম হয়ে উঠবে। তাই উঠে দাঁড়ালেন—বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টায় ঘরের বাইরে এলেন; পল্লীপথে কোনো লোক চলছে না—ডেকে যার সঙ্গে কথা বলে মনটা ঠিক করতে

পারেন। দূরে ধানক্ষেতে শীষগুলো ঢেউ খেলে দুলছে দেখতে লাগলেন—আরো দূরে—এখান থেকে তিন মাইল দূরে স্টেশন; ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, দশটার ট্রেনটা এইমাত্র চলে গেল—কলকাতা যাবার ট্রেন। একটু আগে তিনি ঐ ট্রেন ধরেই ইলার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা ভাবছিলেন। যদি যেতেন, তাহলে কি হাস্যকর ব্যাপারই না হতো! কী লজ্জাকর ব্যাপার। তাঁর পৌরুষকে পদদলিত করে ইলা দেবী হয়তো দেখাই করতেন না—কিংবা ঘণ্টাখানেক নীচের ঘরে একলা বসিয়ে রেখে সাজগোজ করে নীচে এসে বলতেন—"শঙ্করদা' যে—খবর ভালো? সিনেমায় যাচ্ছি দাদা, বড় ব্যস্ত, কিছু মনে করবেন না; আর একদিন আসবেন সময় করে, সেদিন কথা হবে—" চলে যেতো ইলা ক্যাডিলাক মোটরে চড়ে—স্বামী পুত্র কন্যা সমভিব্যবহারে। তার স্বরচিত প্রকাণ্ড সংসারের সৌন্দর্য-মাধুর্যের সুখস্বপ্নটা প্রকাশ করে যেত।

হ্যাঁ—সংসার সে রচনা করেছে একটা—একখানি সুন্দর মিলনান্ত কাব্য যেন। বিরাট ব্যবসায়ী স্বামী—ব্ল্যাকমারকেটের কল্যাণে কোটিপতি আর পুত্রটি বাপের যোগ্য উত্তরাধিকারী; বর্তমানে তিনটে সিনেমা হাউস চালাচ্ছে; কলকাতায় দু'টো, মফঃস্বল-শহরে একটা। বাংলার বাইরেও তৈরি হচ্ছে একটা। কন্যা দু'টি—অনুভা আর অরুন্ধতী। অনুভা বেশ বড় হয়ে উঠেছে; বছর বিশ হওয়া উচিত তার বয়স—উমাশঙ্কর হিসাব করতে লাগলেন—উনিশ শ, একুশ সালে যখন অসহযোগ

আন্দোলন শুরু হোলো, উমাশঙ্কর জেলে গেলেন—সেই বছরই বিয়ে হয় ইলার; শঙ্কর তখন জেলে। মাধব কিন্তু সেবার আর জেলে যায় নি—সে সুকৌশলে চাকরি নিয়ে বেঁচে গিয়েছিল—বেশ মোটা মাইনের চাকরি, কলকাতার কর্পো-রেশনের চাকরি। স্বদেশী প্রতিষ্ঠানে স্বদেশসেবককে সসম্মানে গ্রহণ করা হচ্ছিল তখন। ভাল মুরুব্বির জোর ছিল মাধবের, তাই মিঃ এম. সি. চক্রবর্তি রূপে মাধব একেবারে অফিসার গ্রেডেই ঢুকে গিয়েছিল; তার পর এই বছরগুলোর মধ্যে সে ফুলে ফেঁপে বিন্ধ্যাচল হয়ে উঠেছিল একেবারে। ঐ সুযোগ উমাশঙ্করের কাছেও এসেছিল—এবং সেটা গ্রহণ করলে আজ নিশ্চয় ইলাও তাঁর অঙ্কশায়িনী হয়ে একটা ভাল মিলনান্ত সংসারকাব্য রচনা করতে পারতো; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা নয় কিংবা স্বয়ং উমাশঙ্করেরই ইচ্ছা ছিল না সংসারকাব্য রচনা করবার। তিনি সগর্বে অস্বীকার করলেন। জানিয়ে দিলেন, দেশমাতার মুক্তিই তাঁর কাম্য—সংসারকাব্য রচনা করবার জন্য তিনি ভারতমাতার কোলে জন্মান নাই। কিন্তু আশ্চর্য! প্রথম দিনের সেই ইলা সেদিন বলেছিল—ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে শঙ্করদা'—মানুষ চিরদিন যুদ্ধ করতে পারে না। তার একটা বিশ্রামের নীড় দরকার হয়।

—না—যোদ্ধা ক্লান্ত হলে ট্রেঞ্চেই বিশ্রাম করতে পারে—বড়জোর তাঁবুতে!

—কিন্তু ট্রেঞ্চ বা তাঁবু যুদ্ধক্ষেত্রের বস্তু শঙ্করদা'—ঘরে-ফেরা সৈনিকের জন্য ঘর দরকার—যে-ঘর পত্নীর সেবায়, পুত্রকন্যার

স্নেহে, পরিজনের আনন্দ-বেদনায় উচ্ছ্বসিত, মানুষের সেই ঘর দরকার হয় শঙ্করদা'।

—সকল মানুষের হয় না—সগর্বে উত্তর দিয়েছিলেন উমাশঙ্কর এবং শ্লেষসূচক স্বরে বলেছিলেন—বিপ্লবী মাধবের বোন ইলা দেবীর মুখে ওকথা মানায় না।

—কারো বোন হবার গৌরব রাখবার জন্য আমি আত্ম-প্রতারণা করবো না শঙ্করদা'—আমি ইলা—আর ইলা হয়েই আমি আমার সত্তাকে বিকশিত দেখতে চাই। আমি পরিপূর্ণ হবো আমার নারীত্ব, আমার মানবীয় কোমলত্ব আর স্থিতিশীলতা দিয়ে।

—অর্থাৎ একটা সুন্দর সংসার রচনা করে। কেমন! শঙ্কর বিদ্রূপ করেছিলেন।

—হ্যাঁ—তাই! যুদ্ধক্ষেত্রের ঘোড়া হয়ে সৈনিকদের বয়ে বেড়াবার কাজ আমার নয়—আমি গৃহদীপ—ঘরে যেটুকু পারি আলো জ্বেলে রাখবো।

—তোমার দীপের পিল্‌সুজ আমি হতে পারলাম না ইলা—মাফ করো।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ইলার উজ্জ্বল মুখখানা—মনে পড়ে গেল! এতক্ষণ এতো চেষ্টা করেও যে-মুখ উমাশঙ্কর মনে আনতে পারেন নি—এমন অকস্মাৎ সে মুখ যেন অসীম বিষণ্ণতার অন্ধকারে বিষাদের মত ফুটে উঠলো তাঁর মনের চোখে। প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তিনি মনের পটের সেই মূর্তি দেখতে লাগলেন—ষোড়শ বর্ষীয়া ইলা—পূর্ণযৌবনা

—তন্বঙ্গী—সুষমাময়ী—কিন্তু সেই মুহূর্তের ইলা ছিল কঠিন রোগাক্রান্ত, পাণ্ডুর চন্দ্রমার মত—উমাশঙ্কর সেদিন সে মুখ দেখেও দেখেন কি! উনি চলে গিয়েছিলেন বাইরে।

তারপর আর দেখা হয় নি ইলার সঙ্গে—কতদিন—কত দীর্ঘ দিন, মাস, বৎসর পার হয়ে গেল। এমন করে ইলার কথাও ভাবেন নি কোনো দিন—তবে খবর জানেন;—তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়। তার ছেলেকেও চেনেন,—আর চেনেন অনুভাকে—কয়েকবারই দেখেছেন।

ওরা শহরের বিত্তশালীদের চক্রেই অবস্থিত—তবু উমাশঙ্করের সঙ্গে মিঃ অশোক ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎ হয়—কারণ উমাশঙ্কর এখন কংগ্রেসের সেবক; সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে আলোচনা করছেন—সাম্যবাদ নিয়ে গবেষণা করছেন—দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ বরাবর গ্রহণ করে আসছেন; আর বর্তমান যুগের ব্ল্যাকমার্কেটের ধনীগণ এদের সঙ্গে বিশেষরকম পরিচয় রাখতে চান—নইলে তাঁদের কাজ কারবারের ঘোরতর অসুবিধা হয়ে পড়ে। মিঃ অশোক ভট্টা এই জন্যই দরিদ্র উমাশঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মাঝে মধ্যে বলেন—

—একদিন চলুন না দাদা বাড়ির দিকে; আপনার বোন যে আমাকে অস্থির করে তুললো আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য।

—আচ্ছা, যাব একদিন—একটু সময় করে নিই।

কিন্তু দীর্ঘদিন যাওয়াই আর হয়ে উঠছে না—অর্থাৎ যান না উমাশঙ্কর ইচ্ছা করেই! অনুভাও বাপের সঙ্গে কয়েকবার

এসে বলেছে—চলুন না মামাবাবু—মা আপনাকে কতবার যে যেতে বলেন—আপনি কিছুতেই যান না—কেন, বলুন তো ?

—যাব মা, যাব—একটু সময় পেলেই যাব একদিন—বলে শঙ্করমামা পাশ কাটান। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, একদিন তিনি যাবেনই, আর সেই একদিন খুব শীঘ্রই, হয়তো আগামী কালই হবে। হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হবেন তিনি ইলার বালীগঞ্জের বিরাট বাড়িতে। হ্যাঁ—কালই মন্দ কি? কাল সকালেই যাবেন তিনি। ডাক দিলেন—

—নন্দিতা !—

—যাই দাদা !—

পঁয়তাল্লিশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে এসে দাঁড়ালো। বললো—ডাকছো দাদা ?

—হ্যাঁ—কাল কলকাতা যাব নন্দু—কাপড় জামা সব ঠিক করে দিস্ !

—আচ্ছা ! এখন একটু কিছু খাবে দাদা ? সকাল থেকে কি যে ভাবচো !

—কি খাব—চা ? তা দে এককাপ !

নন্দিতা ভেতরে গেল। উমাশঙ্করের বৈমাত্রেয় ভগ্নী। ঐ একটি মাত্র মেয়ে প্রসব করেই বিমাতা স্বর্গে যান। উমাশঙ্করের বাবাই ওকে মানুষ করেন। বিয়ে দেন, তারপর স্বর্গে যাবার আগেই নাতির মুখ দর্শনও করতে পেরেছিলেন, উমাশঙ্কর তখন সপ্তমবার জেলে। পিতৃশ্রাদ্ধ করবার ছুটি দেওয়া হয়নি তাঁকে। বেরিয়ে এসে বোনকে আর ভাগ্নেকে দেখেন। সে তখন

দু'বছরের। তারও দীর্ঘদিন পরে যখন উমাশঙ্কর দ্বাদশ দফায় জেল ভোগ করছেন, তখন খবর পেলেন, বোন বিধবা হয়েছে, ভাগনে অবশ্য আঠার উনিশ বছরের, কিন্তু মামার মতই স্বভাব তার ; এখনো জেলে আছে।

বোনের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে হোল এবার উমাশঙ্করকে। প্রকৃতির বিধান। চিরমুক্ত উমাশঙ্কর বন্দী হয়ে গেলেন। পৈত্রিক সম্পত্তিতে তার কিছুই অংশ নাই, সবই বিমাতার নামে দানপত্র করা ; কাজেই বোনের, কিন্তু দেখে কে ? বোন অসামান্যা সুন্দরী এবং বয়সও তখন ত্রিশের কোঠায় ; কাজেই উমাশঙ্করের আর জেলে যাওয়া হোল না—সেই থেকে তিনি গৃহবন্দী। অবশ্য রাজনৈতিক জীবন তিনি ত্যাগ করেন নি তবে এখন আর বিপ্লবী নয় ; অহিংসবাদী কংগ্রেস সেবক। আগস্ট আন্দোলনের সময় তাঁর জেল হতে হতে হয়নি কিন্তু ভাগিনেয় জেলে গেছে, এখনো ফেরেনি ; ভাগনের মধ্যে মামা যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। উমাশঙ্কর বলেন—মানুষ ছেলে খোঁজে নিজেকে তার মধ্যে রাখবার জন্য ; আমি ভাগনের মধ্যেই আমাকে রেখে যাব।

নন্দিতা হেসে বলে,—তা ঠিক দাদা, তোমার মতনই সাংঘাতিক হয়ে উঠলো।

বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বলে চেনা যায় না ; মার পেটের বোনের মতনই নন্দিতা, বরং আরো বেশী স্নেহমমতাপরায়ণা। হয়তো বৈমাত্রেয়ত্ব ঢাকবার জন্য কিছুটা স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টা আছে তার মধ্যে—তবু স্বীকার করতে হবে, নন্দিতা খুবই ভাল বোন।

চা নিয়ে এল দাদার জন্যে। উমাশঙ্কর পান করতে লাগলেন দাঁড়িয়ে।

বালীগঞ্জের বিরাট প্রাসাদের গেটে এসে দাঁড়ালেন উমাশঙ্কর। এ বাড়িতে উনি আর কখনো আসেন নি; নম্বর ঠিকানা অবশ্য জানা ছিল, আসতে কোনো অসুবিধা ঘটলো না—এসেছেন মোটরে নয়—ট্রামে।

সকালে পৌঁছেছিলেন তিনি আরপুলী লেনের একটা মেসে, তাঁর এক বন্ধু থাকেন সেখানে। তাঁরই কাছে উঠেছিলেন, স্নানাহার করে বিশ্রামও করেছেন সেই মেসেই—বন্ধুটি কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সারাদিন বন্ধুর ভাঙ্গা চৌকিতে শুয়ে তিনি ভেবেছেন বালীগঞ্জে যাবেন কি যাবেন না। যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তিনি গতকাল ইলার সঙ্গে দেখা করবার মতলব করেছিলেন, আজ কলকাতা পৌঁছার পর, সেটা ক্রমশ নিবে আসছে—আশ্চর্য মানুষের মন। একটু যেন ভয়ভয়ই করছিল তাঁর; অথচ ভয়ের কোনো কারণই নেই। ইলা আর যাই করুক—তাঁর অসম্মান করবে না, অপমান তো নয়ই।

হয়তো তাঁর লজ্জাটা ভয়ের মত প্রতিভাত হচ্ছে। এত দীর্ঘ দিন পরে প্রেমাস্পদার সঙ্গে সাক্ষাৎ—প্রেমাস্পদা! চমকে উঠলেন উমাশঙ্কর আপন অন্তশ্চেতনায়। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই। তাঁর কৌমার্যপূতঃ সুদীর্ঘ ষাট বছরের জীবনে একজন প্রেমাস্পদা আছে—সে ইলা।

উমাশঙ্কর আরপুলী মেসের মধ্যে লাল হয়ে উঠতে গিয়ে
কালো হয়ে উঠলেন একবার ; তারপর তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ
মুছে, ধোয়া খদ্দরের ধুঁতি-পাঞ্জাবী-চাদর পরে বেরিয়ে এসে ট্রাম
ধরলেন কলেজ স্ট্রীটে। বালীগঞ্জে যখন তিনি পৌঁছালেন,
একটা দোকানের ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে দশ মিনিট।

প্রকাণ্ড গেট, সামনে ফুলবাগান—অর্ধচন্দ্রকারে পথ গিয়ে
বাড়ির গাড়িবারান্দায় ঠেকেছে। ঢুকতে গিয়ে একবার দাঁড়ালেন
শঙ্কর কিন্তু এতখানি এসে দেখা না করে আজ তিনি যাবেন না।
অথচ ইলার সঙ্গে বা তার স্বামীর সঙ্গে এমন কোনো কাজের
কথা তাঁর নেই—যা নিয়ে দেখা করতে আসা যায়; কি
ছিলায় তিনি ঢুকবেন !

ভাবতে-ভাবতেই কখন তিনি ঢুকে পড়েছেন গেটের মধ্যে।
ভিতরে আসতে একজন চাকর সেলাম করে শুধুলো,

—হুজুর কাকে চান ?

—অশোক আছে বাড়িতে ?—উমাশঙ্কর ইলার স্বামীর
নামটাই করলেন।

—জি নেহি ! সাহাব কানপুর গিয়া।

—ইলা—মেয়েরা ? পুনরায় শুধুলেন উমাশঙ্কর।

—জি ছোটা দিদিমনি ভিতর হ্যায়, আপ্ বৈঠিয়ে।

চাকরটি সাদরে উমাশঙ্করকে বসবার ঘরে বসালো। প্রকাণ্ড
ঘর, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আসবাবাদিতে সুসজ্জিত—লক্ষপতির
যোগ্য বৈঠকখানা। চমৎকার সংসার রচনা করেছে ইলা—
সত্যি সুন্দর ! একখানা সোফায় বসে বাইরে তাকালেন

উমাশঙ্কর। ম্যাগনোলিয়া ফুটে রয়েছে একটা গাছে; রডোডেনড্রন গুচ্ছ, রজনীগন্ধা—ক্রীসান্থিমাম্। বাগানের একপাশে একটা প্রকাণ্ড খাঁচা, তাতে অনেকগুলো পাখী কিচ্‌মিচ্ করছে। তারই কাছে ছোট্ট লেক্; হয়তো লাল মাছ আছে ওখানে—দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। ওরই কাছে মস্ত মাধবীলতাটার নীচে কুঞ্জ; সেখানে পাথরের বেঞ্চি পাতা; ইলা হয়তো জ্যোৎস্নারাতে বসে ওখানে। ওর কাছে একটা দোলনা রয়েছে। দোল খায় নাকি ইলা ওটাতে বসে বসে? দোল খায় আর বলে—এসো তুমি বাদলবায়ে ঝুলন ঝুলাবে—

শীতল হাওয়া নিতল রসে, বনের পাখী ঘনিয়ে বসে,
আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে—

আরে দূর! কী সব ভাবছেন তিনি! একেবারে কবি হয়ে উঠলেন যে! দোলখাবার বয়স আর নেই ইলার। তাঁর ষাট হোল—ইলারও খুব কম করে হলেও পঞ্চাশ হবে, হয়তো কিছু কম বেশী। এখন যদি কেউ ঐ দোলনায় দোলে তো সে ইলা নয়—তার মেয়ে অনুভা কিংবা অরুন্ধতী!

অরুন্ধতীকে কখনও দেখেন নি তিনি। সে কখনো যায়নি তার বাপের সঙ্গে। কে জানে কেমন সে! অনুভার চেহারার সঙ্গে ইলার কোথাও মিল নেই। সে সবটাই বাপের মত! রং-ঢং-কথা পর্যন্ত। তাকে দেখে ইলার কথা কমই মনে হয়; অরুন্ধতীও হয়তো অমনি হবে; সে-ই তো বাড়িতে আছে শোনা গেল—দেখা নিশ্চয়ই করবে—কিংবা করবে না? উমাশঙ্কর তো তার কাছে একেবারে অপরিচিত।

ভাবছেন উমাশঙ্কর আপন মনে। বাগানে খাঁচার পাখীগুলো খেলা করছে খাঁচার মধ্যে। ওরা বন্দী, তবু কেমন সুখে আছে। ওদের বন্ধনদশা সম্বন্ধে ওদের কি কিছুই জ্ঞান নেই?—আছে; কিন্তু ওদের উপায় কী! মানুষের নিষ্ঠুর বিলাস-বাসনা ওদের বন্দী করেছে—ওদের ভেতর নিজের ধনগর্বকে প্রোজ্জ্বল রেখেছে —অপরকে পীড়ন করে—অন্যের উপর আধিপত্য করে নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অহঙ্কৃত করেছে!—মানুষ চিরদিনই এই করছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস মূলতঃ অপরের উপর প্রভুত্বেরই ইতিহাস। শক্তির প্রভুত্ব, শিক্ষার প্রভুত্ব, সম্মানের প্রভুত্ব—এমন কি ধর্মের প্রভুত্ব—ঈশ্বরের প্রভুত্বও! অরণ্যবাসীর ঈশ্বরের থেকে আমার ঈশ্বর বড়—এটা পর্যন্ত প্রমাণ করে সে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করতে চায়। বলে, আমার ঈশ্বরই ঈশ্বর আর সব ভুল ঈশ্বর—ওরা ঈশ্বরই নয়। আবার কেউ বলে, আমিই ঈশ্বর, আমিই প্রভু! আমার থেকে বড় কেউ নেই। মানুষের প্রভুত্বস্পৃহা এতো ভয়ঙ্কর যে ক্ষুদ্র পাখী বা পশু-তো তুচ্ছ—মানুষ আজ সারা পৃথিবীতে প্রভুত্বের বিজয়াভিযান চালাচ্ছে। জার্মানী প্রভুত্বের জন্য যুদ্ধ করল, জাপানও তাই, আর ইংরাজ-আমেরিকা সেই প্রভুত্ব হারাবার আশঙ্কাতেই রুদ্ধশ্বাস! হায়রে প্রভুত্ব—কিন্তু······

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো এসে একটি ষোড়শী তরুণী; ইলার কিশোরী সংস্করণ! আশ্চর্য! উমাশঙ্কর প্রায় উঠতে যাচ্ছিলেন—মেয়েটি বললো,

—উপরে চলুন মামাবাবু! বাবা তো বাড়ি নেই; মা-

আর দিদি গেছে মিটিংএ, আসুন—ডানহাতখানা ধরে টান দিল সে।

আশ্চর্য উমাশঙ্কর আধ মিনিট চেয়ে থাকলেন ঐ সুপ্রসন্ন চোখ দু'টির পানে।

—তুমি আমায় চিনতে পেরেছ মা? আমি কে বলো তো?

আপনি! আপনাকে আর চেনাতে হয় না—আসুন। আপনি শঙ্করমামা।

টেনে নিয়ে চললো সিঁড়ি দিয়ে। যেতে যেত চাকরকে ডেকে বললো,

উপরে বারান্দায় চা-খাবার পাঠিয়ে দে—জলদি!

বিস্মিত উমাশঙ্করের ক্ষণপূর্বের প্রেমগুঞ্জিত মনটা স্নেহ-সিক্ততার তরঙ্গে দুলছে—আর সেই দোলনের মধ্যে কখন যে তিনি উপরের বারান্দায় এসে ইজিচেয়ারটায় বসে পড়েছেন—মনেই পড়ে না। অরুন্ধতী কাঁধের চাদরখানা তুলে র‍্যাকে রেখে দিয়ে বললো—কতকাল পরে আপনি এ বাড়িতে এলেন মামাবাবু।

—এ বাড়িতে আমি কখনো আসিনি মা—এই প্রথম এলাম!

—তাহলে আমিই সেই ভাগ্যবতী মেয়ে, এ বাড়িতে যে আপনাকে অভ্যর্থনা করলো।

আমি এমন কি মা, যাকে অভ্যর্থনা করা ভাগ্য মনে করো?

—আপনি? আর কিছু না—আপনি আমাদের মামা। অবশ্য আপনি আরো অনেক বড় কিন্তু এখানে আমাদের মামা রূপে আপনাকে পাওয়াটাই আমাদের বড় অহঙ্কার। বলতে

বলতে অরুন্ধতী বসলো চেয়ারের হাতলটায়। কি উজ্জ্বল, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ মেয়ে! বালিকা ইলার থেকেও স্বচ্ছন্দ! উমাশঙ্কর শুধুলেন,

—কিন্তু আমি যদি তোমার শঙ্করমামা না হই!

—না হয়ে পারেন না। মার কাছে আপনার কথা এতো বেশী শুনেছি যে, আপনাকে আমরা ছবির মত দেখতে পাই।

—কিন্তু তোমার মা-ও তো আমায় দীর্ঘকাল দেখেনি অরু!

—তাতে কি! দিদি আপনার কাছ থেকে ফিরে এলেই মা শুধুবে—'মুখের চেহারাটা কী রকম আছে, কগাছা চুল পেকেছে আপনার! এখন একটু কুঁজো হয়েছেন, নাকি তেমনি খাড়া হয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটেন। গায়ের রং কতটা উজ্জ্বল আছে—চোখের তারা দু'টো তেমনি কালো আছে কিনা!' জানেন মামাবাবু……অরুন্ধতী একটু থেমে হাসলো—বলতে লাগলো,

—এই সেদিন, আপনার নাকি ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীর দিন জন্ম, মা বললো, 'আজ তোদের শঙ্করমামা ষাট পার হয়ে একষট্টিতে পড়লেন—আমি নিশ্চয় বলতে পারি, ওঁর একটা দাঁত পড়েছে, অন্ততঃ নড়ছে!'—হিঃ হিঃ হিঃ!

—একটা না মা, দু'টো নড়ছে; মাঝে মাঝে ফোলে—ব্যথাও হয়!

—তাই নাকি? দেখি!—

অরুন্ধতী আঙ্গুল দিল উমাশঙ্করের ঠোঁটে! হাঁ করিয়ে বললো,

—কোন্ হু'টো মামাবাবু? ওঃ! এই যে! এইটা নাকি?

—হুঁ! মুখটা সরিয়ে নেবেন কি নেবেন না, ভাবছেন। অরু বলল,

—তা একটার যায়গায় হু'টো নড়ছে, এই তো তফাৎ! মা'র আন্দাজ খুব ঠিক!

অরু হাতটা সরিয়ে নিয়ে শঙ্করের মাথায় রাখলো, বললো,

—অঘ্রান মাসে মা বললো, 'তোদের শঙ্কর মামা ষাট পার হয়ে তিনমাস এলেন—চুলগুলো নিশ্চয় আরো বেশী পেকেছে!' আমি হেসে বলেছিলাম, বলতো কলপ দিয়ে আসি মা। মা তাতে রেগে গিয়েছিল মামাবাবু! বললো, 'খবরদার অরু—ওঁর সম্বন্ধে ওরকম কথা তুমি আর কখনো বলবে না—জীবনে কোনো কৃত্রিমতা কখনও উনি বরদাস্ত করেন নি। অমন স্বচ্ছ অনাবিল চরিত্র রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কদাচিৎ মেলে—কলপের কৃত্রিমতার কথা বলে ওঁর চরিত্রের অসম্মান করবে না'—মার কাছে আপনি দেবতার থেকেও বড় মামাবাবু —সত্যি।

চা-খাবার এনে হাজির করল বয়। অরুন্ধতী উঠে হাত ধুয়ে এসে চা তৈরি করতে লাগলো। ওর মুখের হাসিটা অপরূপ; এত সুন্দর হাসি কমই দেখেছেন শঙ্কর তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে। যেন তাঁরই আত্মজা হুহিতার হাসি—আত্মার আত্মীয়ার হাসি—আপনার অন্তরের শুভ্র নির্মল কৈশোর জীবনের হাসি! উমাশঙ্কর ভাবতে লাগলেন, এমনি বয়সে ইলা তাঁকে অভ্যর্থনা করে এনেছিল জেল থেকে প্রথম, এমনি করেই আদর করে

খাইয়েছিল—যত্ন করে বসিয়েছিল—জেলের জীর্ণ শরীর দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল—এ যেন সেই ইলাই ; শুধু তফাৎ ! ওঃ ! তফাৎটা অত্যন্ত বড়—সে ছিল ইলা, আর এ অরুন্ধতী। এ কন্যা। কন্যাই—অরুন্ধতীকে আপন কন্যা স্বীকার করার মধ্যে কী যেন অতি-মাধুর্য লুকিয়েছিল—উমাশঙ্কর স্নেহব্যাকুল হয়ে উঠলেন—বললেন,

—তুই কেন একদিনও আমার ওখানে যাসনি মা অরু ?

—মা যেতে দেয় না—বলে,—'অনুভা তোর বাবার মত হয়েছে ; ও যত ইচ্ছে যাক—তুই হয়েছিস আমার মতো ; শঙ্করদা আমাকে দেখতে না এলে তোকে তিনি দেখতে পাবেন না। তিনি আগে আসুন এ বাড়িতে !'

—তাহলে তো তোর মার ইচ্ছে পূর্ণ হোল না—তোকে আমি আগেই দেখলাম।

—না—মার ইচ্ছে ঠিক পূর্ণ হয়েছে। মা চায়, আপনি আগে এ বাড়িতে আসবেন। আজ তো এলেন—চা এগিয়ে দিল অরুন্ধতী—খাবার নিয়ে এসে বসলো খাওয়াবার জন্য ; বললো—মা আর দিদি দেরী করে ফিরবে। ওরা তো জানে না যে আপনি আসবেন, তাহলে মা হয়তো বেরুতোই না।

—তোর মার চুল দু'একগাছা পেকেছে নাকি রে অরুন্ধতী ? উমাশঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন। প্রশ্নটা করেই কিন্তু তিনি অতিশয় লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। কেন এরকম প্রশ্ন করলেন তিনি ? ছিঃ, বড় অন্যায় হয়ে গেল ; কিন্তু অরুন্ধতী স্বচ্ছন্দে জবাব দিল হাসতে হাসতে,

—একটিও না মামাবাবু,—মার চুল, দাঁত, এমন কি গায়ের রং পর্যন্ত তেমনি আছে—ত্রিশের বেশী বয়সই মনে হয় না; একটু মোটা হয়েছে মাত্র।

উমাশঙ্কর কোনো প্রশ্নই করলেন না আর ওবিষয়ে। বললেন, —আমার রূপবর্ণনা শুনেই তুই কি করে আমায় চিনলি, অরু? আশ্চর্য তো!

—মোটেই না! মা বলেছে—'আপনার চুল কোঁকড়া ছিল, লম্বা ফর্সা দোহারা গড়ন—বড় টানাটানা চোখ—দাড়িগোঁফ নেই—বুকের ছাতিটা খুবই চওড়া—বলিষ্ঠ গঠন, আর—' হাসতে লাগলো অরুন্ধতী।

—আর—?

—কপালের ডান পাশে জেলের মার খাওয়ার দাগ আছে অর্ধচন্দ্রকার। ঐ দাগটা দেখে মা নাকি বলেছিলো—'শঙ্করের ললাটে অর্ধচন্দ্র এঁকেছে!'

নিজের কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন উমাশঙ্কর; হ্যাঁ, দাগটা ঠিক আছে। ঐটাই তাঁকে সনাক্ত করবার বিশেষ চিহ্ন। তাঁর নামের গ্রেপ্তারী পরোয়ানাতেও ওটা লেখা থাকতো। অরুন্ধতী আবার বললো,

—মা আপনার প্রতি মাসের বয়সের হিসাব করে—প্রতি-দিনের কথা ভাবে। এমন নিখুঁত করে বলে যে মনে মনে নিত্যি যেন মা আপনাকে দেখতে পায়।

আশ্চর্য! উমাশঙ্কর ভেবেছিলেন, ধনী গৃহিণী ইলা তার কথা মনেই রাখে না। নিতান্তই অবিচার করেছিলেন তিনি

ইলার চরিত্রের উপর। কিন্তু কেন ইলা তাঁকে অত বেশী করে মনে রাখে? কেন! কেন!

উমাশঙ্করের মনটা অতীতের অতলে তলিয়ে গেল আবার। সেই চব্বিশ বৎসর—সেই শ্যামবাজারের বাড়ি, পেয়ারা গাছের কাছে কলতলায় কয়েকটা কথা—শোভাবাজারের রাজাদের বাড়ির বিয়ের নহবৎ—সানাইএর সুর ধরে ইলার গান—উমাশঙ্করের তেজস্বী বাচন—

'ঘরের বন্ধন নহে তার তরে—
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ
নহে...............'

—বাগানে যাবেন মামাবাবু! ম্যাগনোলিয়া ফুটেছে—চলুন না!

ভাববার কি উপায় আছে এই চঞ্চলা বালিকার সামনে! টেনে তুললো।

—চলুন! আমি নিজের হাতে গাছ লাগিয়েছি, দেখতে হবে।

নিয়ে চললো উমাশঙ্করকে। কার সাধ্য রোধে তার গতি! দুর্বার বন্যাস্রোত, অসীম প্রাণ-চঞ্চলতা। আজন্ম সাধক উমাশঙ্করের সর্ব সাধনার সমাধি হবে বুঝি! হোক বড় ভাল লেগেছে তাঁর। জীবনে এতো মাধুর্যময় ক্ষণ আর আসে কি কখনো! অরুন্ধতীর সঙ্গে তিনি বাগানে নেমে এলেন।

মন্বন্তর মহামারী কাটিয়ে মানুষগুলো বেঁচে আছে। ভালই আছে, মনে হয়। কলকাতা শহর, সিনেমার কাউন্টার বা টয়লেট ট্যালকমের বিক্রীর বাহার দেখলে ওরা যে খারাপ আছে, তা মনে হয় না, তবু খবরের কাগজওয়ালারা চীৎকার করে—দেশ নাকি অধঃপাতে যেতে বসেছে। আশ্চর্য!

দেশ ভালই আছে। ব্ল্যাকমারকেট করবার মত যথেষ্ট টাকা না থাকলে ব্ল্যাকমারকেট চলতো না। ঘুষ দিয়ে লাভ বেশী না হলে ঘুষ কেউ দিতে যায় না—ঘুষ যারা দেয়, ভেবেচিন্তেই দেয়; অতএব দেশ ভালই আছে; আর ভাল না থাকলেই বা কি করা যায়? তাই বলে কি আপনি মনে করেন যে অশোক ভট্টার মত লোকের তিনখানা মোটরগাড়ি ছাড়া চলতে পারে—? নাকি দিল্লী যেতে হলে তিনি ট্রেনের ধোঁয়া খেতে খেতে ন'শ মাইল পথ যাবেন—নিশ্চয়ই নয়। 'তাঁকে তাঁর মতই থাকতে হবে'—অনুভা বলে।

অনুভা বড় আদরের মেয়ে মিঃ অশোক ভট্টার। অত্যন্ত আদুরে। দেখতে যেমন সুন্দর, গুণপনাও তদনুরূপ; গানে বাজনায় নাচে পুরো দস্তুর সোসাইটি গার্ল। ওকে না চায় হেন পুরুষ কেউ নেই—কি বৃদ্ধ কি যুবা। অশোক ভট্টার শ্রেষ্ঠ গৌরব ঐ অনুভা—অর্থাৎ কুমারী অনুভা ভট্টাচার্য, বি. এ.। তার বিয়ে দিয়ে নিজকে এতশীঘ্র গৌরবহীন করবার ইচ্ছা নেই মিঃ অশোক ভট্টার। তাই সে চেষ্টাও করেন না। কিন্তু ইলার ইচ্ছা, মেয়ের এবার বিয়ে হোক্। বেশি বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হওয়ার দুঃখ ইলার ভালই জানা আছে। বিয়ে

হলে একটা আশ্রয় পাওয়া যায়; ঘর সংসারের আশ্রয় নয় মনের আশ্রয়। মন সেখানে সুস্থ এবং স্বস্থ হয়ে বিশ্রা করতে পারে। কিন্তু কে শুনে কার কথা! বাপের আদুরে মেয়ে অনুভা ইলাকে ছুঁয়েও যায় না—তবু আপন মেয়ের কল্যাণের জন্য ইলা চেষ্টা করে; কারো সঙ্গে মেয়ের একটু বেশি মাখামাখি দেখলেই শুধোয়,—ওর সঙ্গে তোর বিয়েতে আপত্তি হবে নাকিরে অনু?

—কারো সঙ্গে হেসে কথা কইলেই তাকে বিয়ে করতে হবে, এমন কথা কেন ভাবো মা তুমি?—অনুভা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। ইলা বিব্রত হয়ে পড়ে; সাম্‌লে বলে,

—না না, তা কেন! তবে বিয়ে তো করতে হবে! যাকে হোক, কর বিয়ে।

—বিয়ে না করেও মানুষ জীবন কাটাতে পারে বেশ আরামেই!

—না—মেয়েদের পক্ষে সে জীবন জীবনই নয়; সন্তান না হলে মেয়ে পূর্ণ হয় না!

—তোমার মত সেকেলে মেয়েদের কাছে ঐ কথা বলো! অনুভা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

সেকেলে! আশ্চর্য! এই ইলাই একদিন অতিমাত্রায় আধুনিকা বলে খ্যাতা ছিল সমাজে। তার নাম নিয়ে গুঞ্জন করতো কত যে তরুণ, কত যে প্রৌঢ় তার হিসাব করতে রীতিমত খাতার দরকার হোত! আজ সে সেকেলে! নতুন এসে পুরাতনকে স্থানচ্যুত করে, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ অনুভা;

কিন্তু ইলার এতে দুঃখের কিছু নেই; বর্তমান যুগের মেয়ে বর্তমান যুগের যোগ্য হয়ে জন্মেছে। এতো স্বাভাবিক; তবু ইলা বুঝতে পারে না, কেন ওরা বিয়ে করতে এতো নারাজ হয়! বয়স হয়েছে; বিয়ে করে সংসার-ধর্ম পালন করতে করতে কি অন্য কাজ—সমাজ কল্যাণ, বা জাতিকল্যাণ বা আত্মকল্যাণ করা অসম্ভব? ইলার তা মনে হয় না। মনে হয়, যদি যথাকালে যথাযোগ্য স্বামী লাভ করে সুখী হতে পারে কোনো মেয়ে, তা হলে, হয়তো নিজের সংসার রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর সংসারকে সে সুন্দর করতে পারে—মাধুর্যমণ্ডিত করতে পারে। নিজেই যে রইল অসংসারী, অন্যের সংসারের সুখ দুঃখ, ভালমন্দ সে বুঝবে কি করে? কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পৃথিবীতে নারীও যে ব্যক্তিত্বের মোহে তার চিরন্তন ত্যাগ-মহিমাকে, পরার্থপরতাকে বিসর্জন দিতে বসেছে—ইলা এখনও সে খবর অবগত নয় কিংবা হয়তো অবগত হলেও অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে না।

সোসাইটির সেরা মেয়ে তার কন্যা অনুভা। তাকে ঘিরে যখন তরুণদের দলে গুঞ্জন ওঠে, ইলার মনটা অহঙ্কৃত হয় কিন্তু সে অহঙ্কার তার বাঙ্গালী-মার মনে খুব বেশিক্ষণ স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে অনুভা একটি সুন্দর সংসার রচনা করে সুখনীড়ে বাস করছে, এইটাই দেখলে ইলা খুশী হতে পারে কিন্তু অনুভার বর্তমান চালচলন তার অনুকূলে মোটে নয়। বাপের প্রশ্রয় পেয়ে সে আরো বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। ক্লাবে, মিটিংএ তার অবাধগতি,

অপরিমেয় সম্মান। ওদিকে বাপের সঙ্গে বড় বড় অফিসা বাড়ি গিয়ে সে নানা কাজে বাপকে সাহায্য করে। কথায়, মিঃ অশোক ভট্টার বর্তমান আর্থিক সৌভাগ্যের অং অর্ধেকটা অনুভার অপরূপ রূপমাধুর্যের কল্যাণে।

আজকার মিটিংটা বিশেষ একটু ব্যাপার নিয়ে হচ্ছিল কংগ্রেস সেবকগণ মুক্তি পেয়েছেন; ধৃত রাজবন্দীরাও মু পাচ্ছেন একে একে; আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের বন্দী সৈনিকদ বিচার-প্রহসন অন্তে ছাড়া পেলেন; দেশে উৎসাহের বং লেগেছে। কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে রক্ত-তিলক দি অভ্যর্থনা করবার জন্যই আজকার বিশেষ মিটিং। অনুভ এই বিশেষ ব্যাপারের বিশেষ ব্যক্তি; কারণ, রূপে গুে সে অদ্বিতীয়া; রক্ত-তিলক দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে তিনজ স্বদেশ-সেবককে; এদের মধ্যে মেঘনাথ গুপ্ত বিশেষতম ব্যক্তি তিনি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী স্যার রঙ্গনাথ গুপ্তের পুত্র। স্যা রঙ্গনাথ 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে অল্পদিন হোলো বুইক্‌ গাড়ি মাথায় চরকা চিহ্নিত তিন রং পতাকা উড়াচ্ছেন। গা মন্বন্তরের সময় ব্যাঙ্কের অঙ্কটা খুবই ভারী হয়ে উঠে ব্ল্যাকমারকেট করে; তখন আরো দুটো মিল্ক-ক্যান্টিন আর একট লঙ্গরখানাও চালিয়েছিলেন তিনি, তাতেও আয় বড় মন্দ হয়নি— এখনো চালের চোরা-কারবার আর কাপড়ের কসরৎ চলছে তাঁর। যুদ্ধের আগে নাকি তিনি দু'লক্ষ টাকার দাড়িকামানে

ব্লেড কিনে রেখেছিলেন, তারই মুনাফার অঙ্কটা দেশী ব্যাঙ্কে ধরছিল না, বিদেশী ব্যাঙ্কে পাঠাতে হয়েছে!

বড় ছেলেটাকে স্বদেশী করতে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে ব্যবসায় করছিলেন। সে জেলে যাওয়ার পরই স্যার উপাধিটা ত্যাগ করে খবরের কাগজে বড় রকম বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রাণ বড় বড় ব্যবসায়ীদের অগাধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। কংগ্রেস নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে, নিশ্চয় জয়ী হবে—অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। অভিজাত সমাজের তিনি নমস্য ব্যক্তি।

স্যার রঙ্গনাথের ইচ্ছা (এখন আর তিনি স্যার রঙ্গনাথ নন, শ্রীযুত রঙ্গনাথ) অনুভাকে পুত্রবধূ করেন! কথাটা এখনো প্রচার করেন নি, শুধু লেডী রঙ্গনাথকে বলেছিলেন। লেডী রঙ্গনাথ যোগ্যা সহধর্মীনী। বামুনে বদ্যিতে বিয়ে হিন্দুমতে কি করে হবে—এ প্রশ্ন তুলবার প্রয়োজন এ সমাজে কেউ বোধ করে না—স্বামীকে তিনি বলেছিলেন,

—তা' বৌ করবার যুগ্যি মেয়ে। কিন্তু বড্ড অহংকারী!

—তা হোক—তোমার অহংকারটাইবা কম কি?

—অহংকার একটু থাকা ভাল; ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স আমি পছন্দ করি নে!

—তার জন্যই তো বলছি—ওকেই ছেলের বৌ করবো!

—বাপের আদুরে মেয়ে; সাধ আহ্লাদও ভালই হবে! ছেলে ফিরে আসুক; দেখা যাবে।

কথা ঐ পর্যন্ত হয়ে আছে। আজ সেই মেঘনাদ

গুপ্ত ফিরেছে বছর খানেক জেল খেটে ; ঠিক জেল নয়—প্রথম শ্রেণীর রাজবন্দী হয়ে ছিল সে অর্থাৎ বন্দীত্বের বিলাসটা কিছুকাল ভোগ করে এলো—কিন্তু তার অভ্যর্থনার জন্য বিস্তীর্ণ আয়োজন করা হয়েছে এখানে ; তার বিস্তৃত বর্ণনা করতে হলে প্রাচীন যুগের দিগ্‌বিজয়ী সম্রাটের রাজধানীতে ফেরার ফিরিস্তি গাইতে হয়। এ সমাজের খুব কম ছেলেই জেলে গেছে, কাজেই মেঘনাদ এখানে বড়ই মহার্ঘ বস্তু। বাকী দুটি ছেলে ঠিক এই সমাজের নয়, একজন চল্লিশ পার-হওয়া আজাদহিন্দের সৈনিক, ওঁদের পরিচিত—অন্যটি দীর্ঘদিনের কারাবন্দী মধ্যবিত্ত সন্তান। স্যার রঙ্গনাথ নিজের ছেলের অভ্যর্থনার চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্য তাঁর সংগে অন্য দুজন জেলফেরতেকে সম্বর্ধনা করে আরো বেশি সম্মান কুড়োবার জন্য পূর্ব পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে এদেরকেও ডেকেছেন।

অনুভাকে নিয়ে তার মাকে যেতে বলা হয়েছে অনেক আগেই। স্যার রঙ্গনাথের ঘরের প্রকাণ্ড হলটায় আয়োজন করা হয়েছে—লেডী রঙ্গনাথই করেছেন সব, তবে আঙুল কেটে রক্তটা অনুভাই দেবে। একগাছা ভাল ছুরি রেকটিফায়েড স্পিরিট দিয়ে স্টিরিলাইজ করে মাথার খোঁপায় গুঁজে রাখা হয়েছে। আঙুল কেটে রক্ত দেওয়ার পর ব্যাণ্ডেজ বাঁধার ব্যবস্থাও আছে অন্তরালে। অনুষ্ঠান ত্রুটিহীন, শুধু বাইরে রাজবন্দী দু'জনের আসতে যা দেরী! স্বয়ং মেঘনাদ মোটর নিয়ে তাদের আনতে গেছে—তিনজনেই একসংগে এসে পৌঁছবে।

আলপনা দেওয়া হয়েছে। আম্রকলসও আছে। এসব আলপনায় গ্রাম্য মেয়েদের আলপনার ছন্দসুষমা কমই পাওয়া যাবে—এ একেবারে ওরিয়েন্টাল আর্ট থেকে আয়ত্ত করা রীতিমত চিত্রবিদ্যা। যাঁরা এইসব আলপনা আঁকেন তাঁরা এখানকার নামকরা শিল্পী। এখানকার কাজকারবার প্রায় নিখুঁৎ। লেডী রঙ্গনাথ সমস্ত তদারক করলেন; অনুভাকে গোপনে গোটাকয়েক উপদেশ দিলেন ফিস্ ফিস্ করে; গানের মেয়েদের কি সব বললেন, তারপর খাবার পরিবেশিকাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বাইরে মোটরের হর্ণ বাজলো; মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হলেন অতিথিত্রয়। একজন চল্লিশোর্ধ, অপরজন পঞ্চত্রিংশৎ, তৃতীয় মেঘনাদ, সপ্তবিংশতি বর্ষীয় নবযুবক; যেন শালপ্রাংশু মহাভুজ। সুন্দর চেহারা, সাহেবের মত গায়ের রংএ কালো লোম চমৎকার মানিয়েছে। মিহি খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে—পায়ে কাবুলী জুতো, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি!

অনুভা এই প্রথম দেখলো মেঘনাদকে। বিলেত থেকে এঞ্জিনীয়ার হয়ে ফিরেই ত স্বদেশী করতে যায়; তারপরই জেল হয় বক্তৃতা করার জন্য। তাই অনুভা তাকে এর আগে দেখে নি। তবে তার কথা ভাল রকমেই শোনা আছে অনুভার। দেখলো অনুভা মেঘনাদকে! মিঃ এম. গুপ্ত… নাঃ—এযুগে শ্রীযুক্ত মেঘনাদ গুপ্ত বলাই উচিত—কিন্তু এখনো মিঃ এম. গুপ্ত অচল হয় নি। অনুভা আপনার মনে আবৃত্তি করছে; অতিথিরা ভেতরে এলো শঙ্খধ্বনির মধ্যে।

এইবার অনুভার রক্তদানের পালা! ছোট্ট একটি বক্তৃতা ঠিক করে রেখেছিল সে মনের মধ্যে—

"মুক্তিকামী বীরের দলকে রক্ততিলক দিয়ে অভিনন্দিত করবার যে মহাসুযোগ আজ আমি লাভ করছি—আমাদের দেশজননী সেই মহাক্ষণটিকে পুতঃ পবিত্র ধন্য করুন—সার্থক করুন ওদের কারাবরণ, ত্যাগব্রত, দেশের জন্য আত্মদান। আমাদের মধ্যে জন্মভূমির এই আজন্ম দেশসেবক সন্তানদের লাভ করে আমরা আজ বিপুল গৌরব অনুভব করবো। আমাদের হৃদয়শোণিত দিয়ে ওঁদের অর্ঘ্য দেব; দেশমাতৃকা পরিতৃপ্ত হবেন…………"

মাথার খোঁপা থেকে চাকুখানা টেনে (যেন খাপ থেকে তলোয়ার খোলা হোল) ফলাটা খুলে অনুভা অবিচল হাতে আঙ্গুল কাটলো; রক্ত বেরিয়ে গেল ঝর ঝর করে—ওদিকে করতালি ধ্বনিও হলের কোণায় কোণায় ধ্বনিত হচ্ছে। চল্লিশ-পঁয়ত্রিশ-সাঁত্রাশকে পর্যায়ক্রমে রক্ততিলক পরিয়ে দিল অনুভা। দীপ্তি মালা পরালো, নমিতা ফুল দিল ওদের পায়ে; বাকীরা সব—শাঁখ বাজালো, হাততালি দিল—গান ধরলো,

'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে……'

সুন্দর কায়দায় সম্পন্ন হতে লাগলো অভিনন্দন—দেখবার মতো সমারোহ। ইলাও দেখছিল আর ভাবছিল, সেও একদিন অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল জেলের দরজায়; তার মধ্যে এমন কেতাদুরস্ত সমারোহ ছিল না, কিন্তু কৃত্রিমতাও ছিল না। সে ছিল অনাবিল নিষ্ঠায় নিবিড়,

অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়ে অভিমন্ত্রিত। আর আজ এই যে সমারোহ—রক্ত দান—বাদ্য-গীতির কলঝংকার—অন্নপানীয়ের প্রাচুর্য—এর মধ্যে কোথায় সেই নিষ্ঠা? সেই প্রাণ? সেই গর্বানুভব? কেন এমন হচ্ছে! মানুষ কি আজ সবটাই কৃত্রিম হয়ে উঠলো? এমন কি, স্বদেশ-মুক্তিসাধনায় আত্মদান-কারী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকালেও কৃত্রিম হয়ে উঠেছে সে!

উঠেছে—ইলা ভাবতে লাগলো—যে নৈতিক বীর্য সেদিন সঞ্চিত ছিল এদেশের মুক্তিকামীদের অন্তরে, তার আলোকচ্ছটাও জনমনে প্রতিফলিত হোত। আজকার নেতৃত্ব-আকাঙ্ক্ষা সেদিন ছিল কল্পনাতীত। সেদিনের গীতাধর্ম আজ স্তবগীতিধর্মে নেমে এসেছে—সেদিনের অধ্যাত্মচেতনা আজ আত্মচেতনার যুপকাষ্ঠে বন্দী, আত্মম্ভরিতার অহংকারে স্ফীত কুষ্ঠ রোগী—সকলেই অবশ্য তাই নন, কিন্তু অধিকাংশই, যাদের নিয়ে দেশ, যাদের নিয়ে সমাজ, তারা অধিকাংশই ঐ পর্যায়ের। কিন্তু ও নিয়ে দুঃখ করবার বা চিন্তা করবার কিছু নেই! দেশ এখনো পরাধীন, এখনো দলেদলে নতুন সৈনিক যুদ্ধযাত্রা করবে স্বাধীনতার জন্য, স্বরাজের জন্য। মহাত্মাজীর মহান নেতৃত্বে এখনো সারা ভারতকে পরিচালিত করছে—বিপ্লব-আন্দোলন থেমে গেছে—যাক গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে নতুন পন্থায়। এ পন্থা পৃথিবীতে অভিনব অহিংস পন্থা, এবং এর সাফল্য অবশ্যম্ভাবী......এই নির্বাচন বিশেষভাবে সেটা প্রমাণ করবে।

ইলা নিজের মনে ভাবছিল—মেঘনাদ বয়ঃকনিষ্ঠ—অনেককে প্রণাম করছে। ইলাকেও প্রণাম করতে এলো;

ওর মা সঙ্গে করে আনছেন। চিন্তাটা ব্যাহত হয়ে গেল ইলার। মেঘনাদ প্রণাম করলো—ইলা আশীর্বাণী উচ্চারণ করলো— —"দেশের গৌরব হও"।

অকস্মাৎ তার মনে পড়ে গেল একখানি করুণ মুখ; দীর্ঘদিন পূর্বে দেখা মুখ, ঠিক এমনি, আরো তরুণ মুখ— আলিপুর জেলের গেটের বাইরে ইলা তাকে প্রথম দেখেছিল; তারপর অনেকবার দেখেছে এবং তারপর বহুকাল দেখেনি! এমনি করেই এসে দাঁড়িয়েছিল ইলার সামনে। সেদিনের তরুণী ইলার অন্তর উন্মথিত করে যেন বিজয়শঙ্খ বেজে উঠেছিল। ঐ বীরের আগমন-পথে প্রভাতী সূর্য আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইলা তার হাত ধরে বাড়িতে এনেছিল তাকে। সেদিনের ইলার অন্তরের সংগে আজকার ইলার অন্তরের কতখানি তফাৎ? মানুষ তার যৌবন শেষ হলে কি নতুন ভাবে জন্ম নেয়! ইলা সেদিনের অন্তর-উচ্ছ্বাসকে আজ কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না—এ ব্যাপারটা যেন তার কাছে নিতান্ত মামুলী একটা কৃত্রিম উৎসব মনে হচ্ছে—যেন না করলেই নয়—তাই করা হোল।

কিন্তু এসব অন্তরের গোপন কথা, বাইরে প্রকাশ করা চলে না! মেঘনাদ ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অনুভা গান ধরেছে অর্গ্যান বাজিয়ে—আঙ্গুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কিন্তু বাজাতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। ভারি মিষ্টি গলা ওর—মেঘনাদ দূরে এসে পড়লেও দাঁড়িয়ে গেল গান শুনে। ইলাও দেখলো মেঘনাদকে। বেশ ছেলেটি! তবে দেশাত্ম-

বোধে ওর নিষ্ঠা কতখানি তা জানা নেই ইলার—শ্রদ্ধাটা ঠিকমত আসছে না ওর অন্যায় হচ্ছে নাকি? কে জানে! তবে অনুভার সংগে যদি মেঘনাদের বিয়ে হয়, মন্দ হবে না। অনুভা সুখী হতে পারবে; বাড়ি-গাড়ি-শাড়ি…

চমকে উঠলো ইলা! বাড়ি-গাড়ি-শাড়ি থাকলেই সুখী হওয়া যায় না। এ খবর আর কেউ না জানুক, ইলা জানে। ইলা জানে, বৃক্ষতলে বসেও আপনার অন্তরতমকে নিয়ে আনন্দে থাকা যেতে পারে—প্রকাণ্ড প্রাসাদেও অরণ্যের বিভীষিকা জেগে ওঠে অবাঞ্ছিতের সান্নিধ্যে! কিন্তু সে খবরও অন্তরের গোপন খবর—যাক সে কথা।

উৎসব চলতে লাগলো খাদ্যপানীয় পরিবেশিত হোল; কলগুঞ্জন আরম্ভ হোল অভ্যাগতদের মধ্যে। অনুভার সংগে মেঘনাদের আলাপও ঘনীভূত হয়ে উঠলো এই ফাঁকে। আগে আগে জন্মদিনের উৎসব করে এইসব ব্যাপার চালানো হোত, এখন নতুন যুগের নতুন কায়দা—স্যার রঙ্গনাথ সুযোগ-সন্ধানী পুরুষ—সুযোগ বুঝে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে স্বদেশসেবার নামে সম্পদ আর সম্মান কুড়োচ্ছেন—অবিলম্বে ইন্‌ট্রিমে যাবার বাসনাও রাখেন তিনি—বড় বড় দেশ-নেতাদের সংগে তাই তাঁর আজকাল এতো দহরম-মহরম—এই ছেলেটি তাঁর ভাগ্যকে যথেষ্ট এগিয়ে দিল। কিন্তু ইলা ভাবছিল উমাশংকরের কথা—ইচ্ছা করলে, এই মহা-সুযোগটাকে গ্রহণ করে উমাশংকর মহা ধনী হয়ে উঠতে পারেন—কিন্তু তিনি তা হবেন না—হতে পারবেন না—তিনি

যে সত্যি ভালবাসেন দেশমাতাকে। কে জানে, কেমন আছেন এখন! কতকাল দেখা নেই। বুকের ভেতর নিশ্বাসটা গুমরাচ্ছিল, বেরিয়ে গেল সবেগে।

জ্যোৎস্নালোকিত বারান্দায় কথা হচ্ছিল।

টবের চন্দ্রমল্লিকায় অজস্র ফুল—রজনীগন্ধাও গন্ধ ঢালছে, বাতাস মন্থর মদির। অনুভার কোমল গণ্ডে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হয়েছে—মেঘনাদ মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললো,

—এখানে এসেই আমি মার কাছে শুনেছি তোমার কথা কিন্তু সে তো শুধু শোনা! তখন কে জানতো যে তুমি এমন পরম বিস্ময়!

—একেবারে পরম বিস্ময়!—অনুভা একটু মধুর হাসলো; গর্বের সংগে গৌরবের হাসি!

—বিস্ময়। পুরুষের চোখে নারীর রূপ বিস্ময় জাগায়, এ সনাতন সত্য, কিন্তু জেলফেরৎ কয়েদীর ক্ষুধিত চোখে তুমি যে কী, তা অনুভব করতে পারবে আমার মত জেলফেরৎ।

'জেলফেরৎ' কথাটার উপর মেঘনাদ বার বার জোর দিচ্ছে—অনুভা অনুভব করলো কিন্তু সত্যি তো ও জেলফেরৎ। সভ্য জেলফেরৎ। প্রসন্ন কণ্ঠে বললো,

—জেলের আভ্যন্তরীন জীবন সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা নেই—আপনার কাছে শুনে নেব—আশা করি বলবেন।

—নিশ্চয়। তোমার মত শ্রোতা পেলে বর্তে যাব। কবে থেকে শুনতে চাও?

—এই-কাল-পরশু-তরশু—অনুভা হাসলো। বললো আপনি কোন্ ক্লাশের কয়েদী ছিলেন?

—ওর আবার ক্লাশ কি? কয়েদী কয়েদীই। তবে আমি প্রথম শ্রেণীর বলেই গণ্য হয়েছিলাম—বাবা অনেক তদ্বির করে ওটা করিয়েছিলেন।

—নিশ্চয় এ ক্লাশে বিশেষ সুবিধা কিছু পাওয়া যায়?

—অতি সামান্য। কিন্তু কয়েদ মানেই বন্দী জীবন; তার দুঃখ সর্বত্র সমান।

—আপনি তো আর বোমা ছুঁড়ে জেলে যান নি—পিকেটিং করে আর বক্তৃতা করে—ওতে খুব সাজা হয় না নিশ্চয়ই।

মেঘনাদ উত্তরটা চেপে অন্য কথা পাড়বার চেষ্টায় বললো,

—জেলের কথা অন্য দিন হবে, আজ তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে অনুভা।

—বলুন।

—আমার মার সংগে তোমার মার বহুদিনের বন্ধুত্ব, জানো তো? আমি বিলাতে না গেলে তোমার সংগে আমার আলাপ অনেক আগেই হতে পারতো। সে যাক—তোমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার নিজেই আমি নিলাম—তুমি তো আপত্তি করলে না, এখন যদি আর একটু বেশী অধিকার চাই...

—এতো তাড়াতাড়ি না—অনুভা হাসতে হাসতে উঠলো, অধিকার অর্জন করতে হয়।

—তা ঠিক। বেশ, আমি অর্জন করেই নেব ; তবে আমাকে সুযোগ দিও তার জন্যে।

—সুযোগও সন্ধান করে নিতে হয়—অনুভা যাবার জন্য এগুলো।

—ঠিক কথা। কিন্তু পরে যেন সুযোগসন্ধানী বলে গাল দিও না!

—সুযোগকে সন্ধান করে নিয়ে যারা বড় হয়ে ওঠে, গাল তাদের গায়ে লাগে না ; তারা হিমালয়ের মত উচ্চশির না হতে পারে, শ্যেনপাখীর মতো উচ্চ আকাশে বিচরণশীল···

—তাহলে আমাকে শ্যেনপাখীই হতে বলছো ?

—উপায় কি ? হিমালয়দের দেখা তো আজকাল পাওয়া যায় না!···

অনুভা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। ওদের এই সাক্ষাৎ-টুকুর মূলে আছেন মেঘনাদের মা লেডী গুপ্তা। স্বামী স্যার উপাধি পরিত্যাগ করলেও তিনি স্বয়ং এখনো লেডী উপাধিটা পরিত্যাগ করেন নি; ওঁর বন্ধুবান্ধবরাই বলেন 'লেডী গুপ্তা'। তিনি আর কি করতে পারেন সাড়া না দিয়ে ? ছেলের সংগে অনুভার এই সাক্ষাৎকারটুকু অতি কৌশলে করিয়ে দিলেন তিনি অনুভাকে উপরে ডেকে। অন্য অতিথিরা অনেকেই তখন চলে গেছেন—কেউ কেউ হলঘরে গল্প করছেন। ইলাও হলঘরে ছিল, একটা চাকরকে বললো,

—অনুভা গেছে লেডী গুপ্তার শোবার ঘরে ; একটু ডেকে দাও তো লোচন।

লোচন নামক চাকরটি দুমিনিট পরে ফিরে জানালো যে লেডী গুপ্তার ঘরে অনুভা তো নেই-ই, স্বয়ং লেডী গুপ্তাও নেই—ঘর বন্ধ। ইলা চিন্তিত হচ্ছিল—কিন্তু লেডী গুপ্তাই এসে জানালেন যে চিন্তার কোন কারণ নেই, অনুভার সংগে মেঘনাদের কয়েক মিনিটের গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। ইলা নিশ্চিন্ত হোল—আত্মপ্রসাদও অনুভব করলো এমন কন্যার জননী হওয়ার জন্য, যে কন্যাকে বধূরূপে পাবার জন্য স্বয়ং লেডী গুপ্তার মত সোইছটি-ম্যাগনেট্ আগ্রহান্বিত কিন্তু অনুভা যদি মেঘনাদকে ভালবেসে ফেলে এবং তারপর যদি দুজনের বিয়ে না হয়···ইলা জানে সেই জীবনের বিড়ম্বনা, বিচিত্র দুঃখানুভূতি—না, ইলা সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু ইলার তখনি মনে পড়লো—অনুভা যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তা এবং বুদ্ধিমতী; নিজেকে সংবৃত করেই সে এগুবে ধাপে ধাপে ; ইলার মত একেবারে অগাধ সলিলে নিশ্চয় পড়ে যাবে না। আজকালকার মেয়েরা ওরকম ভাবে পড়ে না—তারা নিজে সাঁতার তো জানেই—অপরকেও হাবুডুবু খাইয়ে খেলাতেও পারে। অনুভা তার পেটের মেয়ে হলে কি হবে, সত্যি স্বীকার করতে হলে বলতে হ'য় প্রেমে পড়ার বাতিক অনুভার একেবারে নেই। তাছাড়া বিয়ে যদি দিতেই হয়, তা হলে ভাবী বরের সংগে আলাপ-পরিচয় করা এ সমাজের নিয়ম। এর নাম ইংগ-বংগ সমাজ অর্থাৎ বংগসমাজের নাকের ওপর ইংগসমাজের আঁচিল ;—

কিছুতেই ভাল হতে চায় না ; অতিসূক্ষ্ম অস্ত্র দিয়ে বা মাথার চুল দিয়ে ওকে কেটে ফেলতে হয়—তাতেও আরোগ্য হবে কি না, জানা নেই—এমনি রোগ !

কিন্তু অনুভার কথা খুব বেশিক্ষণ ভাবতে পারলো না ইলা ; নিজের কথাই কেন জানি আজ সাত কাহন করে মনে পড়ছে। সেই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের গেটের কথা—পেয়ারাতলার কথা—আর একটা দিনের কথা, সেদিন ইলার বিয়েতে উমাশংকর উপহার পাঠিয়েছিল সিন্দুরকৌটা ; তার মাথায় লেখা 'সাবিত্রী সমান হও'।

বিদ্রূপ করেছিল না কি উমাশংকর ? কে জানে, হয়তো বিদ্রূপ ! কিন্তু বিদ্রূপ করবার মত মানুষ তো নন উমাশংকর। তাঁর জীবনের কোথাও কোনো গ্লানি নেই ; কোন কলংক নেই ; কোনো অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া নেই। ইলাকে তিনি গ্রহণ করেন নি—তার কারণ ইলার উপর ভালবাসার অভাব নয়, ইলার প্রতি প্রেমকে অতিক্রম করে দেশমাতার প্রতি কঠোর কর্তব্যবোধ—যার জন্য ইলার প্রতি অকর্তব্য হবার বিশেষ সম্ভাবনা। উমাশংকর ভালই বাসতেন ইলাকে, হয়তো আজও বাসেন। বাসেন—ইলার প্রৌঢ়ত্ব নিমেষে ঝরে গিয়ে তারুণ্যের উজ্জ্বলতা ঝলকে উঠলো গণ্ডে—রক্তিম হয়ে উঠলো ললাট প্রদেশে। ইলা পাশের ঘরে ঢুকলো।

প্রকাণ্ড আয়না রয়েছে একটা—ইলার সমস্ত অবয়ব প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে, তেমনিই আছে ইলা—সেই উনিশ বছরের মতই—না, একটু মোটা হয়েছে, তবে চুল, চোখ, হাতের

আঙ্গুল তেমনিই তো, মুখের হাসিও প্রায় তেমনি! দূর! তাকি হয়? ইলা লজ্জিত হয়ে উঠলো নিজের মধ্যে। ঘরটায় আর কেউ নেই। ইলা মাথার চুলগুলো একটু সরিয়ে নাড়িয়ে ঠিক করছে—প্রসাধন এ সমাজের যে-কোনো বয়সের মেয়ে করতে পারে এবং করেও থাকে। লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু ইলার আজ অকস্মাৎ লজ্জা পেল অত্যন্ত—তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল সে-ঘর থেকে।

সামনে লেডী গুপ্তা; লজ্জাটা আরো বেড়ে উঠেছিল কিন্তু তিনি হাত ধরে বললেন,

—ছেলেটা নোঙরছাড়া নৌকোর মত বেবাগা হয়ে যাচ্ছে স্বদেশী করে; ওকে বাঁধতে হবে—তোমার সাহায্য চাইছি ভাই।

—আমার—আমি কি সাহায্য—বলতে গিয়েই ইলা কথাটা বুঝলো। আগেই ওর বোঝা উচিৎ ছিল, কিন্তু ওর মন ছিল নিজের গানের সুরে বাঁধা—তাই দেরী হোল বুঝতে। হাসি দিয়ে নিজের ত্রুটি সেরে নিয়ে বললো—

—তা দেখুন—এতে আমাদের সৌভাগ্য!

—সৌভাগ্য দুপক্ষেরই—তাহলে আপনাদের আপত্তি নেই, কেমন?

—এতে আপত্তি করার মত মূর্খ আমরা অন্ততঃ নই; তবে ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে; ওদের মত নেওয়া দরকার!—তা হবে—এখুনি আমি ওদের কথা শুনলাম। ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

—তাহলে ভালই.........ইলা যেন কতকটা আনন্দে

কতকটা অবসাদে বলল। কিন্তু লেডী গুপ্তা অবসাদটা লক্ষ্য করলেন না, সোচ্ছ্বাসে বললেন,

—আমাদের অনেকদিনের সাধ অনুভাকে বউ করি—তোমার স্বামীর মতটা তাহলে আজই জেনে নিও ভাই……।

—তিনি তো কানপুরে গেছেন—ওখান থেকে এলাহাবাদ যাবেন—তারপর ফিরবেন। দিন দশ বাদ। তা, ওঁর আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।

—তাহলেই হলো! এর মধ্যে ছেলেমেয়ের মতটা আমরা নিয়ে নিই।

—বেশ!

ঠিক এই সময় অনুভা এসে দাঁড়ালো—।

শেষের কথাটা শুনলো সে। কিন্তু যেন শোনে নি এমনি ভাবে লেডী গুপ্তার কাছে এসে বললো,

—মাসীমা ডেকেছিলেন—উপরে গিয়ে দেখা না পেয়ে ফিরে এলাম!

—হ্যাঁ মা, ডেকেছিলাম—তারপর তোমার মা'র সংগেই কথা কইচি! কাল বিকাল ছটায় ডাক্তার চাটার্জির বাড়িতে পার্টি আছে মা—তোমায় আমি সংগে নিয়ে যাব—তোমার মা যেতে পারবেন না বলছেন। তুমি তৈরী থেকো—আমি তুলে নেব গিয়ে।

—আচ্ছা!—অনুভা মাথা নীচু করে বললো!

এসব প্যাঁচ ওর জানা; ও এই সোসাইটিতে মানুষ হয়েছে—কাজেই এগুলো বুঝতে ওর কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

অতঃপর তাকে তুলবার জন্য মেঘনাদকেই পাঠানো হবে—এবং ডাক্তার চাটার্জির বাড়িতে সন্ধ্যা-মজলিশে নিয়ে যাওয়া হবে। লোকে দেখবে অজয় ভট্টার কন্যা অনুভা স্যার রঙ্গনাথের পুত্র মেঘনাদের সংগে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে; অনুভার জন্য বহু যুবকের বুকে ঈর্ষার আগুন জ্বলবে—এবং লেডী গুপ্তা প্রচণ্ড আনন্দে ফুলে উঠতে থাকবেন। কিন্তু এ খেলা পুরানো হয়ে গেছে অনুভার কাছে। নিতান্তই খাঁচাবদ্ধ মৃগ মৃগয়া করে সুখ নেই। এখন রথ চালনা করে গভীর অরণ্য প্রদেশে মৃগয়ায় যেতে চায়—যেখানে মৃগের ছদ্মবেশে ভুলিয়ে কোনো রূপকথার রাজপুত্র সপ্ততল প্রাসাদে তাকে নিয়ে যাবে।—তবু অনুভা সম্মতি দিল এবং মার পানে চেয়ে বললো,

—এবার বাড়ি চলো মা রাত অনেক হোল!

ওর মনিবন্ধের ছোট্ট ঘড়িটার দিকে তাকালো অনুভা কথা বলতে বলতে।

—মেঘনাদ অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে বললো—মা···আমার বন্ধুরা যাচ্ছেন। তুমি ফ্ল্যাসলাইটে আমাদের তিনজনের ফটো নিতে চেয়েছিলে—নিতে চাও তো এসো; ওরা বলছে, তুমি মা হয়ে সবার মাঝখানে না দাঁড়ালে ওরা ফটো নিতে দেবে না!

—চল চল, আমি আসছি—দুমিনিট! তুমিও থাক অনুভা; তুমি তিলক দিয়েছ; এই ছবিটা কাগজে পাঠাতে হবে—একটু অপেক্ষা কর ভাই ইলা।

লেডী গুপ্তা বেশটা একটু ঠিক করে নেবার জন্য আয়না-ওয়ালা ঘরটায় ঢুকলেন; তিনি বার হয়ে এলে ঢুকলো

সারা-জীবন সতী হয়েই স্বামীর সংসারে কাটিয়ে দিল—রাজনীতি সমাজনীতি ওর মাথাতে ঢোকা অসম্ভব। কিন্তু ইলার মুখে এ সব কি কথা আজ শুনছে অনুভা!—ইলা চুপ করে বসে আছে বাইরের দিকে মুখ করে; হঠাৎ অনুভার পানে ফিরে বললো,

—রাজনৈতিক কর্মী বা স্বদেশসেবক সৈনিক হিসাবে যদি তুই মেঘনাদকে শ্রদ্ধা করিস অনুভা, তাহলে ভুল করবি। ভদ্রলোকের ছেলে, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, শিক্ষিত ছেলে—সাধারণ ভদ্র পুরুষ হিসাবে যদি তাকে বিয়ে করতে চাস তো আমি আপত্তি করবো না—কিন্তু প্যাঁচার ডিমের মধ্যে গরুড় পাখীর বাচ্চা আশা করিস নে।

—কেন মা—ওর কাছে কি স্বদেশ-সেবকের নিষ্ঠা আশা কর না তুমি?

—এক ফোঁটাও না; জেলে যাওয়ার সার্টিফিকেটে ওরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। কিন্তু ওসব কথা বলে ফল নেই। বড় হয়েছিস, নিজের কল্যাণ বুঝে চলিস।

গাড়ি গেটে ঢুকলো। অরুন্ধতীর হাত ধরে কে ও এদিকে আসছে? কে? ইলা ভূত দেখলেও অতটা চমকাতো না।

—দেখ মা, কাকে ধরে এনেছি—অরুন্ধতীর কণ্ঠ উচ্ছ্বাস-মুখর!

—শঙ্করদা! ইলা প্রণাম করতে ভুলে যাচ্ছিল, অকস্মাৎ হেঁট হোল।

প্রাচ্যের অনিবার্য জাগরণকে রোখা যাবে না—পাশ্চাত্ত্য এই তীব্র সত্য মনে প্রাণে অনুভব করেছে। জাপানের পতন যুদ্ধের শেষ অধ্যায় রচনা করলো—মানব-ধ্বংসের চরমতম বৈজ্ঞানিক অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হোল সেখানে; মানুষের সভ্যতার এই নিবিড় কলঙ্ক কে জানে, কোনদিন ক্ষালন হবে কি না; কিন্তু জাপানের দম্ভ শেষ হওয়ারও দরকার ছিল। ঈশ্বর মঙ্গলময়, কোন্ অমঙ্গলের ভিতর দিয়ে তিনি কিভাবে জগতের মঙ্গল করে চলেছেন, কেউই জানে না। আপাতদৃষ্টিতে মহাকালের কাজের বিচার করা সম্ভব নয়।

আজাদহিন্দ্ দলের বিচার চলছে—অগাস্ট আন্দোলনের বিপ্লবীদের মুক্তি হচ্ছে—কংগ্রেস-নেতারা নির্বাচনে নেমেছেন, রাজনৈতিক বন্দীগণও মুক্তি পাচ্ছেন; দেশে একটা বিপুল উদ্দীপনার ভাব।

উদয়ন কিন্তু এখনো মুক্তি পেল না, কবে পাবে কেউ জানে না। তার অপরাধ শুধু অগাস্ট বিপ্লবে সক্রীয় যোগদান নয়, তার মাতুল বংশের সকলেই বিপ্লবপন্থী; তার সম্বন্ধে ইংরাজ সরকার একটু বিশেষ রকম সাবধান; কিন্তু মুক্তি তাকেও দিতে হবে—গণদেবতা তার মুক্তির জন্য দাবী জানাচ্ছে।

গণদেবতা—আর্যঋষির অপূর্ব কল্পনা; গণেশের মূর্তি! বিশাল শরীর, গণশক্তির বিশালত্বের পরিচায়ক; রক্তবর্ণ শক্তির দ্যোতক কিন্তু যেখানে বসেন, সেখানেই বসে থাকেন; নড়বার নামটি নেই; শ্লথ, মন্থর গতি! মাথাটি হস্তীর, তাই চিন্তাশক্তিও শ্লথ। যে-ভাব একবার ওঁর চিন্তায় এলো, তাই নিয়েই বিশাল

গুপ্ত আন্দোলন করে পৃথিবী ওলোট পালোট করতে চান— ; গণের প্রতীক গণেশের ঐ মূর্তি।

নন্দিতা ভাবছিল একলা ঘরে ; দাদা কলকাতা গেছে, মনটা ফাঁকা ফাঁকা ! ছেলের চিন্তাটা আজ বড় নিবিড় হয়ে উঠেছে ওর মনে। গ্রাম্য জীবনে অখণ্ড অবসর কিন্তু দাদার চেষ্টায় এখানে গান্ধিজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করেছে সে দেশের মেয়েদের নিয়ে। সময় এখন কমই পাওয়া যায়, কিন্তু আজ আর বের হয়নি সে কোথায়ও।

ওদের কর্মক্ষেত্রের নাম "আনন্দ নিকেতন"—নন্দিতা এই নিকেতনের কর্ত্রী। উমাশঙ্করই অবশ্য স্থাপন করেছেন এই নিকেতন, কিন্তু বোনের সাহায্য তাঁকে নিতে হয় এবং তাতে কাজও ভাল হয়। তা-ছাড়া বিধবা বোনকে কাজে নিযুক্ত রেখে দেশের সেবা করবারও ইচ্ছা তাঁর ! অনেক রাজনৈতিক নেতা এই কর্মভূমিকে পবিত্র করেছেন। বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়কগণও আসবেন। দীর্ঘদিন বাংলায় আসেন নি তাঁরা ; এখন, যখন নেতাজী সুভাষের সুমহান বীর্যমহিমা-গানে বাংলার আকাশ গর্জন-মুখর তখন বাংলাকে দেখবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হয়ে উঠলেন ; শীঘ্রই আসবেন তাঁরা শোনা যাচ্ছে।

অগাস্ট বিপ্লবের কয়েকজন ফাঁসীর আসামীকে মুক্তি দেওয়া হলো—ইংরাজের ঔদার্য। ওদের দেশের রক্ষা-কার্যে কেউ যুদ্ধ করলে তাকে বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়া হয়, আর ভারতে আপন দেশের স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করলে তাকে ফাঁসীর আসামী করা হয়। কিন্তু ইংরাজ আইনানুগ শাসক—

আইনে অপরাধ প্রমাণিত করে মানবত্বের মর্যাদা দেখিয়ে মুক্তি সে দেয়, দিয়েছে বহুবার ; এবারও দিল।

মহামানব আসছেন বাংলায় ; নন্দিতাদের আশ্রম তাঁকে পরিদর্শন করতে অনুরোধ করা হবে—আনন্দ নিকেতনে আয়োজন চলছে ; কাজের ভিড় খুব, কিন্তু নন্দিতা আজ বেরুলো না ঘর থেকে। কারাবন্দী পুত্রের চিন্তায় কাতর মাতৃমন তার কেমন যেন নিরুৎসাহ বোধ করতে লাগল ! কী হবে এই সব করে ! দেশের স্বাধীনতা আসা দরকার কিন্তু স্বাধীন হলেই কি সব দুঃখ ঘুচে যাবে আমাদের ! কে ঘুচাবে দুঃখ ! যে নেতাদের নির্দেশে অগণ্য যুবক যুবতী মৃত্যু বরণ করলো, জেলে গেলো, দ্বীপান্তরে রইল—সেই নেতাগণ কি সত্যই স্বদেশনিষ্ঠ সকলে ! সত্যই কি এদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, আগ্রহান্বিত ? এ প্রশ্ন আজ বিশেষ চিন্তাশীল মনের বিশেষ প্রশ্ন। মহাযুদ্ধের দাপটে যে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, যে উচ্ছৃঙ্খলতার বিরাট ওলোট পালট চলছে, স্ব-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যে কদর্য প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে—দেশ স্বাধীন হলে তার সুযোগে যে গৃহযুদ্ধ লাগবার বিশেষ সম্ভাবনা—ইংরাজ সুকৌশলে তার ব্যবস্থা করেই রেখেছে ; হয়তো স্বাধীনতা আসবার আগেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে—আর সেই গৃহযুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হয়ে অরণ্যে আশ্রয় নেবে।

কিন্তু কোথায় আজ অরণ্য ? আশ্রয় নেবার স্থান তো কোথাও নেই। মানুষের বসতী আজ আদিম যুগের অরণ্য থেকেও ভীষণ, হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল হয়ে উঠেছে ; তাই মন্বন্তর,

মহামারী, মৃত্যু। মৃত্যু সেদিনও ছিল, কিন্তু এমন করে মানুষের সভ্যতাকে কলঙ্কিত করে মৃত্যু সেদিন বাহু বিস্তার করতো না; মৃত্যু সেদিন মহান হোতো গৌরবময় হোত এবং যিনি যুদ্ধে সেই মৃত্যু দান করতেন প্রতিপক্ষকে, তাঁর অগৌরবেরও কিছু থাকতো না। সমাজের মধ্যে অভাব ঘটিয়ে এমন ব্যাপক রাজনৈতিক মৃত্যু ডেকে আনতো না কেউ; জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকট করবার জন্য এমন বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযুদ্ধ ঘটিয়ে নিরীহ নির্বিরোধী জনগণকে ধ্বংস করতো না কেউ; আপন আপন ধর্ম আর সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য অপরকে এমনভাবে গলা টিপে হত্যা করতো না কেউ; এসব এই নবসভ্যতার দান—পাশ্চাত্যের ভোগবিলাসী আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার অবদান!

কিন্তু এসব ভেবে লাভ কি? অনেক বই পড়লো নন্দিতা; দাদার কাছে অনেক বিষয়ই শিখলো কিন্তু শিক্ষা আর সংস্কৃতি এক নয়; হৃদয়ানুভূতির স্তর বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন। তবু মানুষ যেন কোথায় এক; কিন্তু কোথায়?

নন্দিতা ঠিক মত ভাবতে পারছে না কোথায় মানুষ এক। অথচ দাদা যেন একদিন বলেছিলেন, 'মানুষ মূলতঃ এক!' কেমন করে? মানুষ যদি মূলতঃ এক তবে কেন এই দুঃখ, দৈন্য —এই পরাধীনতার পীড়ন! উপনিষদের বাণী মনে পড়লো,

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

"এক, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সকল জীবেই বিরাজ করেন গোপনে,—নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত হয়ে তিনি রয়েছেন—সকল সৃষ্ট পদার্থের তিনিই অন্তরাত্মা, তিনিই কর্মের প্রেরণাদাতা, তিনিই চৈতন্যময় নিখিল প্রপঞ্চের সাক্ষী, নিঃসঙ্গ এবং মানুষের বুদ্ধির আরোপিত সকল গুণের অতীত"—এইখানেই ঐক্যের ভিত্তি। এই ভিত্তিকে বাদ দিয়ে বর্তমান সভ্যতায় মানুষে মানুষে যে মিলনের চেষ্টা, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য—কারণ মানুষের প্রকৃতির স্বাভাবিক টানটাই অহম্-এর দিকে; এবং মানুষ এরই জন্য মিলন-বন্ধনকে মুহূর্তে ত্যাগ করে সহিংস, এমন কি নিদারুণ হিংস্র হয়ে ওঠে, পরার্থপর মানুষ অত্যন্ত স্বার্থদুষ্ট হয়ে পড়ে; আপনার সঙ্গে অন্যের বিভেদ-গণ্ডীকে সুদুর্জয় করে তোলে। মানবকল্যাণের দূরপ্রসারী কর্মক্ষেত্রের জন্য সত্য-প্রত্যয় একান্ত আবশ্যক। সে সত্যপ্রত্যয় বর্তমান পৃথিবীর শিক্ষা-সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। শুধু বুদ্ধি দিয়ে এ প্রত্যয় লাভ হয় না। হৃদয়ের নিবিড় অনুভবের মাহাত্ম্যে একে আত্মসাৎ করতে হবে;—এই সাধনা ভারতীয় জ্ঞানের চরম সাধনা!

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

"যিনি সর্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে সমবস্থিত দেখেন, তিনি কখনো আত্ম দ্বারা আত্মঘাত করেন না"—করতে পারেন না। স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে অত বড় কথা আর নেই। 'স্বার্থ' শব্দটাই এতে বিশ্বজনীন হয়ে যায়—কিন্তু······নন্দিতা ভাবনাটা থামাতে চাইল এবার—

এই ভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে; এই দিব্যাগ্নিকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে, সমগ্র মানব-সমাজের অন্তর-দেউলে। ভারত নিশ্চয় স্বাধীন হবে—আর দেরী নেই। স্বাধীনতার সূচনা দেখা দিয়েছে এই গণজাগরণে, এই মহাযুদ্ধের দরুন ইউরোপের অবরুদ্ধশ্বাসে, এই জগৎব্যাপী স্বাধীনতার আন্দোলনে।

এই আন্দোলনে ভারত পশ্চাতে নেই! ভারতের বিশ্বপূজিত জননায়ক মহাত্মাজী মুক্তিলাভ করেছেন; কংগ্রেস বিজয়ের পথে চলেছে। স্বাধীনতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। নেতাজী সুভাষের আজাদহিন্দ্ বাহিনী ভারতকে শত বৎসর এগিয়ে দিল—স্বাধীন হবেনই ভারতমাতা। কিন্তু আজকার দিনে বিশ্বময় যে মনোবৃত্তি, সে অস্ত্রবলের দ্বন্দ্ব, পরস্বলোলুপতার গ্লানি, আত্মরক্ষা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে উৎপীড়িত করছে, অসহায় করে তুলছে, ভারতও যদি সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে, তাহলে যে ঐক্যের দিব্যাগ্নিকে সে ঔপনিষদিক যুগ থেকে শত সহস্র বিপ্লবের মধ্যেও রক্ষা করে এল, তার মূল্য কি থাকবে? ভারতের মৈত্রী করুণার, ঐক্য, সাম্য, শান্তির সেইদিন হবে কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় জয়ী হতে হবে ভারতকে।

—চিঠি আছে মা—ডাক্‌পিওন ডাক দিয়ে গেল।

হাতের লেখাটা দেখেই অধীর আগ্রহে খাম খুললো নন্দিতা; উদয়নের চিঠি, সে মুক্তি পেয়েছে, আগামী কাল সকালেই এসে পৌঁছাবে। এত বড় আনন্দের সংবাদ মা'র কাছে

আর কী হতে পারে? যেন ভারতের স্বাধীনতা লাভের সংবাদই এল; না, তার থেকেও বেশি। কিন্তু সত্যি কি বেশি আনন্দদায়ক? ছেলে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য কারা বরণ করেছিল, সে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু জন্মভূমি তো এখনো মুক্তিলাভ করেনি। তবু এ সংবাদ আনন্দের।

নন্দিতা উঠে গিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করলো। পুত্রের কল্যাণ কামনা করার সঙ্গে মাতৃভূমিরও মুক্তি কামনা করলো। তারপর কাপড়খানা বদলে আনন্দ নিকেতনের দিকে বেরুলো; ওদের এই সুখবরটা দেওয়া দরকার, নইলে ওরা অনুযোগ করবে। দাদা এখানে নেই, ছেলে দুঃখ করবে মামাকে না দেখতে পেয়ে। কিন্তু দাদা রাত্রের গাড়িতে ফিরতেও পারেন।

নন্দিতা ভাবতে ভাবতে আশ্রমে উপস্থিত হোল। অজয় নদীর কিনারায় আশ্রম। অনেকখানা জায়গা জুড়ে ওর কর্মশালা। গো-পালন—মধু-সংরক্ষণ, পশম উৎপাদন ইত্যাদি থেকে সাধারণ গৃহস্থালীর কাজ পর্যন্ত নানা বিভাগে চলে। বেশ বড় কর্মকেন্দ্র। বর্তমানে ওর আয় থেকেই ব্যয় নির্বাহ হবার কথা এবং হওয়াই উচিত, কিন্তু হচ্ছে না; ঋণ হয়ে যাচ্ছে।

নন্দিতা এসে উপস্থিত হোল।

অনেক মেয়ে-কর্মী এখানে কাজ করেন, এবং কাজ শেখেন অনেক মেয়ে-ছাত্রী। এই সব মেয়েরা সকলেই পল্লীর গৃহস্থ কন্যা-বধূ; শহরের কেউ-ই নেই। ইচ্ছা করেই শহরের কাউকে নেওয়া হয় নি এখানে। শহরের তেরো হাত শাড়ি তেইশ পাক পেঁচিয়ে পরবার রেওয়াজ এখানে অচল। এখানকার তৈরি

সাড়ে ন'হাত শাড়িতে ওদের লজ্জা যথেষ্ট ঢাকা পড়ে, এবং সৌন্দর্যও তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। এক এক বয়সের মেয়েদের এক এক রকম রংএর শাড়ি, ব্লাউস, বেশভূষা—তারা প্রায়শঃ এক শ্রেণীতেই কাজ করে—একই রকমের কাজ। অবশ্য শিক্ষয়িত্রী সব সময়ই অন্যরূপ বেশ করেন এবং স্বতন্ত্র থাকেন।

সমস্ত আশ্রমখানি ঠিক একখানি পুষ্পবাটিকার মত ; দূরে দূরে এক একখানি মেটে ঘর; মেঝে সিমেন্ট বাঁধা; তাতেই বিভিন্ন রকমের কাজ চলে—সবই হস্ত শিল্পের ব্যাপার। কোথাও বাষ্প বা বিদ্যুতের বালাই নেই ; এমন কি, রাত্রে আলোও জ্বলে রেড়ির তেল, সরিষার তেল আর কেরোসিন তেলে। সমস্ত আশ্রমটি একযোগে ঠিক ঋষি-যুগের তপোবনের মত দেখতে লাগে। গো-পালনের জন্য বড় বড় চারটি ঘর আছে নদীর কিনারা-দিকে—তার দরজাগুলিও নদীর দিকেই। সকালে দুগ্ধ দোহন শেষ হলেই গরুগুলিকে নদীর ধারে গোচর ভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয় ; তাদের দেখবার জন্য দু'জন রক্ষক নিযুক্ত আছে। কিন্তু গোশালা পরিষ্কার করা থেকে আর সব কাজ করে আশ্রমের মেয়েরা।

আশ্রমের ঠিক মাঝখানে মাটির চৌচালা ঘরে অফিস ; সিমেন্টের পাকা মেঝে—মাঝখানে হল, চারিদিকে ছোট কুঠরী কয়েকটি। এতেই এই আশ্রমের সমস্ত বিভাগের অফিসের কাজ চলে। টেবিল চেয়ার কৌচ একটা ঘরে আছে বটে, কিন্তু সে অতিথি-অভ্যাগতের জন্য। অন্যান্য ঘরে সব বাঙ্গালী-

প্রথায় চৌকী পাতা ; খাতাপত্র রাখবার জন্য র‍্যাক আর মূল্যবান দলিল রাখবার জন্য স্টিলট্রাঙ্ক, কাঠের সিন্দুক।

নন্দিতা সন্ধ্যামুখে এসে পৌঁছালো। এখানকার কর্ত্রী অচলা দেবী অফিসঘরে বসে একটি তরুণী মেয়েকে, দুধের সর তুলবার কথা বোঝাচ্ছিলেন,

—ঘুঁটের জ্বালে খুব আস্তে সর পড়িয়ে নিতে হবে পুরু করে—তারপর…

নন্দিতা প্রবেশ করলো এবং বললো—তুমি যা বলছো, শেষ করে নাও।

অচলা দেবী হাত তুলে নমস্কার জানিয়েই মেয়েটিকে বোঝাতে লাগলেন, সরটা কিভাবে রাখতে হবে এবং তার থেকে কি করে মাখন তুলে ঘি করতে হবে। মেয়েটি সব শুনে শেষে বললো—কিন্তু আমাদের ওদিকে সর তোলে না—দুধ থেকেই মাখন তুলে নিয়ে ঘি তৈরি করে।

—তাও হয়, কিন্তু সর থেকে ঘি আরো সুন্দর আর সুগন্ধী হয়। যাও এখন।

—সবাইকে এইখানে ডেকে আনো তো পাঞ্চালী!—নন্দিতা ওকে বললো।

পাঞ্চালী চলে গেল মাথা নেড়ে। অকস্মাৎ সবাইকে কেন ডাকা হবে অচলা দেবী বুঝতে না পেরে তাকালেন নন্দিতার মুখের পানে। নন্দিতা বলল—সবাই আসুক—কথাটা তখনই বলবো—দাদা কলকাতা গেছেন, তাই আজ দুপুরে আমি আসতে পারি নি ; কোনো অসুবিধা হয় নি তো?

—না দিদি—অসুবিধা কিসের? তবে আজ হিসাব দেখছিলাম, বছরের শেষে চালের কিছু কম পড়বে আমাদের। এই সময় দর যা আছে; তাতে শ' পাঁচেক টাকার চাল কিনে রাখলে সুবিধে হয়।

—দাদা আসুন, তাঁকে বলবো। কতদিনের কম পড়বে মনে হয়?

—মাস দুয়েক আন্দাজ—এখন কিনলে পাঁচশো টাকাতেই হয়ে যাবে—

মেয়েগুলি সব আসতে লাগলো—সন্ধ্যা হয়েছে; প্রার্থনার সময় এখন। এই অফিসের হলঘরেই প্রার্থনার ব্যবস্থা আছে। পাঞ্চালী এবং আরো চার পাঁচটি মেয়ে ধূপ দীপ জ্বালালো। পাঞ্চালী মেয়েটি নতুন এসেছে; গরীব ঘরের মেয়ে, বয়স আঠারো উনিশ বছর; দেখতে এক কথায় চমৎকার। বিশেষ চোখ দু'টি। রং শ্যামল কিন্তু গঠন এতো ভাল যে চেয়ে দেখতে হয়। আঠারো বছরের মেয়ে, অথচ ওকে ক্লাস থ্রিতে পড়তে হবে। এই বয়সের মেয়ে অবশ্য এরকম আরো তিন চারটি আছে; অজ পাড়াগাঁ থেকে এদের সংগ্রহ করা। এরা সবাই বাল-বিধবা! কিন্তু পাঞ্চালীর কথাবার্তা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং সুন্দর উচ্চারণ-শক্তি দেখলে ওকে কিছুতেই লেখাপড়া-না-জানা মনে হয় না।

নন্দিতা লক্ষ্য করছিল পাঞ্চালীর প্রদীপ জ্বালার সুষ্ঠু ভঙ্গী, ধূপ দেবার সুন্দর ভাব—এ সব কাজে ওর পটুত্ব অসাধারণ। অচলা দেবীকে শুধুলো নন্দিতা,—এ মেয়েটি পূজো আচ্চার কাজ তো ভালই জানে, দেখছি।

—কাজ সবই জানে ও, রান্নাবাড়া থেকে সব কিছু ; শেখেনি শুধু ইংরাজি পড়া, কিন্তু কিছু আটকায় না ; ওর বুদ্ধি এত অসাধারণ যে গোবরের দাগ দিয়েই ও সাড়ে চার মণ দৈনিক দুধের হিসাব আজ বাইশ দিন ধরে রেখে আসছে; আধপো ভুল হয়নি! ওই তো কাল চালের হিসাব করে আমাকে বললো যে চাল কম পড়বে।

—বলো কি !—নন্দিতা আশ্চর্য হয়ে শুধুলো—এটুকু মেয়ে, কোথায় শিখলো ?

—খুব পুরানো পরিবারের মেয়ে। ওদের বাড়িতে এখনো দিন ন'সের চাল সিদ্ধ হয়। বাবা কাকা চার ভাই, তাদের ছেলে মেয়ে, বিরাট সংসার একান্নবর্তী এখনো।

নন্দিতা আর কিছু শুধুলো না। পাঞ্চালী অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ধূপ দীপ সাজিয়ে পুষ্পার্ঘ্য রচনা করলো—তারপর শঙ্খধ্বনি করে স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করলো,

—"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে॥

দীর্ঘ স্তোত্র সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে গেল পাঞ্চালী বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে। চমৎকার ওর উচ্চারণ, নির্ভুল, নিখুঁত ! নন্দিতা আশ্চর্য হয়ে শুধুলো,—তুমি তো বেশী লেখাপড়া শিখনি মা, এমন নির্ভুল উচ্চারণ কি করে শিখলে ?

—আমার কাকা শিখিয়েছেন, আমার ছোটকাকা ; বাড়িতে নিত্য চণ্ডীপাঠ হয়।

—তোমার ছোটকাকা পাঠ করেন ?

—আজ্ঞে না—তিনি এখন জেলে আছে এখন মেজকাকা পাঠ করেন।

—জেলে আছেন? কেন মা?

—তিনি ভারতমাতার মুক্তি চান কি না, তাই ইংরাজ তাঁকে বন্দী করেছে!

—ও—নন্দিতা আধমিনিট থামলো, তারপর বললো আস্তে,

—মুক্তিসাধক যাঁরা জেলে আছেন তাঁরা সকলেই প্রায় মুক্তি পাচ্ছেন, তোমার ছোটকাকাও নিশ্চয় মুক্তি পাবেন মা—ভেবো না, আজ আমি এখানে একটি আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি; শোন সব। এই পৃথিবীতে তোমরাই আমার একান্ত আপনার, তাই তোমাদিগকেই সেই আনন্দের খবরটি দিতে এলাম। আমার একটি মাত্র ছেলে—সে জেলে গিয়েছিল—সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে; কাল আসবে। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা সে দেখে গিয়েছিল, কিন্তু এর বর্তমান উন্নত রূপ সে দেখেনি। দেখে নিশ্চয় খুব খুশি হবে। তোমাদিগকে এই খবরটি জানাবার জন্যই আমি এলাম—তোমার ছোটকাকাও যেদিন আসবেন মা পাঞ্চালী, তাঁকে এই আশ্রম দেখতে আমাদের সাদর আহ্বান জানিও!

—জানাবো—সস্মিত ঘাড় নাড়ালো পাঞ্চালী।

অচলা দেবী এবং আরও তিন চারজন শিক্ষয়িত্রী পরস্পর কি একটু গুঞ্জন করে নিলেন, তারপর অচলা দেবীই বললেন,

—এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী নন্দিতা দেবীর একমাত্র পুত্রের কারামুক্তিকে অভিনন্দিত করবার জন্য আমরা সকলে স্টেশনে

গিয়ে, তাঁকে অভ্যর্থনা করবো—আমাদের নেত্রী নন্দিতা দেবীর কাছে অনুমতি চাইছি।

—না—নন্দিতা দৃঢ়কণ্ঠে বললো—অত সমারোহ করবার কিছু দরকার নেই। এখনো জননী ভারতের বন্ধন মোচন হয়নি, উৎসবের এ সময় নয়। যারা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ফিরে আসছে, তারা আবার যাবে, বারংবার যাবে, যতক্ষণ মা'র বন্ধন মোচন না হয়। মা'র মুক্তির পর যেদিন তারা ফিরবে, সেদিন হবে উৎসব--মহা মহোৎসব। কাল আমি একা তাকে আনতে যাব।

সবাই চুপ করে রইল, নন্দিতার কথার উপর কথা বলবার মত সাহস কারো নেই। কিন্তু পাঞ্চালী ধীরে এগিয়ে এসে বললো অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে,—

—আপনি কি এই আশ্রমের কর্ত্রী হিসেবে আদেশ করছেন, আমরা কেউ যেতে পাব না স্টেশনে? তা যদি হয় মা, তাহলে আশ্রমের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম।

—না মা, কর্ত্রী হিসাবে আমি তো কোনো আদেশ করি না। কর্ত্রী আমি নই—আমিও সেবিকা।

—তা হলে—পাঞ্চালী একটু থামলো—তাঁকে আনতে স্টেশনে যাবার অধিকার একা আপনারই আছে, বলছেন কেন মা? দেশমাতার তিনি ভক্ত সন্তান, আমরাও দেশের মেয়ে; তাঁকে সভক্তি প্রণতি জানিয়ে অভ্যর্থনা করবার অধিকার আমাদের নিশ্চয় আছে।

—তা নিশ্চয় আছে—নন্দিতা এই বালিকার কাছে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু তক্ষুনি সামলে বললো—কিন্তু আমি সমারোহটা অপছন্দ করি মা।

—স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে সমারোহ কি বলা যায় মা! যদি যায় তো তাকে বাধা দেবেন কি দিয়ে? আমরা তো ঢাকঢোল বাজাতে চাইছি না।

—না, সমারোহ কিছুই করা হবে না দিদি!—অচলা বাগ পেয়ে কথা বললো,—আমরা শুধু গিয়ে তাকে নিয়ে আসবো জাতীয় পতাকা উড়িয়ে আর বড়জোর শাঁখ বাজিয়ে! আপনি অনুমতি দিন!

নন্দিতা বিব্রত বোধ করছে। কিন্তু পাঞ্চালী বললো,

—ওঁর অনুমতির অপেক্ষা আমরা কেন করবো মাসিমা? আশ্রমের শৃঙ্খলা যদি ক্ষুণ্ন না হয়, তাহলে আর তো কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয় ওঁর! সেই বীরের উপর আমাদের যে কর্তব্য, তা আমাদের করাই উচিত।

নন্দিতা চুপ করে রইল; ও বুঝেছে, ওর হার হচ্ছে এই মেয়েটির কাছে। লেখাপড়া ও নিশ্চয়ই জানে, অন্ততঃ ক্লাস থ্রির চেয়ে বিদ্যে ওর নিশ্চয় বেশি, নইলে এমনভাবে, এমন ভাষায় কথা কইতে পারতো না। গুপ্তচর নয় তো মেয়েটা? নন্দিতা কঠোর দৃষ্টিতে তাকালো ওর পানে। কিছুই বোঝা যায় না; অত্যন্ত সরল বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। চোখের উজ্জ্বলতার সঙ্গে রমনীয়তা অসাধারণ রকমে মিলেছে। কদাচিৎ এমন সুন্দর চোখ দেখা যায়। নন্দিতা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে নাকি!

পাঞ্চালী ইতোমধ্যে আর একদফা প্রার্থনা আরম্ভ করে দিল সব মেয়েদের নিয়ে। বয়সে ছোট হলে কি হবে—ভালো ভালো স্তোত্র-গান ওর মুখস্থ, আর গলা এত চমৎকার যে, ও থাকলে অন্য কেউ আর এগুতেই চায় না স্তোত্র গাইবার জন্য। পাঞ্চালী গাইতে লাগলো,

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোগ্নি বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতি স্তং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেস্তু সহস্রকৃত্বঃ, পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে ॥

এখানে কোনো মূর্তি নেই; সার্বজনীনভাবে বিশ্বপিতার চরণে প্রার্থনা করা হয় একত্র হয়ে। উপচার ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য পুষ্পমাল্য; কোন গোড়ামি যাতে আদৌ না থাকে, তার জন্যই কোন দেবতার নাম উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় না। প্রার্থনার পর কোন কোন দিন নন্দিতা বা অচলা হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম বা মুসলমান ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে এবং সব মতেরই চরম সত্যতত্ত্ব যে এক ঈশ্বর, সেই কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। নন্দিতা এই ঐক্যের ভাবটি বিশেষভাবে বোঝাবার জন্যই আজ তৈরি হয়ে এসেছিল—কিন্তু পাঞ্চালীর দিকে ওর মনের অর্ধেকটা লিপ্ত হয়ে গেছে। তবুও কিছু বলতে হবে, তাই নন্দিতা আরম্ভ করলো,

—আজ আমি এখানে একটি বিশেষ কথা বলবার জন্য এসেছি। সুদীর্ঘ দিন হোল এই ভারত রাজনৈতিক ভাবে পরাধীন হয়ে আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতের সাংস্কৃতিক পরাজয় কোথাও ঘটে নি; বহুবার এমন ঘটেছে, ভারত তার

নিজস্ব প্রাণসত্ত্বাকে প্রায় বিসর্জন দিতে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আর্বির্ভাব ঘটেছে কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বশালী দেব-মানবের যার প্রভাবে আবার ভারতের সুপ্ত আত্মচেতনা ফিরে এসেছে। বারবার এই রকম ব্যাপার ঘটেছে—এমন কি, ইংরাজ আমলেও ঘটেছে—রাজা রামমোহন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এসেছেন ভারতে, ভারতের সুপ্ত আত্ম-চেতনাকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন; এসব ইতিহাসের কথা, কিন্তু—নন্দিতা প্রায় আধ মিনিট খানেক থামলো,—কিন্তু বর্তমান দিনে ইংরাজের শাসনাধীন ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি রাজনৈতিক ভেদ বিভেদ সৃষ্টি করা হোল, এমন বিদ্বেষের বহ্নি জ্বেলে দেওয়া হোল যার ধূমায়িত শিখা আমাদের সনাতন স্থির বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দিতে চাইছে—যার ধূম্রজাল আমাদের চোখকে অন্ধ করছে।

ভারতের সাধনা সাম্যের সাধনা নয়—ঐক্যের সাধনা; ভারতের বাণী ঐক্যের বাণী; ভূতেভূতে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার—সর্বজীবের মধ্যে এক ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির আবির্ভাবে বিশ্বাস ভারতীয় সাধনার মূল কথা। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতায় ভারতের সেই সনাতন প্রজ্ঞাকে প্রচ্ছন্ন করে কতকগুলি স্বার্থান্বেষী দলের সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা আপনার পাতেই ঝোল টানবার জন্য ব্যস্ত। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা কতদিন চলবে, কে জানে? হয়তো আরো ব্যাপক হবে, আরো ভয়ানক হবে এই স্বার্থপরতা, কিন্তু এই মহা অমঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলের বীজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—ভারতের গণশক্তির অন্তর দীর্ঘকাল পরে

চঞ্চল হয়েছে, বিক্ষুব্ধ হয়েছে; বিশাল গণতুণ্ড আন্দোলিত হচ্ছে—ভারত তার নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে—এ তারই সংকেত।

কিন্তু গণমনকে শক্তিশালী নেতৃত্ব বহু সময় বিপথে পরিচালিত করে, এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। গণমন তখন বুঝতে পারে না, কোথায় যাচ্ছে। এর ফলে জাতির যে অধঃপতন ঘটে, ভবিষ্যৎ বংশধর পূর্বপুরুষকে তার জন্য কদর্য ভাষায় আখ্যাত করে। ভারতের এখন সেই অতি বিপজ্জনক অবস্থা। গণমন শক্তিশালী নেতৃত্বের পরিচালনায় যেন ভুল পথে না যায়। তার ব্যবস্থা এখন থেকে করা দরকার।

বর্তমানে এমন কতকগুলি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে ভারতে, যারা ভারতের কল্যাণ চাইবার পূর্বে চায় নিজের দলগত স্বার্থপূরণ, নিজেদের মধ্যে পদাধিকার লাভ, ক্ষমতা আয়ত্ত করা। ইংরাজ এই সুযোগ গ্রহণ করবেই এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সর্বনাশ সাধন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের কয়েকজন শক্তিশালী নেতার মধ্যে ভারতীয়ত্ব নিতান্তই কম; আন্তর্জাতিকতায় তাঁদের আপাদমস্তক পরিপূর্ণ, অথচ ভারতের স্বল্পশিক্ষিত জনমন তাঁদের কথাতেই উঠে-বসে—দেশের কত ক্ষতি যে এই ভাব-বিপর্যয়ের দ্বারা হতে পারে, বর্তমান হুজুগের দিনে ভারতবাসী সেটা ঠিকমত বুঝতে পারছে না; কিন্তু একদিন হুজুগ থেমে যাবে এবং স্থির শান্ত চোখে যখন ভারত আপনাকে দেখবে, তখন দেখবে তার অঙ্গের বহুস্থান ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে—সে আর সেই গৌরবের আসনে নেই।

এই দুর্দিনকে আমাদের ঠেকাতে হবে। আমাদের কর্মশক্তি এখনও সীমাবদ্ধ—এবং অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু আমরা এই শক্তিকে বর্ধিত করবো, ক্ষীণ স্রোতোস্বতীকে মহাবেগবতী পদ্মায় পরিণত করবো—প্রয়োজন হয়—আমরা মৃত্যুপণ করে এগিয়ে চলবো আমাদের জাতিয় ঐতিহ্য, আর ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য—তোমরা আমার সঙ্গে সমস্বরে এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ কর!—নন্দিতা থামলো!

নন্দিতা কি বলতে চাইছে—পরিষ্কার করে বোঝা গেল না, কিন্তু সকলেই অনুভব করলো—ওর কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা জ্বালা রয়েছে, যার শিখা সকলের অন্তরকেই জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আজন্ম বিপ্লবী উমাশঙ্করের বোন সে—তার চিন্তাশক্তি অন্য সকলের থেকে পৃথক এবং তীক্ষ্ণ—তাই কেউ কোনো প্রতিবাদ করবার বা সমর্থন করবার চেষ্টা করলো না। কিন্তু পাঞ্চালী এগিয়ে এসে বললো নীচু গলায়,—

—ভারতের সাধনা যুগযুগান্তের পরীক্ষিত সাধনা; এ সাধনার অন্তরে সত্যবস্তু আছে বলেই এতো ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও আজো টিকে আছে; আর আমার মনে হয়, এই সত্যবস্তুকে, সদ্বস্তুকে ক্ষণিকের জন্য মলিন করে তুললেও খনির সোণার মত সে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার জন্য এমন জীবন পণের প্রতিজ্ঞার কি প্রয়োজন মা? যদি সত্যবস্তু কিছু না থাকে এই সংস্কৃতির মধ্যে, তাহলে এ-বস্তু গেলেও ক্ষতি তো কিছু নেই?

—সত্যবস্তু আছে, এ সত্য প্রতি ভারতীয় অন্তর প্রাণ-মন

দিয়ে অনুভব করে—তাই এত বেদনা জাগে এ বস্তু যাওয়ার আশঙ্কায়; কিন্তু পাঞ্চালী, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এমনভাবে শিক্ষা আর সংস্কৃতির পার্থিব ভোগ-প্রবণতাকে এই ভারতের হোমগন্ধী মৃত্তিকায়, ত্যাগপূতঃ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে যে এ দেশের শক্তিশালী গণনৈতৃত্বও আজ প্রাণ-মনে ভারতীয়ত্ব অনুভব করতেই পারেন না—ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে ঠিকমত বুঝাইতে চান না! ইউরোপের ভোগবাদ-মূলক দেহগত দর্শনের দুরবীনে জীবনকে দেখে তারা আজ সাম্য প্রতিষ্ঠায় কেউ কেউ বাহুপ্রসার করেন। কেউ কেউ শান্তি-শৃঙ্খলার রামরাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর থাকেন--কেউ বা আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে দেশের প্রাণকেন্দ্রকে অধিকার করে আপনার দেবত্ব বিকাশের ব্যবস্থা করেন। কথাগুলো শুনতে খুবই রূঢ় এবং আমার বলতেও ব্যথা বোধ হচ্ছে—কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ভারতীয়রা আজ স্ববৈশিষ্ট্য হারিয়ে ইউরোপীয় প্রথায় দেশের গণমনকে চালিত করতে চায়—ভারতীয় ঐক্যের বাণীকে সে ভুলেছে। আমি চাইছি—আমরা ভারতের সেই পরীক্ষিত ঐক্যের বাণীকে ভারতে—বর্হিভারতে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেব। যুদ্ধোত্তর ভারতের অবদান হবে ভারতের গম্ভীর তত্ত্বকথা জগতের মানুষকে জানানো, যে বাণী বলে—

মিত্রস্য মা চক্ষুধা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহম্ চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে॥

'সকল জীব যেন মিত্রের চক্ষুতে আমাকে দেখে এবং আমিও

যেন সকল জীবকে মিত্রের চক্ষুতে দেখতে পারি—আমি যেন সকল জীবের মিত্র হতে পারি'—এই সাধনা ভারতের সাধনা—আত্মপর ভেদরহিত ঐক্যের সাধনা—এই সাধনার বাণীর আমরা বাহিকা—আমরা অগ্নিহোত্রী।

পাঞ্চালী আর কিছু বললো না, শুধু মাথা নাড়িয়ে জানালো যে সে বুঝেছে। অতঃপর, সকলে নন্দিতার উচ্চারিত কথাগুলি বলে গেল—আমরা মৃত্যুপণেও আমাদের ভারতীয় সাধনার বাণী—ঐক্যের বাণী, শান্তির বাণী বিশ্বে প্রচার করে চলবো আমরণ।

সব শেষ হলে নন্দিতা বিদায় চাইল! অচলা দেবী বললেন, আগামী কাল সকালে পাঞ্চালী এবং আরও কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে তিনি স্টেশনে যাবেন উদয়নের অভ্যর্থনার জন্য।

নন্দিতা কিছু না বলে বাড়ি চলে এলো—রাত তখন আটটা।

সুন্দর জোৎস্নায় ইলা তাকালো তার দীর্ঘ-দিনের না-দেখা প্রেমাস্পদের পানে। সেই যৌবন-চঞ্চল লাবণ্য ঢল-ঢল তনুখানি নেই, নেই সেই উদ্দাম অহংকারী দৃষ্টি, কিন্তু পৌরুষ তেমন আছে—বরং বয়সের গাম্ভীর্যে এই ষষ্ঠীবর্ষীয়ার প্রৌঢ় আরো সৌম্য, আরো শান্ত, আরো বীর্য-স্থির। ইলা অপলকে চেয়ে রইল।

শঙ্করও দেখেছিলেন ইলাকে; দীর্ঘদিন পরে দেখা—কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন না তিনি। ইলা একটু স্থূলকায়া হয়েছে—তার বর্ণ-সুষমা হয়তো তেমনি জ্যোতিতরঙ্গ বিস্তার করছে না তার শ্যামলোজ্জ্বল তনুশ্রীতে—কিন্তু তারুণ্য এখনো তেমনি আকর্ষনীয়—তেমনি চক্ষু-স্নিগ্ধকর। শঙ্কর অল্প একটু পরেই মুখ ফিরিয়ে অনুভার পানে চাইলেন। অনুভা তাঁর পরিচিতা; বললেন,

—তোমার আঙুলে ব্যাণ্ডেজ কেন মা—অনুভা?

—ও বিশেষ কিছু নয়—বলে অনুভা পাশ-কাটিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শঙ্কর তার হাতটা ধরে বললেন—ছুরিতে হাত কাটিয়েছ, নাকি বোমা ছুঁড়তে গিয়েছিলে?

—বোমা!—ওরে বাপরে! বোমা চোখেই দেখি নি কোনোদিন।—অনুভা হাসলো।

—বোমায় কি শুধু একটা আঙুল কাটে মামাবাবু?—অরুন্ধতী বললো—আপনারা কি ঐ রকম পট্‌কা-বোমা ছুঁড়তেন নাকি যাতে শুধু আঙুল কাটে?

—না মা, আমরা যে বোমা ছুঁড়তাম তাতে ইংরাজের "ল এণ্ড অর্ডারে" প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অপমানের দাগ কেটে যেত—কিন্তু সে অনেক পুরানো দিনের কথা।

—তা হোক, মামাবাবু—আমি শুনবো—অরুন্ধতী আবেদন জানালো শঙ্করের, কোল ঘেঁসে! ইলা ইতোমধ্যে অনেকটা আত্মস্থ হয়ে উঠেছে। বললো,

—চলো শঙ্করদা, ঘরে ওঠো—আলোতে তোমাকে একবার ভাল করে দেখি!

—ভগবানের আলো কি যথেষ্ট নয় ইলা? এমন সুন্দর চাঁদের আলো.........

—না—ইলা বললো—বর্তমান যুগের সব-কিছু কৃত্রিমতার যুগে কৃত্রিম আলোতেই দেখতে হবে।

—কিন্তু অকৃত্রিমকে তাতে কি চেনা যায়? রঙিন আলোতে সাদাকেও রঙিন দেখায় ইলা—বলতে বলতে কিন্তু ঘরের পানে আসছিলেন শঙ্কর।

সোফার গাড়ি ঘুরিয়ে গ্যারেজে রাখতে গেল। সেই সময় হেড লাইটের তীব্র আলোটা পড়লো ইলার জরী-পাড় মিহি শাড়িতে; ঝলমল করে উঠলো শঙ্করের চোখের উপর সেই জ্যোতি। শঙ্কর এক মুহূর্তের জন্য থেমে ভাবলেন—ইলার বয়স ত্রিশেই থেমে আছে; বয়সকে বন্দী করার কৌশল ও শিখলো কেমন করে? ও তো জানতো না। আজন্ম কুমার উমাশঙ্করের বয়সও অবশ্য পঞ্চাশের আগেই বন্দী, তাঁকেও ষাট বছরের মনে হয় না—তবে নিজের বেশভূষায় তিনি স্বয়ংই প্রৌঢ়ত্বের ছাপ এঁকে রাখেন। এতে গাম্ভীর্য বাড়ে এবং মনও তাঁর শান্ত থাকে।

বারান্দায় উঠে এলেন সকলে। ইলা ঠিক শঙ্করের পিছনে আসছিল; অনুভা সর্বাগ্রে আর অরুন্ধতী শঙ্করের পাশে পাশে। হলঘরে ঢুকে অনুভা বড় বাতিটা সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল—বললো,

—দেখ মা—আমি দেখে এসে যেমনটি বলতাম, মামাবাবু ঠিক তেমনটি আছেন কি না—দেখ—দাঁত একটাও নড়েনি ওঁর।

দাঁত নড়ছে; শঙ্কর কিন্তু কিছু বললেন না এবার। ইলা ওঁকে ওখানে বসতে দিল না—বললো—উপরে গিয়েই বসবে, চলো।

—আমি বহুক্ষণ এসেছি ইলা—তোমার ব্যস্ত হবার কিছু দরকার নেই। যাও—কাপড় চোপড় ছাড়—আমার ব্যবস্থা অরু-মা আগেই করেছে।

ইলা অরুন্ধতীর দিকে একবার সস্নেহে চেয়ে চলে গেল।

অনুভাও গেল কাপড় চোপড় বদল করতে। শঙ্কর উজ্জ্বল আলোকিত হল ঘরটায় দাঁড়িয়ে রইলেন; কাছে অরুন্ধতী। একটু থেমে অরুকে শুধুলেন,

—তোমার বাবার ফিরতে কত দেরী হবে মা অরু?

—ঠিক নেই—আট দশদিন দেরী হতে পারে। কেন?

—আমার বোন একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছে। তোমাদের নিয়ে যেতাম সেটা দেখাবার জন্য!

—বেশ তো, চলুন না—কালই চলুন!

—কিন্তু তোমার বাবার মত……

—কিছু দরকার নেই! বাবার অমত কখনো হবে না—আপনার বাড়ি যেতে তো নয়ই! আমি যাবো মামাবাবু—আমার বড্ড যাবার ইচ্ছা করে আপনার ওখানে।

—তুমি যখন ইচ্ছা যেতে পার মা—তোমার মা'কে নিয়ে যাবার কথা ভাবছিলাম!

—মা ইচ্ছা করলেই যেতে পারে—আর মা ইচ্ছা করবে।

—করবে ?

—করবে কি—করেছে, শুধু আপনি বলবার অপেক্ষা !

হাসলো অরুন্ধতী। বললো,

—আপনার কথা মা এতো বেশী করে বলে যে সময় সময় আমাদের মনে হয়—এতোদিন আপনার সঙ্গে দেখা না করে মা আছে কি করে। মা'র সঙ্গে আপনার কি কখনও ঝগড়া হয়েছিল মামাবাবু ?

—না মা—বলেই কিন্তু শঙ্কর সামলে গেলেন। এই শিশু-মনের সরল প্রশ্নের উত্তর তাঁকে সাবধানে দিতে হবে। সে-দিনের যৌবনোচ্ছল প্রেম আজ জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে সমাধিস্থ। এরা সন্তান—শুধু স্নেহের পাত্রই নয়, সমীহের পাত্রীও; একটু ভেবে নিয়ে বললেন,

—ঝগড়া নয় মা—আমার বৈপ্লবিক মতবাদ তোমার মার সহ্য হোতি না।

—কিন্তু এখন তো আর আপনি বিপ্লবী নন !

"—না, সে-যুগের বিপ্লবী আর নেই আমি—তবু আমি বিপ্লবী আজও। আমার একমাত্র ভাগিনেয়কে আমি আমার আদর্শেই গড়ে তুলেছি—সে বিপ্লবী।

—কোথায় তিনি ?

—জেলে !—বলে শঙ্কর জানালার কাছে এসে আকাশের পানে তাকালেন।

—রাজনৈতিক বন্দীরা প্রায় সকলেই মুক্তি পাচ্ছেন, মামাবাবু, তিনিও নিশ্চয় পাবেন।

—হয়তো পেতে পারে; কিন্তু তাদের মুক্তিলাভ আবার দ্বিগুণ উৎসাহে জেলে যাবার জন্যই!

হাসলেন শঙ্কর কথাটা বলতে বলতে। ইলা ফিরে এসেছিল নীচে। বললো,

—কার কথা বলছো শঙ্করদা? তুমি কি আবার জেলে যাবার মতলবে আছ নাকি?

—না—শঙ্কর ফিরে দাঁড়ালেন—এখন নবাগতদের জন্য যায়গা ছেড়ে দিয়েছি। আমার ভাগনে উদয়নের নাম শুনেছ কি তুমি ইলা! আমার আদর্শেই তাকে আমি গড়েছি!

—অর্থাৎ বিপ্লবী করে তুলেছ! কৈ—ওর কথা তো অনুভা বা তার বাবা আমায় বলেনি!

—আমার আদর্শ সম্বন্ধে তোমার ধারণা এতো ক্ষুদ্র ইলা? শুধু বিপ্লবী হওয়া ছাড়া আমার এত বড় ষাট বছরের জীবনটায় আর কোনো বড় আদর্শ নেই, মনে কর?

—না—তা মনে করিনে, কিন্তু তোমার সেদিনের জীবন ছিল গোটাগুটি বৈপ্লবিক—।

—তা হয়তো ছিল; কিন্তু তার অভ্যন্তরে ছিল স্বাধীন ভারতের সামগীতি, বীর্যমহিমা, ভারত-পুত্রের ধনুর্বেদ চর্চার গৌরব—তপস্বী ভারতের ত্যাগপুতঃ হোমাগ্নি!

ইলা চুপ করে রইল একটু, তারপর নারীজনোচিত কৌতুহলে প্রশ্ন করলো,

—তোমার সেই ভাগনেটি জেলে আছে—বলছিলে না?

—হ্যাঁ!

—তার বিয়ে হয়েছে ?

—বিয়ে ?—না—বিয়ে করবার সময় পেল কখন ! তাছাড়া বয়সও হয়নি বেশি। তবে বিয়ে দিলে মন্দ হয় না—হাসলেন শঙ্কর—এরপর ভারতে আর কোনো বৈপ্লবিক আন্দোলন হবে বলে মনে হচ্ছে না। এখন বৌ নিয়ে ঘর করার দিন এল !

ইলার বহুদিন পূর্বের বলা কথাটারই যেন আজ প্রতিধ্বনি করছেন শঙ্কর। সেদিন বৌ নিয়ে ঘর করবার দিন ছিল না।

কেন একথা বলছেন মামাবাবু ? —অনুভা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো। ভারত তো এখনো স্বাধীন হয়নি—শীগ্রি হবে বলেও মনে হচ্ছে না !

—মনে হচ্ছে ! যুদ্ধোত্তর ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে, ইংরাজ সেটা বুঝেছে, তার ব্যবস্থাও করছে। তবে যে-স্বাধীনতা সে দেবে, তাতে ভারত-সন্তানের গর্ব করবার মত কি থাকবে, তা বলা কঠিন। হয়তো সে-স্বাধীনতা হবে ভারতমাতার খণ্ডিত বিকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত—জাতিবিদ্বেষে বিচ্ছিন্ন—বর্ণের অন্ধতায় সঙ্কীর্ণ—হিংসায় কলঙ্কিত ! হয়তো সেই চরম সংকটে ভারতের অতীতের সমস্ত সাধনা উচ্ছন্ন হয়ে যাবে কিংবা—বর্ষাগমে নবাঙ্কুরের মত জেগে উঠবে—কি হবে, বলা যায় না ; তবে একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে, ইংরাজ ভারত ছাড়বে।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইল ! অনুভাই একটু চপলা, বললো—ইংরাজতো যাক—তারপর আমাদের ব্যবস্থা আমরা করে নেব।

— যাবে. যাবার আগে তোমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে ;

ইংরাজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্—এ সত্য আগামী পাঁচশো বছর ভারতবাসীকে মর্মে মর্মে অনুভব করতে হবে! কিন্তু এসব কথা বলতে হলে আমাদের দেশেরই আত্মীয়দের সমালোচনা করতে হয়—আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়! বর্তমানে সেটা ঠিক হবে না। মহাকাল দেখছেন, তিনি জেগে আছেন। তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

এরপর কোনো কথা আর চলে না; আজন্ম ঈশ্বর-পরায়ণ শঙ্কর দেবতার কোপে এবং কৃপায় বিশ্বাসী। কিন্তু অনুভা বর্তমান যুগের বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ছাত্রী। বললো,

—মহাকাল কিছু দেখছেন না মামাবাবু। দেখছে শক্তিশালী রাষ্ট্র—এ্যাটোম বোমা—মৃত্যুরশ্মি!

—ঐ এ্যাটোম বোমার মধ্যেই যে শক্তিশালী রাষ্ট্রবর্গের কবরের ব্যবস্থা নেই, একথা কে বলতে পারে অনুভা? পার্থিব শক্তির থেকে অপার্থিব শক্তি অনেক বড়। একটা ভূমিকম্প বা একটা জলপ্লাবন, এমন কি সামান্য সাইক্লোনও তোমাদের বৈজ্ঞানিক এ্যাটোম বোমার থেকে শক্তিশালী। বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞান যা কিছু করেছে—তার সবই সেই পঞ্চভূত নিয়ে। অতিরিক্ত কিছুই সে সৃষ্টি করতে পারে নি আজো! বিজ্ঞানের অহঙ্কার করো না; শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—বিজ্ঞান আজো পরীক্ষামূলক। আজ যে তত্ত্ব সত্য বলে গৃহীত, কাল সেই তত্ত্ব বাতিল হচ্ছে। তবে বলা যায়, বিজ্ঞান সত্যানুসন্ধী। সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যই তার সাধনা। কিন্তু সেই আবিষ্কৃত সত্যকে কল্যাণকরী করবার চেষ্টা মানুষ করছে কি? না, এর

একমাত্র উত্তর—না! মানুষের মনের বর্তমান গঠন এমনি যে নিজের স্বার্থ, দাম্ভিকতা আর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তার প্রতিযোগিতার প্রচেষ্টা অনলস হয়ে উঠছে ক্রমশঃ! কে বলতে পারে, এই ভাবে আরো কয়েক শতাব্দী অগ্রসর হলে পারস্পরিক বিরোধে পৃথিবীর মানুষ ধ্বংস হবে না?

—সেটাকে কি আপনি মহাকালের লীলা বলবেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়! বর্তমান বিজ্ঞান মানবজাতির উন্নতি করেছে কি অবনতি ঘটিয়েছে তা নির্ণয় করা সুকঠিন! মানুষের মনের যে নৈতিক নিষ্ঠা, যে শুদ্ধাচারিতা, যে সরলবিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, যার ফলে আরণ্যক জীবনেও তার শান্তির অভাব ছিল না, তা সে হারিয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। আবার বিজ্ঞান তার জন্য বহু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম এনে দিয়েছে; জীবনের ক্ষেত্রকে ব্যাপক করেছে; জল স্থল আকাশকে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছে কিন্তু তাকে ক্রমাগত অভাবের আবর্তে ফেলে অশান্তির চরম গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে! মানুষের শ্রেয়ঃ কি এবং কি তার প্রার্থনীয়, এই মূল প্রশ্নের সমাধান কতটুকু করেছে তোমাদের বর্তমান পদার্থ বিজ্ঞান, বলতে পার?

অনুভা অহঙ্কারী মেয়ে, কলেজের বিদ্যা ছাড়া তার বিদ্যা বেশী নয়। কিন্তু কলেজের বিদ্যার মস্ত গুণ, হার স্বীকার না করা; অপরের মতকে মেনে না নিয়ে তর্ক তাকে করতেই হবে! তাই সে উদ্যত হোল, কিন্তু ইলা থামিয়ে দিল তাকে—বললো, —থাম্ অনু, কতটুকু তুই জানিস যে ওর সঙ্গে তর্ক করতে যাচ্ছিস! চলো শঙ্করদা, খাবে।

—চলো—বলে শঙ্কর এগুলেন।

অরুন্ধতী এতক্ষণে ফাঁক পেয়ে মাকে বললো—জানো মা, মামাবাবু কাল তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন ওঁর কি আশ্রম আছে, তাই দেখবার জন্য ; যাবে ?

—কোথায় ?—ইলা প্রশ্ন করলো শঙ্করকে !

—কালই বলছি না আমি—যেদিন সুবিধে হয়, একদিন গিয়ে নন্দিতার সঙ্গে আলাপ করে আসবে আর তার আশ্রমটা দেখে আসবে—শঙ্কর বললেন।

—তা বেশ তো ! কালই যেতে পারি। মোটরে যাওয়া যায় না ?

—যায়—ট্রেনেও যাওয়ার অসুবিধা নেই ! কিন্তু তোমার স্বামী এখানে নেই—

—তাতে কি ? চলো না, কালই দেখে আসি ! কি রকম আশ্রম ?

—সেটা গিয়েই দেখবে ! নন্দিতা করেছে 'সেই আশ্রম' ! অবশ্য আমিও যুক্ত আছি পরোক্ষে। তোমার সক্রীয় সাহায্য পেলে সে খুশি হবে।

—আমি কি কিছু করতে পারবো ? চলো তো দেখি !

খেতে বসালো ইলা শঙ্করকে ; দীর্ঘদিন পরে, সুদীর্ঘকাল পরে। সেদিন ইলা সম্পন্না ছিল না—কিন্তু সমৃদ্ধা ছিল তার অন্তর-ঐশ্বর্য্যে ; আজকার ইলা সম্পদবতী কিন্তু অন্তর তার—ইলা শঙ্করের মুখের পানে চাইল ! আজন্ম কুমারের প্রসন্ন মুখ—প্রৌঢ়ত্বের ছাপ নিতান্তই কম—শুধু জেল-খাটার চিহ্ন কিছু

রয়েছে ইংরাজের বেটনের দাগ। ইলার মনে হচ্ছে, কপালের দাগটায় হাত বুলিয়ে দেয়; কিন্তু মেয়েরা রয়েছে, বড় মেয়ে! ইলা সামলে গেল! অরুন্ধতী হাসিমুখে বললো,

—আমাকে কাল সঙ্গে নেবে তো মা? তুমি তো এ পর্যন্ত আমাকে যেতেই দাও নি মামাবাবুর কাছে! ভগবানের লীলা দেখ—ভগবান সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনোটাই নেই মামাবাবু! শোন মা,—এ বাড়িতে যখন উনি এলেন, তখন আমিই প্রথম প্রণাম করতে পেলাম। তোমরা জব্দ হলে তো?

—হ্যাঁ—তা হলাম—ইলাও হাসলো!

—ঠিক তোমার মতটি হয়েছে ও—শঙ্কর খেতে খেতে বললেন।

—তার জন্যই তো ওকে পাঠাতাম না—ইলা আবার হাসলো।

কোন্ গভীর মনস্তত্ত্বের প্রভাবে নিজের আকৃতির সাদৃশ্যলব্ধা কন্যাকে প্রণয়াস্পদের কাছে পাঠায় নি ইলা—গবেষণা করবার মত মনের অবস্থা এখন নাই উমাশঙ্করের—তিনি ও কথাটা অগ্রাহ্য করেই বললেন,

—অনুভা অবশ্য ওর বাপের মত সুন্দরী হয়েছে—অরু ঠিক তোমার মত!

—তাহলে আমি আর সুন্দর হলাম না মামাবাবু! এই তো কথা?

অরুন্ধতী অনুযোগ জানালো। সৌন্দর্যে সে কিছু কম নয় বরং চুল, চোখ, হাতের আঙুল আরো সুন্দর সুগঠিত তার কিন্তু

অনুভার বর্ণসুষমা অপরূপ। আর কলকাতার মানুষেরা মেম্‌ সাহেব বনে যাবার পর থেকে বর্ণকেই রূপের প্রধানতম প্রকাশ বলে মনে করেন! কিন্তু শঙ্কর কলকাতার মানুষ নন অথচ অনুভাকেও ক্ষুণ্ণ করা চলে না, বললেন—মানুষের দুটো রূপ থাকে, বাহ্যিক আর আভ্যন্তরীন; তোদের দুই বোনের কার কোনটা বেশী, ওজন করে পরে বলা হবে কে বেশী সুন্দর।

খাওয়া শেষ হলে একটা ঘরে শয্যা রচনা করে দিল ইলা নিজের হাতে। উমাশঙ্কর শুলেন; আলোটা নিবিয়ে দেবে ইলা; বললো—তাহলে ঘুমাও শঙ্করদা—আমি যাই!

—হ্যাঁ-যাও, শোও গে—শঙ্কর পাশ ফিরে শুলেন ভালহয়ে। সুইচটা টেনে দিল ইলা। আবার তাকালো শঙ্করের শায়িত দেহটার পানে। দেখা যায় না, কিন্তু শঙ্করদা ইলার কাছে এখনো তেমনি সুন্দর আছে। দেখা না গেলেও যেন দেখা যায়। ইলা আরও কাছে এগিয়ে এল—কপালে হাত রাখলো—শঙ্কর বললেন—ইলা—শোওগে যাও।

—যাই!—ইলার উষ্ণ শ্বাসটা শঙ্করের কপালে লেগেছিল কিনা কে জানে!

* * *

পাঁচটা এখনো বাজে নি; সারারাত আধঘুম জাগরণের মধ্যে কাটিয়ে সম্পূর্ণ জেগে উঠলো ইলা অত ভোরে। ভোরে ওঠা ওর অভ্যাস কিন্তু এত ভোরে নয় কোনদিন। উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে।—না, যেতে হবে।

কে জানে আবার কখন আসবে শঙ্করদা! হয়তো দশ বিশ বছর আর আসবে না। যে সুযোগটা আজ পাওয়া গেছে, শঙ্করদা এসেছে আর তার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য প্রিয়পুরে নিয়ে যাবার কথা বলেছে—সেই সুযোগ গ্রহণ করতেই হবে। ইলা কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

সারা জীবন আপন অন্তরের অন্তঃস্থলে শঙ্করদার কথা গোপন রেখেছে ইলা—কেউ জানে না; কেউ জানবে না এ জীবনে। কিন্তু ইলা তো জানে—একদিন ঐ শঙ্করদার জন্য কি না ত্যাগ সে করতে পারতো! হয়তো আজও পারে। কিন্তু ত্যাগ করবার মত কিছু আজ আর নেই তার; দান করবার মত কিছু যদি থাকে—যদি কিছু সাহায্য করতে পারে শঙ্করদার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত তার বোনের আশ্রমে, তাহলে জীবনে একটা অসীম তৃপ্তি জাগবে ওর। ইলা উঠে পড়লো উত্তেজিত মন নিয়েই।

শঙ্কর তখনো ঘুমোচ্ছেন—ইলা খোলা দরজাটায় দাঁড়িয়ে দেখলো, তারপর ঝি'কে ডেকে ড্রাইভারকে ডাকতে বললো; অরুন্ধতীকে জানালো; অনুভাকেও ডাক দিল এবং নিজে গেল স্নান করে তৈরি হতে। শঙ্কর তখনো ঘুমুচ্ছেন। তিনি জানেনই না যে ইলা এই সকালেই যেতে চাইবে নন্দিতার আশ্রম দেখবার জন্য! কিন্তু তাঁর না-জানায় কিছু আসে যায় না। তিনি তো যাবেনই বাড়ি ফিরে—ইলা নিঃসঙ্কোচে আয়োজন করলো যাবার। অরুন্ধতী সঙ্গে যাবে! অনুভাকে বললো—

—তোর তো বিকালে নিমন্ত্রণ আছে সার রঙ্গনাথের ওখানে; তুই বাড়ি থাক!

—থাকতেই হবে—কাল আমি বাড়ি ছিলাম ; আজ তুমি থাক দিদি !

অরুন্ধতী জানিয়ে দিল দিদিকে ! অনুভা কয়েকবারই গিয়েছে প্রিয়পুরে যদিও আশ্রম সে একবারও দেখে নি ! তবে নন্দিতা দেবীকে তার ভালই দেখা আছে। সুতরাং বললো,—বেশ, তোমরা যাও—আমি বিকালে বুইক্ গাড়িখানা নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে যাব।

—বুইক্‌টা আমাদের নিয়ে যেতে হবে—তুই শেভ্রলে নিবি। ইলা জানালো !

—তার থেকে বলো না, ঐ ভাঙা ফোর্ডখানা আমায় নিতে ! রেগে বললো অনুভা ! নতুন কেনা বুইকখানাই ওর পছন্দ। কিন্তু দূর রাস্তা যেতে হবে—ইলা বললো—ফোর্ডখানাই আমি নিতাম—গাড়ি দেখাতে তো আমি সেখানে যাচ্ছি না; কিন্তু ওটা ঠিক নেই। অতখানা রাস্তা যাব—রাস্তায় যদি খারাপ হয় তো অচল হয়ে পড়বো একবারে !

—শেভ্রলে খুব ভাল গাড়ি। ওটা অচল হবে না—বুইক আমার চাইই চাই !

ইলা চেনে বাপের আদুরে মেয়ে অনুভাকে ; তাই আর কিছু বললো না।

—আচ্ছা দিদি—আমরা ঐ ফুটো গাড়িটাই নেব—বলল অরুন্ধতী। ওর কিশোরী মন বাইরে যেতে পাবার আনন্দে অতিমাত্রায় চঞ্চল, উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে ড্রাইভার এসে সেলাম জানালো। ইলা শুধুলো,

—সেভ্রলেখানা তু'তিনশো মাইল যাতায়াত করতে পারবে কি ?

—জি হ্যাঁ—গাড়ী বিলকুল ঠিক আছে।

—তাহলে তৈরি হও গে—সাড়ে ছটায় বেরুতে হবে।

—জি আচ্ছা !—ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

শঙ্কর উঠে এলেন বারান্দায়—কথাগুলো শুনতে পেয়েছেন।

—সাড়ে ছটায় কোথায় যাবে ইলা ?—শুধুলেন।

—প্রিয়পুর—নন্দিতাদির সঙ্গে দেখা করবো আর আশ্রম দেখবো।

—আজই ? এখনি ?

—হ্যাঁ—এখনি না হলে আর হবে না।

—কেন ?

—ত্রিশবছর পরে যে একরাত্রির জন্য এসেছে সে আবার কত বছর পরে যে আসবে, কে জানে ! তাছাড়া, জীবনের শেষ অধ্যায় এসে পড়েছে শঙ্করদা, ধন-জন-যৌবনের উপাসনা যথেষ্ট হোল, যথেষ্ট করলাম ; এখন আমি যেখানে সত্যিকার আমি, সেইখানে তুমি আমায় হাতধরে পৌঁছে দাও—সেখানে পৌঁছে দেবার লোক আর কেউ তো আমার নেই !

কি করুণ আবেদন ! শঙ্কর সেই মুহূর্তে চেয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে ; অনুভা পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, ইলার খেয়ালই নেই যে সুশিক্ষিতা, যৌবন-প্রাপ্তা কন্যা কাছে রয়েছে, কিন্তু শঙ্করের খেয়াল আছে। বললেন,

—সেখানে যাবার পূর্ণ অধিকার তোমার রয়েছে ইলা !

আমার পৌঁছে দেবার অপেক্ষা কেন? তবে এতো তাড়াতাড়ি না গেলেই হোত।

—তাড়াতাড়ি নয়; আমি অনেকদিন থেকেই তৈরি হয়ে আছি।

—বেশ—চলো—শঙ্কর আর কথা বাড়াতে না দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন গিয়ে। ইলা তাগাদা দিল অরুন্ধতীকে কাপড় পরবার জন্য। অনুভাকে বলল,—তোর মামাকে এককাপ চা খাইয়ে দে অনু—আমাকেও একটু দিস্!

অনুভা নিঃশব্দে চলে গেল; ওর বয়সের মেয়ের মনে প্রেমের চাঞ্চল্য থাকে, গভীরতা থাকে না—সে প্রেম শুধু সৃষ্টিধর্মী। তাকে পালনধর্মী বলে অকারণ বেশি সম্মান দেওয়া হয়—তবু অনুভা ইলারই মেয়ে; তাই মার কথাগুলোর মধ্যে কেমন একটা রক্ষণশীলতার সুর যেন সে লক্ষ্য করছে। কেমন একটা বহুদিন নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির অগ্নি মাতা ধরিত্রী যেন রক্ষা করছেন তাঁর অন্তরতলে। অনুভা ঠিকমত বুঝতে পারলো না—অথচ বুঝবার আগ্রহ জাগিয়ে তুললো অন্তরে। কিন্তু তার সৃষ্টিধর্মী মন বেশিক্ষণ এ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে না। আজ ঘরে সে একলা থাকবে; বিকালে মেঘনাদ আসবে এখানে হয়তো, এবং হয়তো···ইত্যাদি কথাই আজ তার ভাববার প্রধান বিষয়। কে কোথায় কোন্ বৃদ্ধকে কি কথা বললো তা নিয়ে সময় নষ্ট করবার ওর সময়াভাব।

অনুভা চাকর দিয়ে চা খাবার তৈরি করিয়ে আনলো। শঙ্কর তখনো বাথ্রুম থেকে বের হননি; ইলাও আপন ঘরে। শুধু অরুন্ধতী টেলিফোন করছে ওখানে।

—কার বাড়ি ফোন্ করছিস ?

—ওঁরা এখনো ওঠেন নি—আমি আয়াকে জানতে বলে দিলাম, "তুমি বাড়ি থাকগে ; আমরা যাচ্ছি কলকাতার বাইরে।" ক্যামেরাটা কোথায় দিদি ?—লক্ষ্মী দিদি—দাও আজকের মত আমায় ক্যামেরাটা।

ফিল্ম মোটে পাওয়া যায় না, দেখছিস না ? একখানা মাত্র ফিল্ম আছে, তোকে দিলে আমার কি হবে ! ফোন্ কাকে করলি ?

—তুমি না হয় নাই তুললে আজ ছবি ? আমি বাইরে যাচ্ছি—দেবে না ?

—না ! ফোন্ কাকে করলি ? স্যার রঙ্গনাথের বাড়ি ?

—জানি না—অরুন্ধতী রেগে চলে গেল অন্যদিকে !

ইলা বেরিয়ে এল ! অনুভা চেয়ে দেখলো তার পানে ; লাল্ হয়ে উঠেছিল ইলা, কিন্তু সামলে গেল—বললো,—তোর মামা এখনো বেরুন নি বাথরুম থেকে ?

—না মা—এ শাড়িটা তোমাকে ভাল মানাচ্ছে না কিন্তু ; বড্ড যেন.........

—কেন রে ? ইলা একটু হাসলো—সাজটা অত্যন্ত আধুনিক হয়ে উঠেছে নাকি ! মেয়ের চোখে আজ ধরা পড়ে যাবে নাকি ইলা ! কিন্তু অনুভা আধুনিকা, সেরকম কিছু না বলে বললো—আজকালের চলতি শাড়ি তোমার একখানাও নেই ; সবগুলোরই পাড় চওড়া—আজকাল আর চওড়া পাড় চলতি নেই মা—আমার একখানা শাড়ি পরে যাও !

—আর থাকগে বাছা !

—না—থাকলে চলবে কেন ! বাইরে যাবে, যা-তা বেশে যাবে নাকি ?

ইলা চুপ করে রইল ; উমাশঙ্কর বেরিয়ে এলেন—চা খেতে বসলেন এসে ! স্নান করে বেরিয়েছেন ; চমৎকার দেখাচ্ছে ওঁকে—কাপড় নিয়ে আসেন নি, কিন্তু অরুন্ধতী তার বাবার একখানা ধোয়া ধূতি ওঁকে দিয়েছিল আগেই। সে জেনে নিয়েছিল, সকালে স্নান করা শঙ্কর মামার অভ্যাস ! উমাশঙ্কর চা খেতে খেতে বললেন অন্যমনস্ক ভাবে,

—নন্দিতা তোমাকে হঠাৎ পেয়ে খুবই খুশি হবে ইলা, কিন্তু তোমার যেতে বড় কষ্ট হবে। ট্রেনে বড্ড ভীড়—আর জান তো, আমি থার্ড ক্লাসেই যাই !

—ট্রেনে যাব না—বরাবর মোটরে যাব—ইলা বললে—তুমি তো বললে যে রাস্তা আছে !

—আছে—তবে একটুখানি হেঁটে যেতে হবে—নদীধারের রাস্তাটা মেরামত হয় নি—কিন্তু—

—কিন্তু-টিন্তু থাক সব, আমি যাবই—ইলা আরো দৃঢ় হয়ে উঠলো আগেকার দিনের সেই নবযৌবনা ইলার মত। উমাশঙ্কর হাসলেন ওর মুখপানে চেয়ে। বললেন,

—তোমার স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন তো দেখছি না ইলা, তেমনি একগুঁয়ে আছ !

—স্বভাব কি কারো বদলায় কখনো ! চাপা থাকতে পারে—সুযোগ পেলেই ফুটে বেরয় ! —ইলা হাসলো—মনে আছে শঙ্করদা সেই কোনারক যাবার কাহিনী ?

—আছে—কিন্তু তখনকার তুমি আর এখনকার তুমি'র বয়সে ত্রিশ-বছরের তফাত!

—মানুষের মন দিন-গোনা বয়সের ধার ধারে না শঙ্করদা," মনের কোন বয়স নেই।

শঙ্কর আর কিছু বললেন না; অনুভা উঠে গেল, অরুন্ধতী এসে বসলো তার জায়গায়। সেও কিছু খেয়ে নেবে। ইলা একটু থেমে শঙ্করকে প্রশ্ন করলো,

—একশো মাইলের বেশি হবে রাস্তা?

—ঠিক জানি না—তবে একশো থেকে একশো কুড়ির মধ্যে হবে। ওর বেশি নয়।

—তবে আর কতক্ষণ, তিন ঘণ্টারও কম—অরু বললো মহানন্দে!

—আমি কিন্তু আজই ফিরে আসবো!—ইলা বললো!

—তুমি যখন ইচ্ছে এসো—আমার কি! আমি দিন চার পাঁচ না থেকে আসছি না। বাব্বা, কতকাল কলকাতার বাইরে যাই নি আমি—মনে পড়ে না।

অরু একটা ছোট স্যুটকেসে কাপড়-জামা ভরেছে—সেটা চাকরের হাত দিয়ে নীচে পাঠালো গাড়িতে তুলবার জন্য। শঙ্কর বললেন—আজই হয়তো তোমাকে আসতে দেবে না নন্দিতা—আর অরু দু'চার দিন থাকবে—তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

—কিন্তু অনু বড় মেয়ে, একলা ঘরে রইল—ইলা আস্তে বললো।

কথাটা ভাববার মত, যদিও কলকাতার এই সব সমাজে অতসব কথা ভাববার রেওয়াজ কম। শঙ্কর একটু চুপ করে থেকে বললেন,

—ওকে নিয়ে যেতে বাধা কি ছিল ?

—ওর আজ নিমন্ত্রণ আছে স্যার রঙ্গনাথের বাড়িতে। তাঁর ছেলে মেঘনাদ জেলে গিয়েছিল পিকেটিং না কি করে—ফিরে এসেছে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী অনুভাকে খুব ভালবাসেন। —হাসলো ইলা।

—ছেলেটি কি রাজনীতির চর্চা করে ?—শঙ্কর শুধুলেন।

—ঠিক চর্চা করে, বলা যায় না—কিছুটা নিষ্ঠা, কিছুটা হুজুগ—কিছু বয়সের ধর্ম আর কিঞ্চিৎ......

অনুভা আসছে, কিন্তু ইলা তার কথা শেষ করলো,

—আর কিঞ্চিৎ সুযোগ সন্ধানের আকাঙ্ক্ষাও যে না আছে, তা বলা যায় না।

—কারো বিষয়ে এমন নিষ্ঠুর সমালোচনা করা উচিত নয় মা তোমার !—অনুভা বললো।

—সত্য চিরকালই কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর অনুভা—সূর্যের কিরণ পরম সত্য, পরম মঙ্গলময়। কিন্তু নিষ্ঠুর ভাবে তিনি পৃথিবীকে পীড়ন না করলে মেঘ জন্মাতো না, শস্য জন্মাতো না—জীব বাঁচতো না—অগ্নি নিষ্ঠুর, কিন্তু তার নিষ্ঠুর দাহিকাশক্তি আছে বলেই আমরা অন্ন পাক করে খেতে পারি - আলো জেলে অন্ধকার ঘোচাতে পারি !

—রাখ মা তোমার বেদ-বেদান্তের বাণী ;—অনুভা যেন

কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে বললো—মানুষকে সমালোচনা করবার আগে তাকে জানতে হয়।

ইলা কোনো প্রতিবাদ করলো না আর, কোনো কথাই সে বললো না। শুধুলো,

—তুই তাহলে একা বাড়ি থাক—বিকালে যাবি স্যার রঙ্গনাথের বাড়ি! কেমন?

—হাঁা—যদি ওরা নিতে লোক পাঠান!

—নিতে পাঠাবেন। কিন্তু রাত নয়টার মধ্যে ফিরো। আমি খুব সম্ভব নটা-দশটার মধ্যে ফিরবো।

—তুমি অতখানা গিয়ে আজই ফিরে আসবে?

—হ্যাঁ—বাড়িতে তুই একা থাকবি—ফিরে না এলে চলবে কেন!

—আমি তো আর দোলনায় শোওয়া মেয়ে নয় মা—তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার আজ।

—কিন্তু মায়ের কাছে সন্তান কখনো বড় হয় না।

—আবার 'সারমন' মা!—অরুন্ধতী হেসে উঠলো!

শঙ্করও হেসে উঠলো—হেসেই বললেন—তোমার নিমন্ত্রণটা আজকার মত নাকচ করা যায় না অনুভা? তাহলে তুমিও যেতে আমাদের সঙ্গে।

—না মামাবাবু—আমি কথা দিয়ে ফেলেছি।

—ও থাক বাড়িতে! ও তো অনেকবার গেছে ওখানে! ইলাও বললো!

অতঃপর শঙ্কর আর কিছু বললেন না। একবার বলা তাঁর

উচিত ভেবেই বলেছিলেন—আর প্রয়োজন নেই। চা খাওয়া শেষ হতেই অনুভা মার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিজের একখানা সরু জরীর পাড়ওয়ালা আধুনিক শাড়ি পরিয়ে দিয়ে বললো—হাতীপঞ্জা পাড় শাড়ি আর চলে না মা—!

—আবার কিছুদিন পরে চলবে। আমাদের ছোট বেলায় আর একবার সরু-পাড় শাড়ির চল হয়েছিল—সেইটা এখন ফিরলো। হিস্ট্রি রিপিট্‌স্…

—তা হোক—যখন যেটা চলে!

নারীর সাজগোজ সম্বন্ধে আধুনিক সমাজে বয়সের কোনো গণ্ডী নেই; যদি বা থাকে তো সে এত সূক্ষ্ম যে সন্ধানীরাই খবর রাখে। এ যুগে প্রৌঢ়া যুবতীর বেশভূষা প্রায় একই—মাতা কন্যার তফাত শুধু দৈহিক স্থূলত্বে ধরা পড়ে।

মোটর তৈরি হয়ে আছে—উমাশঙ্কর তরুকে নিয়ে বসলেন [illegible] অনুভাকে আরো [illegible]

—তোমাকেও 'সারমন' শোনাতাম—না শঙ্করদা?—[illegible] বললো।

—বহু—বিচিত্র; এখনো দুচারটা মনে আছে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। তখন সবে সাড়ে ছয়টা মাত্র।

পাঞ্চালী আয়োজন পূর্ণ করে তুলেছে ভোর বেলাতেই। বাগানের ফুল তুলে মালা গেঁথেছে, জাতীয় পতাকাকে সুন্দর

করে সাজিয়েছে—আলপনা এঁকেছে গৃহাঙ্গনে, ধূপ দীপ জ্বেলে *দিয়েছে বেদীমূলে ! সকলকে স্নান করিয়েছে এবং যে-কয়েকজন স্টেশনে যাবে, তাদের কাপড় পরিয়ে তৈরি করে রেখেছে।* সাতটা পতাকা, পাঁচটা শাঁখ আর নয় গাছা মালা নিয়ে ওরা কয়েকজন মেয়ে তৈরি—এখন অচলা দেবী এসে বেরুবার আদেশ দিলেই হয়।

ট্রেন বেলা দশটার সময়, কাজেই অচলা দেবী তাড়া করছেন না। এখন মাত্র সাতটা পঞ্চাশ। এদিকের ট্রেনগুলো আবার যথাসময়ে কোনদিন আসে না। অচলা দেবী তাই ধীরে সুস্থে স্নানাদি করে তৈরি হচ্ছেন—বেশ একটু বিশেষ ভাবেই তৈরি হচ্ছেন।

এত বড় আশ্রমের তিনি সাধারণ সম্পাদিকা—'জেনারেল সেক্রেটারী'—তাঁর পদ-মর্যাদার উপযুক্ত বেশ-বাস তাঁকে করতেই হবে। বয়সও খুব বেশি হয় নি এবং রূপের জ্যোতিও কিঞ্চিৎ আছে তাঁর ! সুযোগ সুবিধা কমই পাওয়া যায় আশ্রমে [illegible]। আজকার সুযোগটা [illegible] ব্যর্থ হতে দেবেন না। গরদের শাড়ি বের করলেন, গরদের জ্যাকেট; পায়ের জুতোটাও ঝেড়ে মুছে নিয়েছেন—যখন বেরুলেন তখন বেশ জ্যোতির্ময়ীই মনে হতে লাগলো তাঁকে ! আটটা দশ মিনিটে বেরুলেন তিনি। পাঞ্চালীরা দল সকাল থেকে সেজেগুজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ততক্ষণ। ওঁদের সকলের শাড়িই সাদা খদ্দরের শুধু পাঞ্চালীর শাড়িটার পাড় কালো; অন্য সকলের লাল। সকলেরই চুল খোলা, শুধু পাঞ্চালী এলো

খোঁপা ; সবারই পায়ে জুতো, পাঞ্চালির পা খালি ; অচলা দেবী বেরিয়েই প্রশ্ন করলেন—তোমার পা খালি কেন পাঞ্চালী ? জুতো পায়ে দাও !

—অতখানা পথ জুতো পায়ে আমি যেতে পারবো না মাসিমা—অভ্যাস নেই !

হাসির কথা এমনকি, অমর্যাদার কথাও, কিন্তু অচলা দেবী হাসলেন না ; বললেন,

—রাস্তা খুব খারাপ ; জুতো না পরলে পা ছড়ে যাবে !

—জুতো পরলে ফেরার পথে সেটা আমায় কাঁধে করতে হবে মাসিমা ! জুতো পায়ে আমি আধকোশও চলতে পারি না ; মাপ করুন !

অচলা দেবী আর কিছু বললেন না—সকলের আগে আগে চলতে লাগলেন। ওঁর সঙ্গে আরো দুজন শিক্ষয়িত্রী। মোট ওঁরা চব্বিশ জন ; নন্দিতা স্টেশনে যাবে অন্য পথে—একা ; কিংবা হয়তো যাবেই না—কে জানে কি করবে !

কতকটা পথ নিতান্তই খারাপ। নদীর কিনারা ধরে আঁকাবাঁকা রাস্তা ; শুধু মানুষ চলে—আর চলে গরুর গাড়ি ! অবশ্য মোটর যে চালানো যায় না, তা নয়, তবে গাড়ি খারাপ হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এর পর থেকে রাস্তা অনেকটা ভাল ; দুপাশে শরবন—শ্যাওড়া গাছ—আকন্দফুলের জঙ্গল আর মাঝে মাঝে বিরাট বট বা অশথের মহাদ্রুম। মাঝামাঝি রাস্তায় একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে, তার নাম অনাদিনাথের বটতলা।

এখানে শিবের অনাদি লিঙ্গ অবস্থিত—নিত্য পূজা হয়। বিশাল এই বটতরু বহু ঝুরি ঝুলিয়ে দীর্ঘকাল ধরে একটি সুবিশাল ছায়ামণ্ডপ সৃষ্টি করে রেখেছে—এখানে ইন্দারাও আছে। জল খুব মিষ্টি। বহু লোক জল পান করে তৃপ্ত হয়। পাকা রাস্তা এইখান থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং স্টেশনের পাশ দিয়ে গ্রাণ্ট ট্রাঙ্ক রোডে পড়েছে। অর্থাৎ এই অনাদিনাথ থেকে আপনি ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ভাল রাস্তা পাবেন—অচলাদের দলটি এখানে এল।

দশটা বাজতে খুব বেশি দেরী নেই—কিন্তু ডিস্‌ট্যাণ্ট্ সিগন্যাল দেখে বুঝা গেল—ট্রেনের এখনো কোনো খবর নেই। অবশ্য আরো মাইল খানেক পথ যেতে হবে—তাই এখানে ইচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্রাম করতে পারলো না ওরা। পাঞ্চালীর ভারী ইচ্ছা ছিল—যায়গাটি ভালোকরে দেখে—কিন্তু সময় কৈ!

সুউচ্চ বটবৃক্ষ বহুদূর থেকে দেখা যায়; এমনকি আশ্রম থেকেও দেখতে পাওয়া যায় ওর উঁচু মাথাটা। ওর সম্বন্ধে পাঞ্চালীর মনে বিশেষ একটা স্বপ্ন ছিল—আজ ঐ জায়গাটি ভাল করে দেখবার আশাও সে পোষণ করছিল মনে মনে। কিন্তু অচলা দেবী তাড়া দিলেন—চলো চলো!

পাঞ্চালী মাথা নত করে প্রণাম করল অনাদিনাথকে! মুখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল নন্দিতা দেবীর সঙ্গে।

নন্দিতা অনেক আগে থেকে এসেই ওখানে অপেক্ষা করছিল। এদিকে অচলাও তাকে দেখতে পেয়ে বল্লেন—দিদি—কতক্ষণ এসেছেন? আসুন! সময় হোল!

—আমি আর যাবো না ভাই, আমি এখানেই পূজা করবো ; তোমরা যাও, তাকে নিয়ে এসো ; আমি ততক্ষণ বাবার পূজা দিই !—হাসলো একটু নন্দিতা।

তা বেশ কথা ! নন্দিতা না থাকলেই অচলা তার আধিপত্যটা আরো বেশি করে দেখাতে পারবেন মেয়েদেরকে, এবং যে নতুন লোকটি আসছে তাকেও জানাতে পারবেন তার প্রয়োজনীয়তা ! তবু মনরাখার মত করে বললেন—

—এতটা এসে স্টেশনে যাবেন না ?

—না ! স্টেশনে যাবার জন্যে তো আসিনি আমি। এখানে ওকে নিয়ে এসো তোমরা, এই অনাদিনাথের পাদমূলে ওকে ফিরে পাব—যাও, আর বেশি দেরি নেই !

দলটি চলতে লাগলো ; পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছালো ওরা ; ট্রেনও আসছে—কিন্তু অচলা দেবী কখনো উদয়নকে দেখেন নি ; তাঁর মাতব্বরিকরা মুখ শুকিয়ে উঠলো। চিনবেন কি করে তাকে ! কার গলায় মালা দিতে কার গলায় দিয়ে ফেলবেন, শেষে একটা কেলেঙ্কারী হবে। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে অচলা বললেন সকলকে,

—উদয়নকে কেউ কি চেন আমাদের মধ্যে ?

—না—সবাই সবিনয়ে জানালো।

—তাহলে ! শেষে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়ে বিভ্রাট না হয় !

আমি ঠিক চিনে ফেলবো—পাঞ্চালী বললো।

—তুমি কি চেন তাকে ?

—না—তবে জেল ফেরত বিপ্লবীকে চেনা সহজ! তা-ছাড়া ওঁর নিশ্চয় চেহারায় কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে।

—যদি ভুল হয়? অচলা সন্দেহকুল প্রশ্ন করলেন।

—ভুল হবে না, যদি তিনি অবশ্য এই গাড়িতে নামেন।

পাঞ্চালীর এতখানি দৃঢ়তার কারণ ঠিকমত বুঝতে পারলো না অচলা কিন্তু গাড়ি এর মধ্যে এসে পড়লো; ছোট স্টেশনে কুড়ি-পঁচিশটি যাত্রী উঠানামা করবে—ভীড় খুবই কম। পাঞ্চালী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে শ্লথগতি ট্রেনটার দিকে—ইঞ্জিন, তারপর বগিগুলো ধীরে ধীরে চলতে লাগলো, তারপর থামলো গাড়িখানা! স্টপেজ মাত্র দুমিনিট—পাঞ্চালীর নির্ভুল দৃষ্টি দেখে নিয়েছে উদয়নকে! গাড়ির শেষের দিকে থার্ড ক্লাশের একটা কামরায় একখানা চম্পকগৌর হাত—ডান হাত, দরজার হ্যাণ্ডেলটা ধরে রয়েছে; গাড়ি থামতেই দরজাটা খুলে ফেললো। ঐ হাতের অধিকারী নিশ্চয় উদয়ন—কারণ—ট্রেনের বাগিটা থেকে উঠানামাও একবার নিমিষের জন্য দেখে নিল পাঞ্চালী—না; ওরকম হাত আর একটাও নেই এ গাড়িতে; অমন সুন্দর গঠনের হাত। ইতোমধ্যে সেই থার্ডক্লাসের যাত্রীটি পা-দানিতে নেমেছে। ওর মাথায় সাদা খদ্দরের টুপী, গায়েও খদ্দরের জামা কাপড়। পাঞ্চালি ধ্বনি করে উঠল অকস্মাৎ—বন্দে মাতরম্।

—বন্দে মাতরম্! অন্য মেয়েরাও ধ্বনি করে উঠল।

থার্ডক্লাসের লোকটি হাত তুলে বললো—বন্দে—মাতরম্! ব্যস—আর চেনবার অপেক্ষা কি! তবু অচলা দেবী ত্বরিতপদে এগিয়ে এসে বললেন,

—উদয়ন !

—আজ্ঞে হ্যাঁ—ঝুপ করে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো ছেলেটি প্লাটফর্ম-না-থাকা কাঁকুরে জমিতে, তারপর ডানহাত উর্ধ্বে তুলে ধ্বনি করলো—বন্দে—মাতরম্ !

শাঁখ বেজে উঠলো পাঁচটা—সাতটা পতাকা ওকে ঘিরে দাঁড়ালো গোল হয়ে ; ওর কিন্তু কিছু জিনিস আছে গাড়ির মধ্যে। গাড়িরই একজন ভদ্রলোক একটি চটের থলে জানালা গলিয়ে নামিয়ে দিচ্ছেন ; পাঞ্চালী গিয়ে ধরে নিল—উদয়নকে শুধুলো আর কিছু আছে আপনার গাড়িতে ?

—আর একখানা বই আছে—মহাভারত !

ইতোমধ্যে সেই ভদ্রলোকটি মহাভারতখানিও নামিয়ে দিলেন ; পাঞ্চালী নিল।

উদয়ন নেমেই বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো জন্মভূমির মৃত্তিকাকে ; তারপর উঠে সকলকে নমস্কার করে শুধুলো—মা, মামাবাবু কোথায় ?

—তাঁরা ভাল আছেন—তোমার মা ঐ অনাদিনাথের ওখানে পূজা দিচ্ছেন।

—চলুন তাহলে—উদয়ন পাঞ্চালীর হাত থেকে চটের থলেটা নিতে যাচ্ছে !

—ওটা থাক আমার কাছে ; আপনি এই পতাকাটি হাতে নিন !

—ওতে কিন্তু আমার যথা-সর্বস্ব আছে—হাসলো একটু উদয়ন।

—ওর বিনিময়ে ভারতের যথা-সর্বস্ব জাতীয় পতাকা আপনার হাতে দিলাম।

পাঞ্চালী জবাব দিয়েই চটের থলে আর মহাভারতখানা নিয়ে সরে গেল—উদয়ন তখনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর পানে। কিন্তু অচলা দেবী আদেশ দিলেন,

—সকলে উদয়নকে চক্রাকারে ঘিরে শাঁখ বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হও—যেমন ভাবে ঠিক করা আছে!

দুটি মেয়ে আগে আগে যাচ্ছে; আঁচলে আছে কুচি ফুল। তাই ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে তারা; পিছনে দুজন, দুপাশে দুজন আর মাঝে একজন শাঁক বাজিয়ে চলেছে—তার মাঝে উদয়ন জাতীয় পতাকা হাতে। কিন্তু পাঞ্চালী বহু পিছনে পড়ে গেছে—প্রায় শ' খানেক হাত পিছনে।

স্টেশনের বাইরেই কয়েকঘর বসতি নিয়ে ছোট একটি গ্রাম। নাম লোচনপুর—গ্রামের ছেলেমেয়েরা সব দাঁড়িয়ে গেল দেখবার জন্য উদয়নকে। বউ-ঝিরাও উঁকি দিতে লাগলো দেওয়ালের আড়ালে—পুরুষরা কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে লাগলো। এদের অনেকেই উদয়নকে চেনে। প্রৌঢ় একজন লোক হুঁকো হাতে, উদয়নের সমুখে এসে বললো,—খালাস পেলে উদুভায়া? কবে খালাস হলে?

—চার পাঁচদিন হোলো খালাস পেয়েছি দাদু! তোমরা সব আছ কেমন?

—আর আছি! বেঁচে আছি কোনো রকমে। চাল নেই, কাপড় নেই, রুগীর ওষুধ নেই—আমাদের আবার বেঁচে থাকা!

তোমরা তো অনেকবার জেল খাটলে উদুভাই, স্বরাজ কৈ হোল?

—হবে—উদয়ন সস্মিত মুখে বললো—হবে স্বরাজ, মদন-দাদু, নিশ্চয় স্বরাজ আসবে। তবে তোমাদের আরো কিছু দুঃখ সইবার জন্যে তৈরি হতে হবে।

—আরো দুঃখু! দুঃখুর বাকী কি আছে ভাই! গরু-শুয়োরও যে আমাদের থেকে ভালো থাকে।—প্রৌঢ় মদন তার শতছিন্ন কাপড়খানার একটা খুঁট্ টেনে মেলে দেখাল; বলল—আমার তো ভাল—সোমত্ত নাত্‌বৌটা বেরুতেই পারছে না; মেয়েটার অবস্থাও ঠিক তেমনি। তেলের অভাবে ঘরে সন্ধ্যার পিদিম জ্বলে না—চালের অভাবে একবেলা ভাত।

—তা জানি, সব খবর পাচ্ছি—বহুদিন সয়েছ, আরো কিছুদিন সহ্য কর—স্বাধীনতার তপস্যা বড় কঠিন মদনদাদু, আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও দুঃখু সইতে হচ্ছে!

—তা হোক; দুঃখু সয়ে শেষ পর্যন্ত যদি স্বরাজ পাই, তাও তো বাঁচি।

—স্বরাজ আমরা আনবোই—'আমরা ঘুচাবো, মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহি তো মেষ।'

উদয়ন গানের কলিটা আস্তে গেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পাঞ্চালী ইতোমধ্যে কাছে এসে পড়লো। উদয়ন একমুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখলো ওকে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গেছে, পিঠের ঘামে ওর জামাটা স্নানসিক্তার মত নেপ্টে গেছে গায়ে, কিন্তু মুখের হাসি তেমনি অম্লান। উদয়ন বললো,

—ঝোলাটা আপনি একাই বইবেন ?

—হ্যাঁ—আপনি ঐ পতাকাটা একাই বয়ে চলুন !

—কিন্তু এ পতাকা সকল ভারতবাসীকেই বইতে হবে। হাসলো উদয়ন কথাটা বলে।

—আমরা সাধারণ সৈনিক—যাঁরা সেনাধ্যক্ষ, তাঁদের হাতেই ওটি শোভা পায় বেশি। আর, ও পতাকা বইবার শক্তি সকলের সমান নয়।

উদয়নকে ছাড়িয়ে এগিয়ে পড়লো পাঞ্চালী। অন্য মেয়েরা শুনলো কথাগুলো ; ওরা জানে পাঞ্চালীর কথা কইবার ধরন। সবাই হাসলো।

—শুনুন। উদয়ন ডাক দিয়ে বললো পাঞ্চালীকে—জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই পতাকা হয় তো আপনার হাতেই বেশি শোভা পাবে—আপনার শক্তি কিছু কম নয় !

—আমি একবারও জেলে যাইনি—পাঞ্চালী কথাটা বলেই হেসে ফেললো—আমি সাধারণ সৈনিক।

—জেলে গেলেই কি সেনাপতি হওয়া যায় ?

—অন্ততঃ এটা সত্যি যে না গেলে হওয়া যায় না এদেশে। পাঞ্চালী যেন অকস্মাৎ একটু কঠোর হয়ে উঠলো—এ প্রমাণ বারংবার দেশকর্মীগণ দিচ্ছেন যে তাঁরা জেলে গেছেন ; প্রথম শ্রেণীর বন্দী হয়ে বিস্তর ধনীর দুলাল ইংরাজের আইনানুগ কারাগারে জেলভোগের বিলাসিতা করে এসেছেন। তাঁরা ভাবেন যে তাঁরাই ত্যাগবরণ করেছেন, দুঃখবরণ করেছেন দেশের জন্য—অতএব দেশের আর কেউ কেউ-নয় ; তাঁরাই সব

এবং তাঁরা যা কিছু করবেন, দেশবাসী তার ভালমন্দ না দেখেই সমর্থন করতে বাধ্য! সমর্থন না করলে দেশের লোকের ঘোরতর অন্যায় এবং অকর্তব্য হবে। তাঁরা দেশবাসীর সমর্থন নিয়ে পদাধিকার লাভ করবেন, সেনাপতি হবেন, এবং······ পাঞ্চালী অকস্মাৎ থেমে গেল।

ওদের নেত্রী অচলা দেবী ওর বক্তৃতার মত কথাগুলো শুনছেন; আর আর মেয়েরাও শুনছে। পাঞ্চালী যেন লজ্জিত হয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে মাথা নামিয়ে বললো,—সকলের কথা আমি বলছি না—অধিকাংশের কথাই এই। কিন্তু থাক এ আলোচনা······।

ও এগিয়ে চলে গেল। ছোট গ্রামটুকু পার হয়ে এসেছে ওরা কথা বলতে বলতে। পাঞ্চালী দ্রুত চলতে চলতে সকলের আগে, সকলকে ছাড়িয়ে মাঠের পথে হাঁটতে লাগলো। এই দিকে একটি সরু মানুষ-চলা পথ সোজা চলে গেছে অনাদি-নাথের বটতলায়। বহুলোক এই সর্টকাট পথ ব্যবহার করে। পাকারাস্তায় ঘুরে যেতে হয় কিছুটা। পাঞ্চালী চটের ঝোল টা ঝুলিয়ে নিয়ে একা চলে গেল সেই পথে।

উদয়নের মনে ইচ্ছা জাগতে লাগলো অচলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করে জানে, কে ঐ মেয়েটি; কি ওর নাম; কোথায় ওর নিবাস,—কিন্তু এতো মেয়ে থাকতে ঐ মেয়েটির সম্বন্ধেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ সে করবে কি করে! সুবুদ্ধি উদয়ন সামলে গেল। তাদের পাকা রাস্তা ধরে ঘুর পথেই যেতে হবে, কারণ সরু মেঠোপথে প্রসেশন চলে না—এবং প্রসেশন সরু-পথে

নিয়ে যাবার জন্য করাও হয় না। প্রসেশন মানেই লোককে দেখাবার জন্য রচিত একটা অনুষ্ঠান। অচলা দেবী আদেশ করলেন,

—*রাস্তার একপাশ ঘেঁসে চলো সব—পিছনে মোটর আসছে। সকলে চেয়ে দেখলো, একখানা মোটরগাড়ি গ্রাণ্টট্রাঙ্ক* রোড হয়ে এই রাস্তায় এসে পড়েছে। মস্ত কালো রংএর গাড়ি, ঝক্‌ঝক্ করছে সকালের রোদ লেগে। বিস্তর ধূলা উড়ছে তার পিছনে—যেন একখানা ধূলার মেঘ তৈরি হয়ে যাচ্ছে! ধূলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ওরা সকলে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো পশ্চিম দিকে। যে যতখানা পারলো কাপড় ঢেকে দিল গায়ে; সবথেকে বেশি ঢাকলেন অচলা দেবী তাঁর গরদের শাড়ি দিয়ে মুখপদ্ম। সবেগে চলে গেল মোটরখানা ওদের পাশ দিয়ে; অচলা দেবী তারপরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ ফিরিয়ে, ধূলোটা উড়ে যাবার জন্য! তারপর আদেশ দিলেন সকলকে,

—এবার চলো সব—বন্দে-মাতরম্!

—বন্দে-মাতরম্! চলতে লাগলো ওরা!

মোটরগাড়িখানা সটান চলে গেল অনাদিনাথের কাছে; দেখা যাচ্ছে এখান থেকে অস্পষ্ট! কেউ নিশ্চয় অনাদিনাথের পূজা দিতে যাচ্ছেন—কোন বড়লোক! অচলা দেবী নিজের বিব্রত অবস্থাটা সামলে বেশ গুজিয়ে নিলেন নিজেকে; তারপর মেয়েদের আদেশ করলেন,

—জয়হিন্দ্—চলো—!

'জয়হিন্দ্' ধ্বনিটা হালে আমদানী। এতদিন 'বন্দে-

মাতরম্' ধ্বনিটাই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, 'জয়হিন্দ্' শব্দটা ওর থেকে সহজ-উচ্চারণ বলেই হোক বা নতুন বলেই হোক, খুব সাড়া তুলেছে দেশের মধ্যে ; সব ছেলেমেয়ে এখন পরস্পর দেখা *হলেই 'জয়হিন্দ্' বলে অভিবাদন জানায়—অচলার সে-কথাটা এতক্ষণ মনে ছিল না—খুবই মারাত্মক ভুল!* অকস্মাৎ ঐ সূত্র ধরেই মনে পড়ে গেল, একটা গান গাইতে গাইতে তাদের অনাদিনাথের ওখানে প্রবেশ করা উচিত। পাঞ্চালী ভাল গাইতে পারে, কিন্তু সে অনুমতি না নিয়েই ভিন্ন পথে চলে গেল ; রাগ হচ্ছে অচলা দেবীর, কিন্তু রাগ করার সময় এটা নয়, তিনি অন্য একটি মেয়েকে আদেশ দিলেন—গান ধর,—'জন-গণ-মন'

মেয়েটির নাম লাবণ্য; তার গলাটা মাঝারি রকম ; গান ধরলো,

জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা—জয় হে—

উদয়ন সোৎসাহে যোগ দিল গানে। অতঃপর ওরা গান গাইতে গাইতে চলতে লাগলো। অনাদিনাথ আর বেশি দূরে নয়—মোটরের লোকগুলি নেমেছে, দেখা যাচ্ছে। কয়েকজনই ওরা—শাড়িপরা মেয়ে—প্যান্টপরা একজন, আর একজন—ঠিক চেনা যাচ্ছে না—। কে সব ?

পাঞ্চালী সরু পথে খুব তাড়াতাড়ি এসে গেল অনাদিনাথের কাছাকাছি। বিরাট মোটরটা ওখানে থামার পরই কারা যেন নামলো, ঢুকলো বটতলার ছায়াকুঞ্জে। পাঞ্চালী দেখতে পেল, ঢুকেই কথা বলতে লাগলো নন্দিতা দেবীর সঙ্গে। বেশ ভদ্র মেয়ে দুজন। নিজের পানে তাকালো পাঞ্চালী, কী বিশ্রী দেখতে লাগছে ওকে! না, এ বেশে যাবে না সে ওখানে।

পাঞ্চালী একটা তেকাঁটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ভারী বোঝাটা নামালো ওখানে। সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে। তুরশি দূরে রয়েছে পাঞ্চালী; ওদের কথা শোনা যাচ্ছে না; দেখতে পেল—নন্দিতা একটি মেয়েকে খুবই আদর করছে;—কে ঐ মেয়েটি?

বহু প্রাচীন মন্দির, পাথরের; বটের ঝুরি নেমে সারা মন্দির ঢেকে ফেলেছে; শুধু দরজাটুকু বাকি আছে,—তার কারণ, নিত্য পুরোহিত ঠাকুর ঝুরি সরিয়ে সকাল সন্ধ্যা মন্দিরে ঢোকেন, তাই দরজাটা বন্ধ হতে পারে নি; কিন্তু এখানকার লোকেরা বলে থাকে 'বাবার মাহাত্ম্য'। বাবা অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর মহাকাল—বিরাট শিবলিঙ্গ—কালো কষ্টি-পাথরের; দীর্ঘ দিনের ঘৃত-দুগ্ধ-দধি-মসৃণ তাঁর সুচিক্কন অঙ্গ সত্যই সুন্দর! মন্দিরের অন্ধকার গর্ভগৃহে স্তিমিত মৃৎপ্রদীপের শিখায় সে লিঙ্গ অত্যন্ত রহস্যময় মনে হয়। 'বাবার অশেষ মাহাত্ম্য, রোগ সারা, ছেলে হওয়া থেকে অন্তিমের অক্ষয় পুণ্য পর্যন্ত তিনি দান করতে পারেন বলে খ্যাতি তাঁর—তাই প্রায় প্রত্যহ পূজার্থিনীর ভিড় জমে—বিশেষ দিনে বিশেষ ভিড় হয়; সেদিন ঐ বিশাল বটবৃক্ষের ধারে পাশে পান-বিড়ি আর মুড়ি-মুড়কী চিঁড়ে-কলা ইত্যাদির দোকান বসে।

ঘনচ্ছায়া-স্নিগ্ধ এই বৃক্ষতলটি সত্যই মনোরম; এক ভীষণতার সঙ্গে রহস্য-মাধুর্য জড়িয়ে একে আরো সুন্দর করেছে। এই মহাকাল নাকি পৃথিবীর প্রলয়ের কর্তা—আবার ইনিই নাকি সৃষ্টির ধারক—ইত্যাদি মতবাদ প্রচলিত।

নন্দিতা পূজা দিয়ে মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করছিল বটগাছের ছায়ায়। মন্দিরের মধ্যে পুরোহিত ছাড়া আর কারও ঢুকবার উপায় নেই; উপায় থাকলেও ঐ ভীষণ স্থানে অন্য কেউ ঢুকতে যেত না। কারণ বটের ঝুরিতে আচ্ছন্ন মন্দিরের অভ্যন্তর বাইরে থেকে অতিশয় ভয়াল মনে হয়। সাপ তো থাকতেই পারে, বাঘ থাকাও বিচিত্র নয়। পুরোহিত ঠাকুররা বহু পুরুষ থেকে ঐ কাজ করে আসছেন, তাই নিঃসঙ্কোচে ওখানে যান, এবং মাঝে মাঝে প্রচার করেন যে বিরাট নাগ বাবার মাথায় বসেছিল আজ কিংবা আজ তিনি বাবার তৃতীয় নয়ন থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছেন। এইসব শুনে এদিকের লোকের ভয়-ভক্তি-বিশ্বাস বাড়ে এবং পূজারীর দু'পয়সা বেশি পাওনা হয়।

কিন্তু যাক বাবা অনাদিনাথের কথা—এরকম প্রায় সব দেশেই আছেন অনাদি বা আদিনাথ—বাংলায় কিছু বেশি হয়ত। নন্দিতা ওসব আজগুবি উপকথায় ঠিক বিশ্বাস না করলেও বাবা অনাদিনাথের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং নিষ্ঠাভরে পূজা দেয় মাঝে মাঝে। এখানে পূজা দিয়েই সে উদয়নকে পেয়েছিল, আর গতবার যখন উদয়নকে জেলে নিয়ে যায় তখন নন্দিতা এখানেই মানত করেছিল, উদয়ন ফিরে এলে পূজা দেবে। আজ তারই দিন।

বাইরে দাঁড়িয়েছিল নন্দিতা; অকস্মাৎ মোটরের শব্দ শুনলো! চেয়ে দেখলো বিস্তর ধূলো উড়িয়ে একখানা মোটর আসছে। মোটর এখানে কমই আসে, বেশি আসে গরুর গাড়ি। কে আসছে, জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে উঠলো বটগাছের তলায়

সকলেই। আরো যারা পূজা দিতে গিয়েছিল তারাও তাকালো। গাড়িতে আসছেন উমাশঙ্কর, ইলা, অরু।

—এখানে কি হচ্ছে মামাবাবু? অরু জিজ্ঞাসা করলো।

—*ইনি অনাদিনাথ মহাকাল। দেখবে নাকি?*

—*চলুন না, নামা যাক্। এই রোখো!*

গাড়ি থেমে গেল। নন্দিতা দেখলো উমাশঙ্করকে,

—দাদা! মহানন্দে এগিয়ে এলো নন্দিতা।

—হ্যাঁরে! কী ব্যাপার! তোর আজ কিসের পূজা?

শঙ্কর আস্তে নামলেন গাড়ি থেকে—অরু আগেই নেমে পড়েছে। ইলার হাত ধরে নামিয়ে শঙ্কর বললেন,

—এইটি আমার বোন ইলা—এসো।

নন্দিতা ইলার নাম ভাল করেই জানে কিন্তু সে কিছু করবার পূর্বেই অরু একেবারে নন্দিতার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করলো। নন্দিতা বুকে টেনে নিল ওকে!

—ওর ছোট মেয়ে, নাম অরুন্ধতী—শঙ্কর বললেন।

নন্দিতা ওর মুখ চুম্বন করে আদর করলো, তারপর ইলাকে ধরলো। বললো,

—বহু বহু কাল থেকে শোনা তোমার নাম; আজ দেখলাম। আজ আমার পরম দিন!

—একেবারে পরম দিন? ইলা হাসলো—আমি এমন কি একটা!

—তুমি বড় ভালো দিনে এলে ভাই। আজ আমার উদয়ন আসছে। ঐযে দেখা যাচ্ছে!

নন্দিতা দূর পানে আঙুল তুললো। সকলেই দেখতে পেল, একটি ছোট প্রসেশন আসছে; মাঝে একটি যুবক, তার হাতে খুব উঁচু করে ধরা পতাকা।

—ঐ উদয়ন? ঐযে পতাকা ধরে?—ইলা শুধুলো।

—হ্যাঁ; কাল চিঠি পেয়েছি দাদা, কলকাতা থেকেই আসছে ও।

—কিন্তু ওঁরা কে? আশ্রমের মেয়েরা নাকি?—শঙ্কর শুধুলেন!

—হ্যাঁ—নন্দিতা জবাব দিল।

প্রসেশনটির আসতে কিছু সময় লাগবে; খানিকটা পথ এগিয়ে ওদের আনবার প্রস্তাব করলো ইলা, কিন্তু নন্দিতা বললো—না, এই অনাদিনাথের তলাতেই ওকে আমি কোলে নেব; আসুক। এখুনি এসে পড়বে।

ওর চোখের মধ্যে কি যেন একটা আশ্চর্য জ্যোতি লক্ষ্য করলো ইলা। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস, অথবা সন্তানস্নেহে অভিষিক্ত মাতৃমনের অভিব্যক্তি? কি ও?

অরুন্ধতীর বয়সের ধর্ম, সে ইতোমধ্যে ছুটে বটগাছটা একবার প্রদক্ষিণ করে এলো। পশ্চিমদিকে ছোট একটা ঘর—ভোগমন্দির, তার কাছে সুগভীর ইন্দারা—সব দেখে এলো সে; একটা প্রকাণ্ড পাথরের ষাঁড় রয়েছে, অনাদি মহাকালের বিরাট বৃষরাজ! কত তেল সিন্দুর যে তার কপালে লেপ্টে রয়েছে তার হিসাব হয় না। মন্দিরে ঢুকতে না পেরে পূজারিণীরা এই ষাঁড়টিকে সিন্দুর লেপনে অভিসিঞ্চিত করে যায়। অরুন্ধতী জীবনে এসব

দেখে নি ; তার যাতায়াত কলকাতা, দার্জিলিং, শিমলা ইত্যাদি কয়েকটা নামকরা যায়গাতেই সীমাবদ্ধ। ভারী ভালো লাগছে ওর। ষোল বছরের মেয়ে দশ বছরের হয়ে উঠেছে যেন।

পাঞ্চালী ওখান থেকে দেখে নিল মোটর-ওয়ালাদের। প্যান্টপরা ড্রাইভারটা গাড়িখানাকে ছায়ায় রাখবার জন্য এই তেকাঁটার ঝোপটার দিকেই আনছে। মহামুস্কিল তো! পাঞ্চালী কি করবে ভাবছে—প্রসেশনটা এসে পড়লো বটতলায়। সকলে ধ্বনি করে উঠলো—বন্দে-মাতরম্!

শুধু অরুন্ধতী বললো 'জয়হিন্দ'

উদয়নকে দেখছিল ইলা চেয়ে চেয়ে ; ইলার নাম উদয়ন জানে কি না, ইলার জানা নেই। হয় তো জানে না। কিন্তু উদয়ন ওর অনুমান ব্যর্থ করে দিল,

—মাসিমার চরন দর্শন হবে, এ আশা করিনি। আজ সত্যি ভালো দিন মা!

—আমিও তাই বলছিলাম তোমার মাসিমাকে—নন্দিতা বললো।

—সত্যি ভালো দিন উদয়দা, আমি এতো ভালো দিন আর কখনো পাইনি।—অরু বললো।

— কাল আমাকে পেয়েও তুই ঐ কথাটাই বলেছিলি অরু —শঙ্কর হেসে বললেন।

—ভদ্রলোকের এক কথা, মামাবাবু—অরু হেসে উঠলো!

অন্য সকলেও হাসতে লাগলো। অতঃপর মন্দিরের দিকে এগুচ্ছে ওরা।

পাঞ্চালী ঝোলাটার উপর বসে তেকাঁটার ঝোপের ফাঁকে দেখতে লাগলো; পূজা শেষ করে বেরিয়ে এলেন পুরোহিত ঠাকুর—উদয়নের ললাটে লম্বা যজ্ঞ-তিলক টেনে দিলেন—ফুল, বিল্বপত্র ঠেকিয়ে দিলেন মাথায়; অন্য সকলকেও দিলেন আশীর্বাদ—শুধু পাঞ্চালী পেল না। নিজকে ওর নিতান্ত ছোট মনে হচ্ছে কেন? কেন ও গেল না ওখানে? না-যাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তো নেই—সে কি এই ঝোলাটা বয়ে ছোটজাত হয়ে গেছে—না, "যা দেবী সর্ব ভূতেষু 'জাতি' রূপেন সংস্থিতা—" আবৃত্তি করলো পাঞ্চালী আপনার মনে। কিন্তু নিজের গাত্রত্বকের ঘর্মসিক্ত দৈন্য দেখলো পাঞ্চালা—দেখলো তার মোটাখদ্দরের শাড়ি ধুলোতে অতি কদর্য হয়ে উঠেছে—অভদ্র করে তুলেছে ওকে! খদ্দর ধনীর পোশাক, সভা-সমিতির পোশাক—ওসব পরে মোটরে চড়ে সভায় যাওয়া যায়, বক্তৃতা সেরে বাড়ি এসে ছেড়ে আবার পাট করে রাখাই ভাল। অত সহজে ময়লা আর কোনো কাপড় হয় না; অবশ্য অত সহজে পরিষ্কারও হয় না আর কোনো কাপড়; তবু খদ্দর গরীবের কাপড় নয়—যা শীঘ্রি ছিঁড়ে যায়—আর যা কাছবার কষ্ট! যা ভারী!

কিন্তু পাঞ্চালী ওসব চিন্তায় নিজেকে বেশিক্ষণ নিবিষ্ট রাখার পূর্বেই দেখতে পেল—ওরা মন্দিরের সামনে পতাকা প্রোথিত করছে। এইবার অর্ধচন্দ্রাকারে সকলে দাঁড়ালো পতাকাটাকে ঘিরে; গান আরম্ভ হোল—উদয়নই আরম্ভ করলো গান প্রথম, "সারে জঁহাসে অচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা" গানটা জানে পাঞ্চালী

কিন্তু ওরা কেউ তো ওকে খুঁজলো না—কেউ ডাকলোও না। ওরা অবশ্য জানে না যে পাঞ্চালী এখানে আছে; কিন্তু ওদের কি স্মরণ আছে পাঞ্চালীর কথা? অন্ততঃ নন্দিতা দেবীর? অচলা দেবীর? উদয়নের? কারো কি মনে নেই তার কথাটা? কে জানে! পাঞ্চালীর অন্তর যেন অভিমানে ক্ষুব্ধ হতে চাইছে—কিন্তু না, পাঞ্চালী অভিমান করতে পারে না! কে সে এমন, যার খোঁজ ওরা করবে! সে ঐ আশ্রমের অতি সাধারণ একটা মেয়ে—বিধবা—বুদ্ধি কিছু আছে, লেখাপড়া কিছু শিখেছে—তাই ওখানে সে আশ্রয় পেয়েছে—তাকে ওরা খুঁজবে. এমন কি গুণ তার আছে? পাঞ্চালী নিজের অন্তরটাকে সংযত করে তাকালো। গান শেষ হোল। সবটা গাওয়া হোল না গানের। তারপর ওরা কি প্রস্তাব করলো, শুনতে পেল না পাঞ্চালী। দেখতে পেল,—ড্রাইভারকে ডেকে ওরা কি বললো—তারপর পায়ে হেঁটেই চলতে লাগলো আশ্রমের দিকে—এবং এইখান থেকেই নন্দিতা দেবীও ঐ প্রসেশনে যোগ দিলেন। ড্রাইভার খালি গাড়িটাই নিয়ে যাবে।

ওরা চলে গেল মাঠের পথে, নদী-কিনারার দিকে। মোটর ওদিকে চলে না। তাকে ঘুর পথে নিয়ে যেতে হবে। ড্রাইভারটা স্টার্ট দিচ্ছে গাড়িতে; পাঞ্চালী অকস্মাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে বললো,

—তুমি কি আশ্রমে যাবে?

—জি হাঁ!

—চলো—আমিও যাব ওখানে—আমি ঐ আশ্রমেই থাকি।

—আপ্ কোন্ হ্যায় ?—ড্রাইভার প্রশ্ন করলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

পাঞ্চালীর অপমান বোধ হচ্ছে, কিন্তু সামলে গেল। বললো,

—আমি ওদেরই দলের;—এই বোঝাটা নিয়ে হাঁটতে পারছি না, তাই এখানে বসে পড়েছি—এটা ঐ উদয়নবাবুর—; চলো—চালাও গাড়ি।

পাঞ্চালী নিজের হাতে দরজা খুলে উঠে বসলো, তারপর আদেশ দিল,

—ঐ ঝোলাটা আর বইখানা তুলে দাও গাড়িতে !

নিরুপায় ড্রাইভার কি আর করে—ঝোলা আর বই তুলে দিল পাঞ্চালীর পার্শ্বে—তারপর শুধুলো—পথ ঠিক পাঞ্চালী চেনে কি না।

—হ্যাঁ—চলো পূবতরফ ! বলে পাঞ্চালী মহাভারতখানা খুলে বসলো।

কাশীদাসী মহাভারত নয়—মূল মহাভারতের শ্লোক উপরে, বাংলা অক্ষরে নীচে ছোট ছোট অনুবাদ—তার নীচে আরও ছোট অক্ষরে টীকা ; প্রকাণ্ড বইখানা, অন্ততঃ তিন হাজার পৃষ্ঠা। পাঞ্চালী শেষ পৃষ্ঠা উল্টে ক্রমিক নম্বর দেখলো চৌত্রিশ শ' পৃষ্ঠা ! ওরে বাপ! এ কি ধরনের মহাভারত ! কিন্তু মূল মহাভারত নাকি আরো বড়—তবে এটা কি ? পাঞ্চালী ওর বাংলায় লেখা ভূমিকাটা পড়তে লাগলো—পঁচিশ পাতা ! ভূমিকা বটে !

মূল মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশগুলি নিয়েই এই মহাভারতখানি সঙ্কলিত হয়েছে—অথচ মূলের প্রত্যেকটি চরিত্র সম্যক্ বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রধান চরিত্রগুলি

যথাসম্ভব ঠিক আছে—নীচের টীকায় আছে মহাভারতের রাজনীতি-সমাজনীতি-ধর্মনীতি এবং মানবনীতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সমালোচনা—ইত্যাদি।

—কিধার যায়েগা?—ড্রাইভার প্রশ্ন করলো একটা তেরাস্তার মোড়ে এসে।

—বাঁয়ে চলো—পাঞ্চালী জবাব দিল।

পাঞ্চালী নিজেই ঠিক মত রাস্তা চেনে না—আন্দাজে আন্দাজে বলে দিল—ভাবলো, চলুক না যেদিকে হোক, খানিকটা মোটরে পাঞ্চালী বেড়িয়ে নেবে আর বইখানাও একটু দেখে নেবে। ড্রাইভার চালালো খানিকটা; আবার কিছু দূরে অন্য একটা পথ—শুধুলো,

—কিধার?

—ডাইনে—বললো পাঞ্চালী পথ না-দেখেই!

সাংঘাতিক দুষ্টামি করছে তো পাঞ্চালী! কেন করছে? কে জানে? জানে ওর অন্তর,—ওর অন্তর্যামী—। ওর ক্ষুব্ধ মন যেন কারো উপর প্রতিশোধ তুলছে মোটরখানাকে অকারণ হয়রান করে। কিন্তু সেটা কার উপর? পাঞ্চালী নিজের চিন্তায় নিজেই বিস্মিত হয়ে উঠলো। আম-কাঁঠালের ঘন বাগানের মধ্যে রাস্তা দিয়ে মোটর চলেছে। ওপাশে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। এ কোথায় এলো পাঞ্চালী? কোন্ গ্রাম এটা? কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেল গ্রামে।

—এটা কোন্ গ্রাম?—পাঞ্চালী প্রশ্ন করলো গ্রামের একজন পথ-চলতি লোককে!

—রসোয়াঁ—লোকটি উত্তর দিয়ে দাঁড়ালো পথের পাশে। পাঞ্চালী আবার বলল,

—ভাটিয়া গ্রাম কোন্ দিকে যাব?

—উল্টো পথে এসেছেন দিদিঠাকুরুন—ভাটিয়া ঐ পশ্চিম দিকে।

সে বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। গ্রামের সরু পথে মোটর ঘোরানো অসুবিধাজনক; কলকাতার চালক বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েছে। বললো,—কিধার ল্যায়া হামকো?

—চুপ করো! অমন ভুল হয়; এদেশে ভুলো-ভূত আছে। গাড়ি ফেরাও।

ড্রাইভার কি-জানি-কেন আর কিছু বললো না। গাড়িখানা ব্যাক করতে লাগলো। পাঞ্চালী চাষাটিকে শুধলো,—কেন্দুবিল্ব কতদূর?

—কেন্দু বিল্লি?—লোকটি অতিবিস্ময়ে তাকালো পাঞ্চালীর পানে—ও নামতো শুনি নাই।

—নামই শোন নি?—পাঞ্চালী হেসে বললো।

এসব গ্রামে মোটরগাড়ি কদাচিৎ আসে; ইদানিং যুদ্ধের কল্যাণে জীপ গাড়ি ওরা দেখেছে; তবুও মোটর দেখবার লোভ ওদের খুবই। গ্রামের চার পাঁচটি লোক এসে দাঁড়ালো।

—কেন্দু বিল্ব যাবেন আপনি? জনৈক ভদ্র যুবক প্রশ্ন করলো।

—যেতে পারি। কতদূর?

—তা দূর আছে, মাইল আট দশ হবে! চলিত কথায় ওকে আমরা 'কেঁতুলি' বলি।

—কেঁতুলি! চাষা লোকটি এতক্ষণে উৎসাহিত হয়ে উঠলো, —তাই বলো দিদি ঠাকুরুন, দূর কি আর! মুটর গাড়িতে আধপঁহর ট্যাক্ লাগবেক্; কুশচার হবেক ঠাকরুন। এই নদীর ধার ধরে ধরে বরাবর রাস্তা—চলে যাও—বিলা বারোটাকে…

কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাচ্ছে, বেচারা চাষার কথা শেষ হবার পূর্বেই ইলেকট্রিক হর্ণ বাজিয়ে দিল। চাষীটি চমকে সরে গেল। যেন গাড়িখানা উড়ে এসে ওর গায়ে পড়বে! সবাই হেসে উঠলো। পাঞ্চালী বললো,

—উপস্থিত 'আনন্দ আশ্রম' যাচ্ছি; কোন দিকে যাব?

—এই যে সোজা আমবাগান পার হয়ে নদীর ধার ধরে মেঠো রাস্তা বাঁদিকে, খুব খারাপ রাস্তা—সাবধানে মে চালাইও ড্রাইভার—ভদ্রলোকটি বললো।

—নান্নুর কোথায়? কতদূর?—পাঞ্চালী আবার প্রশ্ন করলো অকারণ।

—বহুৎ দূর; সে ঐ উত্তর দিকে—বললো লোকটি।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছে। পাঞ্চালীর উপর বেশ রেগেছে সে। কথা কইবার সময় মাত্র আর না নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। সীটে বসে পাঞ্চালী ভাবতে লাগল, একবার কেন্দুবিল্ব যেতে হবে; দেখে আসবো কবি জয়দেবের জন্মভূমি, সাধনক্ষেত্র, গীতগোবিন্দের রচনা-পীঠ। আর নান্নুরও যাবে

একবার চণ্ডীদাসের ভিটা দেখতে। চণ্ডীদাস, যে কবি লিখেছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য"—পাঞ্চালী আবৃত্তি করলো।

গাড়ি চলেছে আম বাগানের ভিতর দিয়ে। অত্যন্ত ঘন গাছ; যেন আঁধার হয়ে রয়েছে দিনের বেলা; কয়েকটা রাখাল বালক পয়সা ছুড়ে খেলা করছিল পথের উপর। গাড়ি দেখে থেমে গেল।

—আনন্দ আশ্‌রম্ কাঁহা হ্যায়!—প্রশ্ন করলো ড্রাইভার ওদের।

কিছুমাত্র বুঝলো না ওরা ওর কথা। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল।

—আনন্দ আশ্রম কোন্ দিকে? পাঞ্চালী শুধুলো!

—আনন্দ-মঠ! হৈ-উধার; হৈ যে,—বলতে বলতে ওরা মহা উৎসাহে এগিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো পথ দেখিয়ে দেখিয়ে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে আনন্দ আশ্রমের অফিস ঘরের উঁচু মাথাটা; তার উপর কয়েকজন লোক পতাকা তুলছে, দেখতে পেল পাঞ্চালী। এই রাখাল বালকরা ওকে 'আনন্দমঠ' বললো। বেশ কথাটা। আনন্দমঠ ঋষি বঙ্কিমের মন্ত্রপূত কথা; ঐখানে আজ জাতীয় পতাকা তোলা হচ্ছে। তুলছেন উদয়ন—একজন একনিষ্ঠ সৈনিক ভারতমাতার মুক্তি-যুদ্ধের। আর ঐ আয়োজনটা করে রেখে এসেছে পাঞ্চালী; কিন্তু ওখানে পাঞ্চালীর কথা নিশ্চয় কেউ ভাবছে না। নবাগতকে নিয়েই ওরা সবাই ব্যস্ত আছে। পাঞ্চালী এতক্ষণ পৌঁছে যেতে পারতো যদি অকারণ এমনি করে না ঘোরাতো গাড়িখানা;

যাবার—তারপর ঝোলাটা নিয়ে সটান এসে ঢুকলো আপনার ছোট ঘরটার মধ্যে।

ওদিককার উৎসব শেষ হলে উদয়ন বাড়ি যাবে ; গাড়িটা এল—অথচ সেই মেয়েটি কৈ, যে ঝোলাটা বয়ে আনছিল? শুধুলো,

—তিনি কোথায়, যিনি আমার ঝোলাটা আনছিলেন !

—পাঞ্চালী? তাইতো! সে এখনো তো এলো না! অচলা দেবী বললেন।

—দেখুন—রাস্তা ভুল করেন নি তো তিনি?

রাস্তা ভুল করতে পারে পাঞ্চালী, এখানে সে নতুন মেয়ে,—অচলা দেবী ব্যস্ত হয়ে তাকে খুঁজবার জন্য লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতে গেলেন। নন্দিতা বললো—সে খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে, ঠিক এসে যাবে। চল, আমরা বাড়ি যাই। এরা সব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

—ওর কাছে আমার ঝোলাটা আছে মা, খুব দরকারী জিনিস আছে তাতে।

—তা থাক না, ও সেগুলো খেয়ে তো ফেলবে না—নন্দিতা দেবী ইলার হাত ধরে এগুলো—সুতরাং উদয়নকেও এগিয়ে আসতে হলো। ইলা-অরুন্ধতী-উদয়নকে নিয়ে নন্দিতা বাড়ি এসে পড়ল—শঙ্কর তার আগেই এসে পৌঁছেছেন। উদয়ন বলল,—ভেবেছিলাম, এখানেই এসেছে ঝোলাটা নিয়ে। তা কৈ?

—তোমার ঝোলাতে এমন কি রত্ন আছে উদয়দা? অরু শুধুলো।

—জ্ঞানরত্ন—ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সাধনালব্ধ রত্ন।

—ওরে বাপ!—অরু সরে গেল।

ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়িতে নিমন্ত্রণ—তাঁর কন্যার জন্মদিন। অনুভা বেলা তিনটার সময় বাথরুমে ঢুকলো তৈরি হবার জন্য। মাঝখানে একটু দিবানিদ্রা দিয়ে নিয়েছে। ভালো করে তৈরি হতে হবে, কারণ প্রতিযোগিতা ডাঃ চ্যাটার্জির কন্যা শুক্লার সঙ্গে। শুক্লা স্বার্থকনামা! গায়ের রং মোম-বাতীকে হারিয়ে দেয়—চর্মের মসৃণতা মাখনের কাছাকাছি—গঠনঃ—না, অনুভা এখানে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠা—নিতান্ত এক-চক্ষুও সেটা স্বীকার করবে!

রূপ অনুভার যথেষ্ট আছে। প্রসাধনের উপকরণ-প্রাচুর্য স্তূপীকৃত—রুচিকে মার্জিত করবার কোনো ত্রুটিই সে করে নি এযাবৎ—অতএব জয় তার হবেই! কিন্তু জয় কার উপর? মেঘনাদ—ফ্যুৎ! ডাঃ চাট্যার্জির কন্যার কি সাধ্য আছে যে মেঘনাদকে তার হাতের বেহাত করতে পারে! কিন্তু ওখানে আরো অনেকে থাকবে—অনেক নারী এবং পুরুষ, অনেক কুমার এবং কুমারী—বিশাল বিস্তৃত মানব-মহারণ্যে এই মানব-মৃগয়া!

ঠোঁট কুঁকড়ে হাসলো অনুভা। প্রকাণ্ড আয়নায় ছায়া পড়লো সেই হাসির—চমৎকার দেখাচ্ছে হাসিখানা। হাসির নতুন একটা ভঙ্গী আবিষ্কৃত হয়ে গেল যেন আজ তার কাছে—

বাঃ! বেশ তো! আবার হেসে হাসির ভঙ্গীটা আয়ত্ত করে নিল অনুভা।

গরম জল, ঠাণ্ডা জল, সাবান, স্নো, ক্রীম, পাউডার, গ্লিসারিন, উঃ! কত কি যে লাগে বর্তমান যুগের এই প্রসাধনাগারে—কিন্তু তখনো লাগতো—সেই প্রাচীন যুগে—কালিদাসের যুগে……তখনো নারী—

'মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব নীপের মালা—
অলক সাজতো কুন্দ ফুলে……
লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু মাখতো মুখে বালা—।'

প্রসাধনে নারীর যুগযুগান্তের অধিকার; এই অধিকারটুকু সে একচেটিয়া করে রেখেছে আজও! সব যুগে, সব দেশে নারী প্রসাধন করে আসছে। অনুভা ভাবতে ভাবতে গান গাইতে লাগলো আপন মনে।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা—
মম অসীম জীবন বিহারী—
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা
তুমি আমারি গো তুমি আমারি—
মম বিজন জীবন বিহারী!

কার জন্য উৎসারিত হচ্ছে এই গীতধ্বনি? ওর কুমারী মনে কোনো ছবি নেই—চঞ্চল যৌবনধর্মী ওর মন অবিশ্রান্ত তরঙ্গ তোলে, কোন ছবিই স্থায়ী হয় না সেখানে। অনুভা অনুভব

করলো, ওর জীবন-বিহারী কেউই নেই—ওটা গানের কথা, কাজেই বলতে হচ্ছে। সত্যি আবার ওরকম কেউ থাকে নাকি? প্রেমে যারা পড়ে তাদের থাকতে পারে! কিন্তু প্রেম কি বস্তু? ওটাতো রোগ একটা! ঠোঁট কুঁকড়ে আবার হাসলো অনুভা—সেই ভঙ্গীর হাসি; কিন্তু ঐ এক রকম হাসিই তো হাসা চলে না সব সময়! লোকে বলবে কি? অনুভা বাইশ রকম হাসতে পারে; আজকারটা নিয়ে তেইশ রকম হোল। সবগুলো একবার রপ্ত করে নিতে হচ্ছে; —আয়নার সামনে দাঁড়ালো অনুভা হাসি রপ্ত করতে। অভিবাদনের হাসি—আপ্যায়নের হাসি—ইঙ্গিতময়ী হাসি—ঈর্ষাপূর্ণ হাসি—উচ্ছ্বসিত হাসি, উপেক্ষার হাসি—উহ্যহাসি, একনিষ্ঠ হাসি—ঐক্যতার হাসি—ওজস্বিনী হাসি—ঔদার্যের হাসি—স্বরবর্ণের প্রায় সবকয়টা বর্ণ ই ওর হাসির বর্ণ-মালায় আছে—ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ক'য়ে কমল হাসি—কমল হীরা বসানো দুলজোড়া পরতে পরতে ভাবলো অনুভা—কোমল হাসি—কমনীয় হাসি—কখ্খনো-না হাসি—কূট হাসি—কঠোর হাসি—কড্লীভার হাসি—হা-হাঃ করে হেসে উঠলো অনুভা। উচ্চ হাসি হয়ে গেল! ছিঃ! ছিঃ! এ হাসি ও কখনো হাসে না। সমাজে এটা মানা। লজ্জিত হয়ে উঠলো অনুভা।

—গুপ্ত সাহেব আ-গিয়া হুজুর!

আয়া বাইরে থেকে বললো অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। অনুভার হাসি শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছে বেচারা! মেমসাব্ হাসছেন কেন? কি তাজ্জব ব্যাপার! হোল কি? ঘরের ভেতর কি এমন থাকতে পারে যে মেয়েটা অমন করে হাসছে?

অনুভাও লজ্জিত হয়েছে আয়ার আগমনের জন্য নয়—নিজের অসামাজিক উচ্চ হাসির জন্যই। বললো,

—বৈঠ্-নে বলো—

আয়া চলে গেল; অনুভা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, মাত্র সাড়ে চারটা। এতো তাড়াতাড়ি মেঘনাদ এলো কেন? ওঃ—না এসে উপায় কি? গত কালই তো ওকে আধমরা করে এসেছে অনুভা! ওকে শিকার করে আর কোনো আরাম নেই। অনর্থক হাসি রপ্ত করার ঝঞ্ঝাট পোহাচ্ছে অনুভা। কিন্তু মেঘনাদ ছাড়াও বিশ্বে বিস্তর লোক আছে এবং অনুভার হাসি তাদের শিকার করবার জন্য তূণে মজুত থাকতে পারে—অতএব অনুভা গ্রীবা ভঙ্গীর কায়দাগুলো রপ্ত করতে লাগলো। গ্রীবা-ভঙ্গীরও সাত রকম কায়দা জানা ওর—উদ্‌গ্রীব গ্রীবা—উচ্চকিত গ্রীবা—উল্লসিত গ্রীবা—এই গেল সাধারণ—তারপর অসাধারণ হচ্ছে—অভিমানাহত গ্রীবা—আদরণীয় গ্রীবা—অনুসরণীয় গ্রীবা—অনাদৃত গ্রীবা। বঙ্কিম গ্রীবার আছে সাতটা প্যাঁচ! এরপর ভ্রূভঙ্গী—কিন্তু সময় হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি প্রসাধন শেষ করতে হবে, অতএব এখন থাক এসব। অনুভা কাপড় পরতে লাগলো।

কাপড়—বর্তমান বাংলার সর্ববৃহৎ সমস্যা—কিন্তু অনুভার তাতে কি! ওর দেরাজ-ঠাসা কাপড়; বরং এই রকম কাপড়ের সমস্যা প্রবল থাকলেই আর পাঁচটা মেয়ের উপর টেক্কা দিয়ে সে আঁচল উড়িয়ে তার বাবার সম্পদের জয়পতাকা ওড়াতে পারে। অনুভা একগাদা কাপড় থেকে একখানা শাড়ি বেছে নিয়েছে—

পরলো। বাকী সব টুকিটাকি সাজ শেষ করলো; নিজকে বারবার দেখলো আয়নায়—তারপর ঘর খুলে বেরুলো—প্রস্ফুট মন্দার কুসুমোপম!

—অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাকে। মাফ চাইচি—। আপ্যায়নের হাসিটা হাসলো অনু।

না—না, তার জন্য কি! আমি বেশ আনন্দেই আছি; ভাল একটা গান বাজছিল রেডিওতে শুনছিলাম।

—রেডিওতে ভালো গান!—কি সব বলেন যা-তা!—উপেক্ষার হাসি হাসলো অনুভা।

—আমি বলছি না যে সে গান তোমার গলার মত ভালো; তবে মন্দ লাগছিল না। তোমার অনুপস্থিতির.....

—অভাবটা পূরণ হচ্ছিল?—উহ্য হাসি দিল অনুভা, তার সঙ্গে অভিমানাহত গ্রীবা।

—তাই কি হয়? সে পূরণ হয় না। বলছিলাম, তোমার অনুপস্থিতির ব্যথা-বোধটা তীব্র করে তুলেছিল গানটায়; কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে, এবার চলো!

—চলুন!—সম্মতির সস্মিত হাসি হাসলো অনুভা—আমি তো তৈরি!

মেঘনাদ উঠে দাঁড়ালো আসন থেকে। চমৎকার ইউরোপীয় সাজ করেছে—পোশাকের কাটছাঁট খাঁটি লণ্ডন-দরজীর হাতের, নিখুঁত একেবারে। ওর সুন্দর দেহে মানিয়েছেও চমৎকার! অনুভা দেখলো একবার।

মস্ত ক্যাডিলাক্‌খানা—আগেই দেখে নিয়েছে অনুভা। নিজের বাড়ির বুইক্‌ পড়ে রইল, অনুভা গিয়ে উঠল ক্যাডিলাকের পালকের কুশনে। চমৎকার আরামের গাড়ি—ওর নিটোল দেহবল্লরীর উপযুক্ত আসন। অনুভা পাশে-বসা মেঘনাদের পানে তাকিয়ে ভাবলো—এই গাড়িতে, প্রাচ্যের এই সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর রাজপথে, এই সুন্দর তরুণটির পাশে তাকে চমৎকার মানাচ্ছে। আর মানব-মৃগয়ায় প্রয়োজন নেই। এইখানেই স্থিতিবতী হয়ে গেলে মন্দ হয় না। যত্নবতী অনুভা অনাহত গ্রীবাভঙ্গী করলো রাস্তার ফুটপাথের পানে তাকিয়ে।

—চলো-না অনু, একটু মার্কেট ঘুরে যাওয়া যাক্‌—মেঘনাদ বললো।

—কেন? ওদিকে দেরী হয়ে যাবে যে!

—নাঃ—এখনো সময় রয়েছে—ঘড়ির পানে চেয়ে বললো মেঘনাদ। ওর ইচ্ছে, পার্টিতে সব আমন্ত্রিতগণ পৌঁছে যাওয়ার পর সে অনুভাকে নিয়ে গিয়ে নামবে তার ক্যাডিলাক্‌ থেকে; সবাই দেখবে, তাই দেরি করতে চায়।

—চলুন তা'হলে!—অনুভা সম্মতি দিল।

গম্ভীর মুখশ্রী। গাম্ভীর্যেরও বহুরকম ভঙ্গী তার আয়ত্তিভূত। থম্‌থমে গম্ভীর, গম্‌গমে গম্ভীর তো নিতান্ত সাধারণ গাম্ভীর্য! ওর আছে মধুর গাম্ভীর্য, কটু গাম্ভীর্য, তিক্ত গাম্ভীর্য, উদাস গাম্ভীর্য, উপেক্ষার গাম্ভীর্য ইত্যাদি! বর্তমানেরটা উপেক্ষার গাম্ভীর্য। মেঘনাদ দেখলো কী অসামান্যা নারী এই অনুভা!

বিরাট একটা মহাকাব্য যেন! প্রতিমুহূর্তে এক একটা নতুন অধ্যায় খুলে যায়—এর প্রতি পাতায় রয়েছে অনন্ত বিস্ময়, অপরিমেয় কাব্যামৃত! মা ঠিকই বলেছে—'অনুভা সোসাইটির সেরা গার্ল।'—মার চোখ আছে।

—আমাকে তুমি রক্ততিলক দিয়েছো, আমারও তো তোমাকে একটা কিছু দেওয়া উচিত।

—রক্তের বিনিময়ে মার্কেট থেকে কেনা জিনিস দেবেন নাকি?

হাসলো অনুভা ব্যঙ্গের হাসি—জব্দ হয়ে গেল মেঘনাদ। নিতান্ত নির্বোধ না হলে এ ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হয় না—কিন্তু এখনো দিনের আলো রয়েছে এবং দুপাশে অগণ্য পথচারী। পথে অসংখ্য মোটর। মেঘনাদ নিতান্ত নিরীহের মত বলল,

—তোমাকে অদেয় কিছু নেই আমার।······

—তাহলে মার্কেটে যাবার কি দরকার? সবকিছু তো মানুষের সাথেই থাকে—

—থাকে, কিন্তু প্রকাশের জন্য মার্কেটের দরকার হয়।

—যেমন ঐশ্বর্যের প্রকাশের জন্য মোটরগাড়ি কিনতে যেতে হয়। কেমন?

—কতকটা সেই রকম—বেশ, সাথে যা আছে—তার কিঞ্চিৎ···হাত ধরে বলতে যাচ্ছে মেঘনাদ।

—থাক্—অভিমানাহত হাসি হাসলো অনুভা—হাতটা সরিয়ে নিলো। এত সহজে ধরা দিলে ওকে বেশীদিন আটকে রাখা সম্ভব হবে না; আরো একটু খেলানো দরকার! অনুভা সরে গেল অল্প একটু। মেঘনাদ কিঞ্চিৎ সাহসী হয়ে বললো,

—তোমার রক্ত তিলকের প্রতিদান দেবার বস্তুই তো কিনতে যাচ্ছিলাম……

—কি সেটা? প্রশ্নটার সঙ্গে মধুর গাম্ভীর্য জেগে উঠলো মুখে।

—যদি বলি বরমাল্য!

—বরমাল্য মেয়েরা কেনে! তারাই মালা গেঁথে বসে থাকে বরের জন্য, অতএব ওটা বাতিল।

—তা'হলে বরণের অঙ্গুরীয়ক!

—বাজে!—ঠোঁট উলটে শব্দ করলো অনুভা। ওসব বিলিতি প্রথার এদেশে চল নেই আর; দেশ জেগেছে এবং আপনারাই জাগিয়েছেন।

—কিন্তু যে আঙুলটি ছিন্ন করে রক্ত দিয়েছ, তাকে যদি আমি সোনা-মণি দিয়ে বাঁধতে চাই তো কি তোমার আপত্তি?

—তাতে আপনার খোস্ খেয়াল মিটতে পারে, আমার দানের যোগ্য প্রতিদান হয় না।

—তাহলে কি দিয়ে হয়?

—থাক; কিছু দিতে হবে না। কিছু পাবার প্রত্যাশায় আপনাকে রক্ত তিলক তো দেই নি আমি!—ড্রাইভার গাড়ি ফেরাও—।

মার্কেট যাওয়া হোল না, মাঝপথ থেকে ফিরলো অনুভা। মেঘনাদ জানে, কি বস্তু চাইছে অনুভা। দিতে ওর আপত্তি কিছুমাত্র নেই। কিন্তু স্থান-কাল বড়ই অনুপযুক্ত। ভাল, শনৈ শনৈ এগুনো ভালো। নিজেকে সামলে নিয়ে মেঘনাদ

আস্তে বললো—তোমাকে একটা সাধারণ আংটি দিয়ে অপমান করবো, এইরকম যেন ভেব না অনুভা!

—অসাধারণ আংটি বাজারে মেলে না।

—কোথায় মেলে?

—তাকে জীবনের অনুভূতি দিয়ে গড়তে হয়; মনরূপী স্যাকরা গড়ে।

—বেশ—তাই হবে।

—তাতে সময় লাগে—অনুভা হাসলো অনুরাগের হাসি—অত তাড়াতাড়ি কি হয়!

— লাভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট......

—ওটা কাব্যের কথা; বাস্তব জীবনে ওকে বাজিয়ে নেওয়া দরকার উভয়ের পক্ষেই। সাইটের সঙ্গে ইন্‌সাইট যুক্ত হওয়া দরকার—নইলে জীবনের ভুল শোধরানো যাবে না।

কথাগুলো বড় বেশী গম্ভীর হয়ে গেল, অনুভা ইচ্ছা করেই বললো এ-রকম গম্ভীর ভাষায় গভীর কথা; কারণ খুব তাড়াতাড়ি সে এই অর্ধমৃত মৃগশাবককে বধ করতে চায় না, ওকে আর একটু সুস্থ সবল করে তারপর সুতীক্ষ্ণ বাণ হানবে অনুভা—ইতোমধ্যে আজ যেখানে যাচ্ছে, সেখানটায় একটু দেখে নিক। কে জানে ওখানে কোনো স্বর্ণমৃগ অপেক্ষা করছে কি না!

—সে ঠিক কথা, কিন্তু ইন্‌সাইট কি আমাদের মত ছেলেদের থাকে?

—আপনি না রাজনীতির চর্চা করতেন! ইন্‌সাইট্ না থাকলে রাজনীতি একদম অচল।

—আমাদের নেতাদের সেটা আছে, মনে করি,

—আপনিও তো কোনোদিন নেতা হতে পারেন।

—সত্যিকার নেতা হওয়া অত সোজা নয় অনুভা, তবে আধুনিক যুগের নেতা হওয়া যেতে পারে। ওর জন্য দরকার কিছু বক্তৃতা করতে শেখা, আর কিছু দল গড়বার ক্ষমতা থাকা। কয়েকটা খবরের কাগজ হাতে থাকলে ব্যাপারটা অর্ধেক সোজা হয়ে যায়।

—তাই করবেন নাকি আপনি?

—ক্ষতি কি! দেখলাম পৃথিবীর শতকরা নব্বই জন মানুষই পরের কথায় ওঠে-বসে। কোনোরকমে একটু নাম বাজারে ছড়িয়ে দিতে পারলেই তুমি হয়ে উঠবে বিশেষ একজন—তখন তুমি যা বলবে, জোর গলায় যা প্রচার করবে, তার দাম যাবে বেড়ে পাবলিকের কাছে; তারপরই বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধ মতবাদ দু'একদিন প্রচার কর—জনমতকে বুঝে দু'একটা বিবৃতি ঝাড়—ব্যস। তোমার নেতা হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই! তখন মন্ত্রীত্ব ঠেকায় কে? অবশ্য জেলে যাওয়ার সার্টিফিকেট এদেশে বড় বেশি কাজে লাগে—তা সেটা তো জোগাড় করে ফেলা গেছে।

হাসতে লাগলো মেঘনাদ আত্মপ্রসাদের হাসি। সকালে মার সঙ্গে ঝগড়ার কথাটা মনে পড়ে গেল অনুভার, "কিঞ্চিৎ সুযোগ সন্ধানের আকাঙ্ক্ষাও যে না আছে, তা বলা যায় না—" ঠিকই কথা মা বলেছিল! কিন্তু খারাপ কি! সবাই তো তাই করছে আজকাল। নেতা হতে পারলে বিস্তর লাভ। হবার

জন্য যা প্রয়োজন, মেঘনাদের তা আছে, তার অতিরিক্ত আছে টাকা-বাড়ি-গাড়ি, প্রতিপত্তি, বাপের পসার। অবিলম্বে স্যার রঙ্গনাথ রাজনৈতিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন ; স্যার উপাধি ত্যাগ করে তিনি তার সূচনা করে নিয়েছেন। অগাধ অর্থের মালিক স্যার রঙ্গনাথ---এবার অগাধ অতলস্পর্শ হয়ে উঠবে তাঁর সম্মান—তার সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্মান হবে গগনচুম্বী—হতে বাধ্য।

রাজনীতি নিয়ে কখনো বিশেষ চর্চা করে নি অনুভা, প্রয়োজনও কম ওর জীবনে, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতার পুত্রবধূ হবার আকাঙ্ক্ষা ওর খুবই আছে—ওর মনে স্বপ্নের মত আশা জাগে—খবরের কাগজের রিপোর্টটাররা যেন এসে ওকে প্রশ্ন করে জানতে চাইছেন—'নেতা কেমন আছেন—তার আগামী কার্য কলাপ কি ভাবে হবে!' মনে হয়—অনুভা যেন বুড়ো শ্বশুরকে হাতধরে নিয়ে যাচ্ছে, লক্ষ লোক তার পানে চেয়ে ভাবছে,—বা, কি সুন্দর পুত্রবধূ! ইত্যাদি হাজার স্বপ্ন জাগে গভীর নিশীথে ওর মনে। কিন্তু স্যার রঙ্গনাথ কি সে স্বপ্ন মেটাতে পারবেন ? না—অনুভা দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করলো,—না।

—কি না ?—পাশে বসা মেঘনাদ প্রশ্ন করলো!

বিব্রত অনুভা বহুক্ষণ ভুলে গেছে মেঘনাদ কি বলেছিল। বললো,

—ফাঁকি দিয়ে নেতা হওয়া যায় না—হয়ে লাভও নেই!

—লাভ যথেষ্ট আছে এবং ফাঁকি দিয়েও ওটা হওয়া যায়। কিন্তু আমি নেতা হতে যাচ্ছি না অনুভা ; তোমাকে পেলে আমি

একটি শান্তির নীড় বাঁধবো—যেখানে জীবন গাঢ়, গভীর—উপরে থাকবে না কোনো তরঙ্গ—নীচে থাকবে না স্রোত; বইবে না বাতাস, উড়বে না ধূলো, রইবে না ফেনা……

হেসে উঠলো অনুভা উচ্চ হাসি। কিন্তু উচ্চ হাসিটা ওর অভ্যাস নয়। মুহূর্তে সামলে নিলে, বললো—ওরকম জীবন কিন্তু মরণের থেকেও ভয়াবহ!

—কেন?

—যে জীবন দৈনন্দিন দিনচর্যায় পাণ্ডুর আর নিস্তরঙ্গ, তার গভীরতা যতই অপ্রমেয় হোক—পাত্‌কোর মত তার তলায় পাঁক্ জমে—মৃত্যুশীতল পঙ্ক—সে জীবনের না আছে ব্যাপ্তি, না আছে দীপ্তি, না আছে গতির উত্তাপ।

—তুমি কি বলতে চাও যে মানুষের জীবন হবে অবিশ্রাম ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া? তাহলে শান্তির বাণী লোকে বলে কেন?

—শান্তির দুটো ভাগ আছে; একটা জীবনের একটা মৃত্যুর শান্তি!

—যথা—মেঘনাদ প্রশ্ন করলো বেশ মি[illegible] কণ্ঠেই; সুরে *দাক্ষিণ্য!*

—যথা, বাংলার বর্তমান যুগের পল্লীর শান্তি, শ্মশানের শান্তি। শঙ্কর মামার ওখানে কয়েকবার গিয়ে আমি দেখে এসেছি—না আছে অন্ন, না আছে বস্ত্র, না-বা আবাস, নেই কোনো পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য-সুখ, আনন্দ! দুঃখের আতিশয্যে ওরা কাঁদতেও ভুলে গেছে, কিংবা চেঁচিয়ে কাঁদবার মত গলার

জোর ওদের নেই। চালের বদলে ক্ষুদ সেদ্ধ আর বাড়ির চারপাশের শাক পাতা খেয়ে ওরা বেঁচে থাকে; কোনো সাড়া নেই, কোনো শব্দ নেই, মহাশান্তির নিলয়! দৈনন্দিন জীবনের সহস্র গ্লানির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ ওদের কণ্ঠে বাজে না, ভাষায় রূপ পায় না; পোস্টঅফিসের পিয়ন ঠিক সময় চিঠি ডেলিভারি না দিলেও, এমন কি, চিঠি খুলে পড়ে ছিঁড়ে ফেললেও জেনারেল পোস্টমাস্টারকে লিখে প্রতিবাদ জানাতে ওরা ভয় পায়; ভাবে কে আবার ঝঞ্ঝাটে পড়তে যাবে! জানেন—গত মন্বন্তরের সময় বাবার সঙ্গে আমি চাল কিনতে গিয়েছিলাম ওদেশে; শঙ্করমামা চাল ছাড়তে চান নি—উনি খাঁটি দেশসেবক কিন্তু বাবা আর ম্যানেজার শুধু খাঁকি হ্যাট্ কোট্ চড়িয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ধম্‌কে চাল আদায় করেছিলেন। এমনি ওরা শান্ত নিরীহ—পেটের খোরাক নির্ঝঞ্ঝাটে ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে মরেছে! আমার মনে হয়, ওদের মরে যাওয়া ভালো হয়েছে; ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো। নতুন প্রদীপ্ত জীবন ওরা লাভ করুক আবার, যে জীবন হবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সৈনিকের জীবন, উগ্র—উত্তাল, অগ্নিস্রাবী, বীর্যবান!

—চাল কিনে তাহলে ওদের মেরে ফেলে উপকারই করা হয়েছে—কি বলো!

—নিশ্চয়—অনুভা শিশুকণ্ঠে বললো—যারা বাঁচতে জানে তাদের বাঁচানো হয়েছে ঐ চাল দিয়ে! অত নিরীহ জীবের পৃথিবীতে টিকে থাকবার কোনো অধিকার নেই। ওরা মরে নিশ্চয় এ সত্য বুঝবে আর আমাদের আশীর্বাদ করবে!

—ওদের আশীর্বাদের ভরসা করো নাকি তুমি ?—মেঘনাদ হেসে বললো।

—করি। শান্ত কণ্ঠে বললো অনুভা—ওদের সেই আশী-র্বাদটা হবে আমাদের জীবনকে বজ্র-ঝন্‌ঝনায় বাজিয়ে তোলবার অভিশাপ—কিন্তু সেই অভিশাপই আমাদের আশীর্বাদ হবে।

মেঘনাদ চুপ করে রইল ; অনুভাও চুপ করলো। ভাবছে, এ কী কথা সে বললো আজ মেঘনাদকে ! নিজে এরকম কথা সে আগে কখনো ভাবে নি ; তার অন্তরে কোথায় ওই মন্বন্তরে মৃত মানুষগুলোর উপর অগাধ দরদ সঞ্চিত ছিল, কিংবা, কোন পূর্বপুরুষের সাধনার ঐশ্বর্য সঞ্চিত ছিল তার অতল মনে, যার অনুপ্রেরণায় একথা বেরুলো তার মুখ দিয়ে ! নিজের মনেই বিস্ময়টা অনুভব করছে অনুভা—আস্বাদন করছে ভাবটা।

গাড়ি এসে ঢুকলো ডাঃ চাট্যার্জির বাড়ির গাড়িবারান্দায়। ডাঃ চাট্যার্জির কন্যা শুক্লা—তারই জন্মদিন আজ। তা' শ্রী নিশ্চয় আছে মেয়েটির—সত্যি শ্রীমতী সে। বয়স একুশ—বি. এ. পাস করেছে এই বছর। পাসের আর জন্মদিনের উৎসব এক সঙ্গেই করা হচ্ছে ! উৎসব এসব পাড়ায় সৃষ্টি করতে হয় খুঁজেখুঁজে। বাংলার পল্লীর মত বারো মাসে তেরো পার্বণ কোথায় পাবে এরা ! তাই জন্মোৎসব, পরীক্ষাপাসের উৎসব থেকে বৃক্ষরোপণের উৎসব, রাখীবন্ধনের উৎসব ইত্যাদি করে—কারণ মানুষের জীবন মাঝে মাঝে উৎসবের রসে অভিষিক্ত না

হলে বাঁচতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদের উৎসবগুলো বড় বেশি কৃত্রিম আর অর্থবহুল। সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় অথচ অন্যের ঈর্ষার দ্যোতক! এসব উৎসবে অন্তরের ঔদার্য বাড়ার চেয়ে বাইরের অহমিকা অনেক বেশী বেড়ে যায়—সেটা স্বাস্থ্য-হীনতার লক্ষণ। কিন্তু গোটা জাতিটাই স্বাস্থ্যহীন হয়ে গেছে।

গাড়ি পৌঁছালো অনুভাকে নিয়ে। প্রকাণ্ড হলঘরটায় বিস্তর মেয়ে পুরুষ। সকলেই দেখলো, অনুভা নামলো মেঘনাদের হাত ধরে। হাত ধরে নামিয়ে নেওয়া ফ্যাসান। অনুভা অনেক পুরুষের চোখেই উৎসব জাগায়, কিন্তু মেঘনাদ তাকে গাড়ি থেকে নামালো, দেখে তাদের চোখে উৎসবের পরিবর্তে জাগলো আর্তনাদ। অনুভা এত তাড়াতাড়ি যেন এন্‌গেজড্‌ না হয়; আরো কিছু দিন কুমারী থাক অনুভা, তাদের সাধনাটা দেখুক।—এইরকম মনোভাব তাদের।

অবশ্য সাধনার ত্রুটি ওরা কেউ এতকাল করেনি কিন্তু সিদ্ধি দূরে রইলো—অনুভা এলো না। অকস্মাৎ একজন এসেই তাকে গ্রাস করে ফেলবে, এটা বড়ই আপ্‌শোষের কথা। চাঁর পাঁচটি যুবক এগিয়ে এলো অভ্যর্থনা করতে—মিস্‌ চক্রবভড্‌টি না আসায় কিছুই জমছে না—এতো দেরী করলেন যে!

—আসুন—আসুন, আপনার জন্যই অন্ধকার হয়ে রয়েছে সবকিছু।

—এতক্ষণে দীপ্তি জাগলো উৎসবটায়—যেন আলো জ্বালা হোল।

এক-একজন্‌ এক-এক রকম মন্তব্য করে চলেছে।

—চাঁদ উঠলো বললে, কথাটা আরো কাব্যিক হোত—বললো অনুভা স্বয়ং।

এগিয়ে যাচ্ছে ; লেডী রঙ্গনাথ (এখনো লেডী নামেই তিনি চলছেন সমাজে) ঠিক সময়ে এসে হাত ধরলেন অনুভার—যে অধিকার গ্রহণ করলেন আপন সদ্য-ক্রীত সম্পত্তির। অনেক পুত্রের মা চাইলেন ঈর্ষার চোখে, অনেক মাতার পুত্রের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু লেডী রঙ্গনাথ সম্মানিতা মহিলা গত মন্বন্তরে তিনি দুধের ক্যান্টিন খুলিয়েছিলেন চার জায়গায় দুধ অবশ্য মিলিটারীর ফেল্‌না মাল থেকে আসতো। খিচুড়ির লঙ্গরখানা তার আগেই খুলে তিনি গভর্নমেণ্টের কাছে নাম খরিদ করে রেখেছিলেন। কয়েকজন বড়লোকের কাছে চাঁদা তুলে কিছু ইজের, ফ্রক, প্যাণ্ট বিলিয়েছিলেন একবার ক্যান্টিনের দুধখাওয়া ছেলেমেয়েদের ; এবার শীতের সময় শ'চার-পাঁচ কম্বল (জুটের অবশ্য) দান করেছেন ঐরকম প্রতিষ্ঠানেই—ইত্যাদি বহু ব্যাপারে কুশলী তিনি—এবং এ সমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী বললেও চলে।

এ ছাড়া গত মহাযুদ্ধে উইমেন্‌স অক্‌জিলারী কোরে অনেক ভালো ভালো মেয়েকে চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন তিনি, যাদের চাকরি-জীবনের মসীলিপ্ত দিনগুলি সাদা কাগজের পাতায় লেপ্টে রইল—পড়া গেল না। পড়া গেলেই বা কি হবে পরাধীন জাতীর জীবনে ওরকম অনেক কিছু হয়ে থাকে। যদি কখনো স্বাধীন হয় ভারত—অনুভা ওঁর হাতের মধ্যে বন্দী থেকে ভাবছিল, কেন-জানি-না মনের কোণে একটা চির অন্ধকার ওর জ্বলে উঠছে যেন। ওর বাবা তো কস্মিন কালে ভারতের

পরাধীনতা নিয়ে চিন্তা করেন না। মাও কোনোদিন করেছে বলে জানা নেই—তবে হ্যাঁ, মায়ের কুমারী জীবনে রাজনীতির, অন্ততঃ রাজনৈতিকের, বিপ্লবী ভারত-পুত্রের সংস্পর্শ আছে—শঙ্কর মামার সংস্পর্শ।

—এসো মা—এসো—যাও, দেখা কর শুক্লার সঙ্গে!

ডাক্তার চাট্যার্জির পত্নী সস্নেহে ডাক দিলেন অনুভাকে। শুক্লা হাসিমুখে বসেছিল আসনে। তাকে ঘিরে ফুল-পাতার সঙ্গে অসংখ্য উপহার আর অগণিত তরুণী—তরুণ। অনুভাও তৈরি হয়ে গিয়েছিল উপহার সমেত—দিল শুক্লাকে। ঠিক তারপরেই দিল মেঘনাদ, যেন অনুভার পরিপূরক সে; কিন্তু অত সূক্ষ্মভাবে এ সব ব্যাপার কারো গোচরীভূত হয় না—শুধু অনুভা অনুভব করলো! বেশ দামী উপহারই দিল মেঘনাদ—গাড়িতেই ছিল ওটা—কৈ, তখন তো অনুভাকে দেখায় নি। অনুভার অভিমান জাগছে, কিন্তু মনে পড়লো,—তারটাও সে দেখায় নি মেঘনাদকে; দেখা-দেখির কথা মনেই হয় নি তাদের দুজনেরই। ব্যস্ত ছিল অন্য কথায়—অনুভা ক্ষমা করলো মেঘনাদকে একবারের মত। কিন্তু অনুভার আনিত উপহারটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একখানা সোনার পাতের উপর মীনা করা একটি ছবি, বাঘ মার্কা নিশান হাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র—নীচে লেখা:—

'—মানুষ আমরা নহি তো মেষ'

শুক্লা হাত পেতে নিল; ছবিটি দেখলো—তারপর ছোট্ট টি'পটায় বসিয়ে জোড়হাত করে নমস্কার করলো—সুন্দর ছবি-খানি—সুন্দর!

ম্লান হয়ে গেল অন্য সকলের আনিত সমস্ত উপহারদ্রব্য—অনুভা টেক্কা দিয়েছে সকলের উপর; মুখখানা বিজয় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠলো ওর অন্য সকলের পানে চেয়ে। সমস্ত দামী, ঝলমলে জিনিসগুলো যেন কালো হয়ে গেছে ঐ ছোট্ট ছবিটুকুর জৌলুষে! লেডী রঙ্গনাথ সুযোগটা ছাড়লেন না। প্রদীপ্ত মুখে বললেন, —আজ এই শুভদিনে তুমি যে বস্তুটি ওকে উপহার দিলে মা, তার তুলনা নেই। সেটি অমূল্য—তাই আমি তোমাকেই অনুরোধ করছি, নেতাজীর প্রিয় সঙ্গীতটি গেয়ে তুমি আমাদের শোনাও।

অনুভা ধীরে ধীরে উঠে গেল বাদ্য যন্ত্রটার কাছে। বসে ও গান গাওয়া চলে না—দাঁড়িয়েই গাইতে লাগলো—

"কদম কদম বাড়ায়ে যা—খুসিকা গীত গাইয়ে যা......"

দাঁড়িয়ে উঠলো মেঘনাদ, তার সঙ্গে সমবেত সকলেই; অনুভার কণ্ঠে সঙ্গীত পোষা পাখীর মত বোল বলে—অনুভা গীতময়ী। সমস্ত হলঘর অতিক্রম করে তার সুর বাইরে এসে বাজতে লাগলো পথচারীর কানে।—দাঁড়িয়ে গেল পথের মানুষ। গানে যোগ দিল অনেকেই, মেঘনাদ এবং আরো কয়েকজন; স্বয়ং শুক্লাও যোগ দিল নেতাজীর ছবিটি হাতে নিয়ে। উৎসব জমে উঠলো।

গত কাল মেঘনাদের ললাটে রক্ত তিলক পরাবার সময় শুক্লা উপস্থিত ছিল না; ঐ সুযোগটা না পাওয়ার জন্য দুঃখ তার কম হয় নি। আজ আবার তাকে ঘিরেই এই উৎসব, অথচ অনুভাই জমিয়ে তুললো সমস্তটা। মুখ ম্লান হবারই কথা, কিন্তু শুক্লা কিছু ধীর প্রকৃতির মেয়ে, নিজকে সামলে চলছে।

গান শেষ হলে "জয় হিন্দ" ধ্বনি করে আসন গ্রহণ করলো সকলে! অতঃপর আলাপ-আলোচনা, নৃত্যগীত এবং খাদ্যপানীয় পরিবেশনের কথা, কিন্তু অতসব জানাবার প্রয়োজন নেই; অনুভা কিছু ক্লান্তি অনুভব করছে! এইখানে, এই ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাকে কত জনা যে কত ভাবে কত সুন্দর কথা বলে গেল, কত তরুণ যে কত ইঙ্গিত করে গেল, কত তরুণী যে কত ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে গেল, তার লেখা জোখা নেই—কিন্তু অনুভা নিজে ভালোবাসবার মত, ঈর্ষা করবার মত, এমন কি ঘৃণা করবার মতও কাউকে পেল না—কিছুই পেল না। আশ্চর্য!

ওর মন অবিশ্রাম উত্তেজনা খোঁজে—এ যেন নিবে আসা সলতে, দীপাধারে তেল নেই যে উস্কে দেওয়া যায় অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা অনিবার্য! না, 'এন্‌জয়' করতে পারছে না অনুভা। একি মৃগয়া? না স্পোর্ট? জলো একটা আনন্দের অভিনয় মাত্র! বাড়ি চলে গেলেই ভাল হয়। মা হয়তো এবার আসবে। অনুভা হঠাৎ বলে বসলো,—শরীরটা খারাপ লাগছে।—শত তরুণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো তার জন্য কিন্তু লেডী রঙ্গনাথ এসে পড়লেন তৎক্ষণাৎ।

—কি হোল মা! মাথা ব্যথা? তা হবেই তো, কাল গেছে ঝামেলা, আজ আবার এই গানের পর গান করতে হচ্ছে। তোমরা যাও দেখি গঙ্গার ধারে একটু হাওয়াতে—!—মেঘনাদ! —মা ডাক দিলেন।

—মা—মাতৃ আজ্ঞাপালক সাড়া দিল!

—অনুভাকে পৌঁছে দিয়ে আয়—ওর শরীর ভাল ঠেকছে না। গিয়েই আমায় একটা ফোন করিয়ে দিও মা তোমার আয়াকে দিয়ে, আমি না হলে ভাবতে থাকবো—কেমন?

অনু বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলো এসে।

• •

গাড়ির ম্লান আলোতে এলিয়ে দিল তনুলতা ; পাশে এসে বসলো মেঘনাদ কিন্তু অনুভার মনে তিল মাত্র আনন্দ অনুভূত হচ্ছে না। অবসাদের চরম গহ্বরে না গেলে যে কোনো তরুণীর মন এরকম অবস্থায় উত্তেজিত হতে পারে—এমন একজন তরুণের সংস্পর্শে।

—শরীর হঠাৎ খারাপ হোল কেন অনু? ক্লান্তি বোধ করছো?

—হ্যাঁ ; একাই আমাকে যোগাতে হবে যত রাজ্যের লোকের উত্তেজনার খোরাক—যতোসব !

—যার থাকে, সে দিতে পারে অনু, তোমার ঐশ্বর্য অনন্ত, তাই...

—থামুন; শুনে শুনে কান ভোঁতা হয়ে গেল আমার ; মাথার মগজে আপনাদের বলা ঐশ্বর্য শব্দটা ছাড়া আর কিছুই নেই—অনুভা এই কথাটুকু বলেই সামান্য একটু উত্তেজনা অনুভব করছে।

—ধনীকে ধনী বলা কি অন্যায়?

—হ্যাঁ—অন্যায়, তাতে ধনীর ধনের অহঙ্কারটাই বাড়ে, ধনের

মর্যাদা বাড়ে না।—অনুভা উত্তেজিত হয়ে উঠলো বেশ একটু। অল্প উঠে বসলো সীটে।

—কিন্তু ধনীকে যে ধনী বলে সে সত্য কথাই বলে।

—সে হয়তো জানে না, অতুল ঐশ্বর্যের তলায় ধনীর অন্তর হয়তো শূন্য।

মেঘনাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো অনুভার মুখ পানে; গাড়ির তরল অন্ধকারে অত্যন্ত রহস্যময় দেখাচ্ছে অনুর মুখখানা; কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

—সে শূণ্যতা নিশ্চয় ধনের শূণ্যতা নয়—হয়তো আর কিছু। মেঘনাদ বললো।

—সেই আর কিছুটাই তখন তার জীবনে বড়—ধন দিয়ে যা পূরণ হয় না। মানুষ শুধু ধন-জন-যৌবন পেলেই সুখী হয় না মিঃ গুপ্ত—রূপ আর রূপা মানুষকে কদাচিৎ সত্যকার সুখ দিতে পারে; সোনালী কাচের চুড়ির মত তার জৌলুষ যতই বেশী হোক, আসলে সেটা কাচ।

—আমিও তো যাবার পথে তাই বলছিলাম যে, জীবন যেখানে গভীর আর তরঙ্গহীন আর শান্ত…

—না—আপনি যা বলছিলেন, তাকে সত্যকার সুখী জীবন বলা চলে না। সে জীবন মৃতের জীবন, তাতে জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ অগ্রগতি নেই; স্থির গণ্ডীবদ্ধ, সে জল যতই গভীর হোক —কূপের জলের প্রবহমানতা নেই তাতে।

—প্রবহমান স্রোতে আবিলতা আসবেই।

—আসুক—তাই তো চাইছি! সবলে, শত তরঙ্গে সেই

জঞ্জালকে দুই কূলে ফেলে চলে যাব আপনার বেগে—অভিসার-পথে আমার অন্তর-বধূ হবে অনলস; আমার প্রেমের অগ্নি থাকবে অনির্বাণ…! গাড়ির সীটে আবার মাথা এলিয়ে দিল অনুভা। ওর উত্তেজিত মন যেন ঝিমিয়ে পড়লো কথাকয়টা বলেই। কার কাছে কি কথা বলছে ও! নিতান্ত অপাত্রে, উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কি? অনুভা ঢলে পড়লো।

মেঘনাদও চুপ করে রইল মিনিট খানেক, তারপর অনুভার কপালে আস্তে আঙ্গুল ছুঁইয়ে শুধুলো—মাথা ব্যথা করছে?

—না—মাথা আমার ব্যথা করে না কোন দিন! ওরকম রোগের বিলাস নেই আমার।—অনুভা মাথাটা সরিয়ে নিল।

অত্যন্ত বিব্রত এবং বিষণ্ণ মেঘনাদ ভাবছে কি এখন করা যায়।

—গঙ্গার ধার দিয়ে যাবে একটু?—শুধুলো।

—না—ওদিকটায় গেলে আমার কান্না পায়।

—কেন?—অতি বিস্ময়ে শুধুলো মেঘনাদ।

—ভারতীয় সংস্কৃতির বাহিকা গঙ্গার দুরবস্থা দেখে মনে হয়, এই সেই পুণ্যতোয়া নদী যার জল ছুঁতে আজ ঘেন্না করে! মাল আর মাস্তুলে আকীর্ণ, মল আর মূত্রে পরিপূর্ণ।

মেঘনাদ বেশ কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল; কোন্ দিকে কথা বললে এই তরুণীর মনঃপুত হবে, কিছুতেই ঠিক করতে পাচ্ছেনা ও; একবার ভাবলো, বর্তমান যুগে এমন অনেক মেয়ে আছে, যারা কথার প্রতিবাদ করার জন্যই কথা বলে এবং বহু সময় নিজের মতের বিরুদ্ধেও কথা বলে বসে; অনুভা হয়ত সেই শ্রেণীর মেয়ে, কিন্তু পূর্বাপর তার কথাগুলো যতদূর মনে পড়ে

ভেবে দেখলো, সমস্তই অস্পষ্ট রহস্যে আচ্ছন্ন। অর্থগৌরব যথেষ্ট আছে কিন্তু অলঙ্কার এতো বেশি যে সঠিক অর্থ বোধ আয়াস-সাধ্য হচ্ছে না। মেঘনাদ ভেবে বললো,

—তাহলে বাড়িতেই পৌঁছে দিই।

—হ্যাঁ—ধন্যবাদ; অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবো।

—অন্ধকার ঘরে কেন? চোখ জ্বালা করছে?

—না—মনের জ্বালাটা নেবাতে হবে।

নিরুপায় মেঘনাদ চুপ হয়ে গেল একেবারে। অনুভাকে সে মাত্র গত কাল থেকে দেখছে। বিশেষ কিছুই জানে না ওর অন্তর-রহস্য সম্বন্ধে; শুধু মার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে যে অনুভার মত হলেই মেঘনাদ তাকে ঘরে আনতে পারে—মা বাপের ইচ্ছা, সে আসুক; মেঘনাদ চেষ্টার ত্রুটি করবে না—হঠাৎ তার মনে হোল নারীকে এই ভাবে আলগোছে ছেড়ে দিলে কোন দিন শক্ত করে ধরা যাবে না! নারী জলের মত, অঞ্জলি দৃঢ়বদ্ধ না হলে আঙুলের ফাঁকে গলে যায়—ওর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ওকে জানিয়ে দিল।

—মনের জ্বালা অন্ধকার দিয়ে নেবানো যায় না অনুভা, আনন্দের আলো জ্বেলে—আনন্দের প্রলেপ দিয়ে তাকে জুড়তে হবে।—মেঘনাদ মাথাটা টেনে নিচ্ছে অনুভার!

অনুভা চোখ পর্যন্ত খুললো না, নিশ্চুপ পড়ে রইল। প্রকাণ্ড গাড়ি, মস্ত উঁচু সীট—তার ওপাশে ড্রাইভারকে একবার চেয়ে দেখলো মেঘনাদ। রাতের কৃষ্ণচুড়াগাছের ঘন ছায়াময় আলো-আঁধারী রাস্তা দিয়ে চলছে গাড়ি। মেঘনাদ অনুভার

মাথাটা নিজের ডানবাহুতে তুলে অকস্মাৎ তার কপালে চুমা দিয়ে দিল একটা, ছুটো, তিনটে !

—থাক্—হয়েছে।

অকস্মাৎ উঠে বসলো অনুভা, ড্রাইভারকে বললো,

—জলদী চালাও গাড়ি, জলদী !

যেন ওকে কেউ তাড়া করেছে। মেঘনাদ বিস্মিত হোল, কিন্তু কিছু বলতে ওর সাহস হচ্ছে না ! অনুভাই সোজা সামনে তাকিয়ে বললো,

—মানুষের আদিম বৃত্তি আজো তেমনি প্রখর আছে—তা ছেঁড়া কাঁথায় কি, আর ক্যাডিলাক গাড়িতেই বা কি ! সুন্দরী দেখলেই—তার গালে একটা চুমা না দিতে পারা পর্যন্ত তৃপ্তি নেই পুরুষের !

—কিন্তু নারীকে পুরুষ ঐভাবেই চেয়ে এসেছে অনুভা।

—থামুন—নারীকে ওর বেশি বড়ো বলে যে ভাবতে পারবে, সেই হবে আমার প্রিয়, প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর। জীবনকে শুধু যৌন আবেদনের মধ্যে আবদ্ধ রেখেই আমি শেষ হতে চাইনে—জীবন আমার কাছে অত ছোট নয়, অত অল্প-পরিসর নয় ; যৌন-জীবনকে অতিক্রম করে যে জীবন মানুষকে দেবতার মত বড়ো করেছে, তাকেই আমি ভালবাসি !

গাড়িখানা গেটে ঢুকলো ! ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে গেল অনুভা—বললো—লেডী গুপ্তাকে বলবেন দয়া করে, আমি ভাল আছি, নমস্কার।

অনুভা ভেতরে ঢুকলো !

উমাশঙ্করের বাড়ি পৈতৃক—প্রাচীন বাড়ি। পাকা ঠাকুর-ঘর, কিন্তু অন্য দুখানি ঘর মাটির দেওয়ালে দোতলা। খড়ের ছাউনি। পশ্চিম বঙ্গের এদিকটায় এই রকম ঘর বিস্তর দেখা যায়। এর দেওয়ালে থাকে রাঙ্গামাটির কাজ, চালের চারিদিকে থাকে কাঠের নানা কারুকার্য আর ঘরের মধ্যে থাকে সুন্দর প্রাচীন কাষ্ঠপুত্তলি ইত্যাদির আলমারী, সেলফ তাক···এই সব বাড়িতে শীতকালে ঠাণ্ডা লাগে না, আর গ্রীষ্মকালে গরমও কম বোধ হয়। গ্রীষ্মের দিনে এইরকম ঘরের মেঝে থাকে শীতল—আরামপ্রদ। ঘরের গর্ভগৃহ অত্যন্ত গম্ভীর এবং অন্ধকার—কিন্তু এদেশের লোক বংশপরম্পরায় এই রকম ঘরেই বাস করছে।

উমাশঙ্করের পৈতৃক বাড়ির বয়স দু'শ বছরের কিছু বেশী। বেশ প্রশস্ত জমির উপর বাড়ি; সামনে গ্রামের বড় রাস্তা এবং রাস্তার পাশেই ঠাকুরঘর। ঐ ঘরে দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। ওর একপাশে ছোট কুঠরীতে আছে শিবলিঙ্গ এবং অন্য পাশে ছোট অন্য এক কুঠরীতে আছে লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ! নিত্য পূজা হয়।

উদয়নকে নিয়ে নন্দিতা বাড়িতে এসে উঠলো, কিন্তু আজ উদয়নের চেয়ে ইলার আগমনটা তার কাছে আরো আবেগময় হয়ে উঠেছে। বহুদিন থেকে ইলার কথা শুনে আসছে সে, কখনো তাকে দেখে নি—তার মেয়ে অনুভাকে দেখে ইলাকে চেনা যায় না।

বাড়িতে এনে ইলাকে সব দেখাতে লাগলো—ঠাকুরঘর, ঠাকুরের আসবাব, শৃঙ্গার বেশের অলঙ্কার—ভোগের বাসন

ইত্যাদি সবই বহু প্রাচীন। তারপর তাকে আনলো ভেতর-বাড়িতে। মস্ত বড় ঘর; মাটির হলে কি হবে—দেখতে অত্যন্ত সুন্দর এবং তার অবস্থা যথেষ্ট ভালো আছে আজও। নন্দিতা ইলাকে বললো,

—এই ঘরখানার বয়স দু'শ পঁচিশ বছর হোল ভাই, ঠিক যখন এর বয়স দু'শ'বছর সেই বছর উদয়ন আসে কোলে।

—তাহলে উদয়নের বয়স হোল পঁচিশ?

—হ্যাঁ।—এই বোশেখে পঁচিশ পূরবে।

—আর ছেলে মেয়ে হয়নি তোমার?

—না—হয় নি, যায়ও নি! ঐ একা! এসো এইদিকে! ইলাকে নিয়ে নন্দিতা রান্নাঘর এবং তৎসংলগ্ন সেকালের ইট-বাঁধানো ইন্দারা আর তার পাশের ফুলবাগান দেখাতে গেল। ঐ ফুলবাগানের ফুল তুলে রোজ ঠাকুর পূজো হয়। বাগানে আছে দুটো চাঁপা গাছ, গোটা দুই কামিনীফুলের গাছ, আর কয়েকটা বেলা, যুই, চামেলীর ঝাড়—ব্যস! এছাড়া বেড়ার ধারে আছে লাল আর সাদা করবীর প্রকাণ্ড ঝাড়, তার ডালগুলো বুড়িয়ে একেবারে কালো কদর্য হয়ে গেছে।

ঐ বাগানের নীচেই খিড়কী পুকুর; বেশ বড় পুকুর; বাঁধানো ঘাট একটা—কিন্তু পদ্ম-লতায় ভর্তি পুকুরটা; জল প্রায় দেখাই যায় না। অজস্র ফুটে রয়েছে শ্বেত শতদল।

—এ ফুল পূজায় লাগে না?

লাগে—কিন্তু তোলা বড় মুস্কিল; পাঁকে ভর্তি পুকুরটা। আঁকসি করে মাঝে মধ্যে তোলে কেউ কেউ। আমাদের পুরুৎ

ঠাকুর অত ঝঞ্ঝাট পোহাতে পারেন না ; আমি অবিশ্যি দুএকদিন তুলে দিই···হাসলো নন্দিতা।

—বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই ফুলভরা পুকুরটি !

—তোমাদের কাব্যিক চোখ—সুন্দর তো লাগবেই ! নন্দিতা বললো।

—কলকাতার চোখ বলো—এমন পুকুর কতকাল দেখিনি !

—দিদি এটা দেখেছে কোনোদিন পিসিমা ?—অরুন্ধতী প্রশ্ন করলো।

ওর দু'চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পুকুরের সৌন্দর্য দেখে।

—না মা—অনুভা কখনো ভেতর বাড়িতে আসেনি—ঠাকুর ঘরেও সে যায়নি কোনোদিন। ও আসে ওর বাবার সঙ্গে—বাইরের ঘরেই ওর মামার সঙ্গে কথাবার্তা কয়, চা খায়, চলে যায়। আমি কতদিন জিদ করেছি, তা বলেছে, ভালকরে পবিত্র হয়ে একদিন আসবে।

ইলা অত্যন্ত দুঃখিত হোল কথাটা শুনে। বললো আস্তে,

—আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেকেই ঠাকুর-দেবতা বিশ্বাস করে না ভাই। অনুভা কলেজী মেয়ে—খানিকটা চার্বাকমার্কা—ওকে তোমার ঠাকুর ঘরে না নেওয়াই ভালো। অনর্থক বিদ্রূপ করবে ঠাকুরকে।

—বিদ্রূপ করবে ?

—হ্যাঁ—ওরা ভগবান, ভূত আর ভবিষ্যৎকে মোটে বিশ্বাস

করে না। বলে, বিশ্বে একটি মাত্র 'ভ' কার সত্য আছে, ইংরাজী V অর্থাৎ ভিক্টরী।

ম্লান হাসলো ইলা। বললো—অনুর সবটাই ওর বাবার মতো মেড্-ইন-ইংল্যাণ্ড মার্কা, কিংবা মেড্ ইন্ রাসিয়া মার্কা—তাও ঠিক নয়, ওরা সব মেড্-ইন্-ইউটোপীয়া মার্কা। ওরা যে কি, তা আজো বুঝতে পারি না। কিন্তু ভেতরে চলো এবার; উদয়নের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে তো!

—সে তার মামার সঙ্গে কথা বলছে এখন। বিশ্রামের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নিতে পারবে। এসো, তোমাদের বসবার ব্যবস্থা করতে হবে। নন্দিতা ইলার হাত ধরে ঘরের দিকে এগুলো।

—তোমরা যাও মা, আমি পুকুর পাড়টা একবার ঘুরে আসি। বড্ড ভালো লাগছে আমার। অরু বলতে বলতেই ছুটলো পাড়ে-পাড়ে।

সব পাড়েই কিছু গাছ আছে, আমড়া, আমলকী, অর্জুন, আম, কাঁঠাল ইত্যাদির বড় বড় গাছ। নীচেটা পরিষ্কার ঝরঝরে। যেন কেউ ঝাঁট দিয়ে রেখেছে। পিক্‌নিক্ করবার চমৎকার জায়গা, অরু ভাবলো।—প্রেম করবার যায়গার কথা ভাববার বয়সও ওর হয়ে এলো কিন্তু কলকাতার মেয়েদের মনে জাগে সর্বাগ্রে পিক্‌নিকের কথা। পিক্‌নিকের সূত্র ধরে ওদের জীবনে প্রেম নামে—ওদের অর্থাৎ ইংরাজের হাতেগড়া এই সমাজবাসী নারীদের; সারা কলকাতার নয় নিশ্চয়ই। অরুন্ধতী একলা ছুটতে লাগলো পাড়ে; ছুটছে না ঠিক, তবে বেশ

জোরে চলছে। বড্ড ভালো লাগছে ওর মুক্ত এই জীবন—প্রদক্ষিণ করে এল সবটা—আবার সেই ঘাট—স্নান করতে নামছে উদয়ন।

—উদয়দা—ফুল তুলবেন?

একেবারে ঘাটের শেষ পৈঠায় লাফিয়ে এল অরুন্ধতী।

—চাই নাকি ফুল? কী করবে? পূজো?

—না-ভাই, পূজোটুজো জানি না আমি; খোঁপায় পরবো।

—ওকেও পূজা বলে, তবে সেটা আত্ম-পূজা!—উদয়ন গামছা দিয়ে গা মাজছে।

—বেশ, তাহলে আত্মপূজাই করবো দাদা—হেসে বললো অরুন্ধতী।

—আত্মপূজায় অহঙ্কার বাড়ে; মানুষ স্বার্থপর হয়ে যায়—উদয়ন হাসলো একটু।

অরুন্ধতী কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করছে কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ওকে সাহায্য করলো। বললো,

—আমি যদি বলি, আপনাকেই পূজা দেব—তারপর প্রসাদী ফুল খোঁপায় পরবো?

—ঠিক বারোয়ারী কালীপূজোর পাঁঠা কাটার মতন, ক'সের মাংস হবে, আগে দেখে নিয়ে তারপর বলি দেওয়া হবে; কেমন?

—না—তা কেন! প্রসাদী নির্মাল্য তো খোঁপায় পরা যেতে পারে।

—ঠিক! কাটা মাংসও তো খাওয়া যেতে পারে—কলকাতায়

দেখলাম, মা কালীর সামনে পাঁঠা কেটে প্রসাদী মাংস বিক্রী করা হচ্ছে……হাঃ হাঃ!

হাসলো উদয়ন—কিন্তু অরুন্ধতীর লোভ দুর্জয় হয়ে উঠেছে; বললো—ওসব ফাঁকি কথা চলবে না উদয়দা,—ফুল আমায় তুলে দিতেই হবে।

—তোমাকে আমার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে পুজো করতেই হবে।

—আমি জানি না পুজোর মন্ত্র!

—আমি শিখিয়ে দেব—উদয়ন গভীর জলে নেমে গেল সাঁতরে!

অরুন্ধতীও জরীপাড় শাড়ির মমতা ভুলে নেমে পড়লো হাঁটুর ভর জলে—তারপর কোমর-ডোবা জলে, তারপরই একেবারে ডুব-জলে! সাতার জানে অরুন্ধতী। লেকের সুইমিং ক্লাবে শেখা সাঁতার—বেশ বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে শেখা সাঁতার; তুনপাঁড়ী দিল—উদয়ন চেঁচিয়ে বললো—নেমো না অরু—বড় পদ্মকাঁটা, গা হাত ছড়ে যাবে; যাও, ওঠ, আমি তুলে দিচ্ছি ফুল!

কিন্তু খাঁচাছাড়া বিহঙ্গীর মত অরুন্ধতী আজ। কাপড়খানা আগেই সামলে নিয়েছে, সটান সাঁতরে এসে পড়ল উদয়নের পাশে—এখানটায় কত জল হবে উদয়দা?

—বিস্তর! তোমার তিনগুণ। ডুবো না অরু!

কিন্তু অরু ততক্ষণ ডুব দিয়েছে জলের তলা দেখতে। আচ্ছা দুষ্টু মেয়ে যাহোক—উদয়ন দেখতে লাগলো, কাচস্বচ্ছ জলের তলা থেকে সবস্ত্রা অরুন্ধতী ভেসে উঠছে। সুন্দর দেখাচ্ছে!

যেন জল ভেদ করে জলপরী উঠলো পদ্মবনে। উদয়ন বলল,

—মাটি ছুঁয়েছ ?

—না ভাই, পারলাম না ! দেখি আর একবার।

—না—উদয়ন হাতটা ধরে ফেললো ওর—এ পুকুরে দানো আছে—চল, ওঠা যাক।

—দানো !—আপনি বিশ্বাস করেন উদয়দা ? চোখ কপালে তুলে শুধুলো অরুন্ধতী !

—করি বৈকী। ভগবানে বিশ্বাস করলে ভূতেও বিশ্বাস করতে হয়। এই নাও ফুল—বৃন্ত সমেত আটদশটা ফুল দিল ওকে।

—ভবিষ্যতেও বিশ্বাস করেন তাহলে ! মা এখুনি পিসিমাকে বলছিল যে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা তিন ভ'কারে বিশ্বাস করে না, ভূত, ভগবান আর ভবিষ্যৎ—আপনি দেখছি তার বাইরে।

—আমি তো আজকালকার ছেলে নই !

—কেন কত বয়স হোল আপনার ?—অরুন্ধতী চোখ দু'টো উঁচু করলো।

—বয়স ? তা অনেক হবে ; তোমার আঙুলের সবকটা পাব্ দিয়েও গোণা যাবে না।

উদয়ন তার পিঠে হাত দিয়ে ঘাটের দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল।

—হুঁ—উঁচু ! বড় জোর বাইশ না হয় তেইশ—মুখভঙ্গী

করলো অরু। বললো—প্রমাণ করুন তো যে আপনার বয়স তার বেশি?

—আচ্ছা, প্রমাণ করে দিচ্ছি, এসো—উদয়ন হাত ধরে টেনে ওকে বুকজলে এনে দাঁড় করালো—বললো—এই যে পুকুরটা, এর বয়স তিনশো বছর। এটা আমার ঠাকুরদাদার বাবার বাবা বা তাঁর বাবা খুঁড়িয়েছিলেন, কেমন?

—মানলাম—তিনশো বছর—তাতে আপনার কি?

—শোনই না—তিনশো বছরের আগের সেই অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ আজো আমার মধ্যে রয়েছেন, আমিই তিনি—আমি তাঁর সংস্কৃতি-ধারার বাহক—তাঁর স্থলাভিষিক্ত; আমি তো ইউরোপ আমেরিকায় জন্মাই নি যে সেখানকার সংস্কৃতি বা শিক্ষার ধারক হব—আমার প্রাচীন জন্মভূমির, প্রাচীন বংশ-ধারার ঐশ্বর্য যদি আমার মধ্যে না থাকে, তাহলে আমি এখানকার কে—বলতো? আজকালকার ছেলে হতে গিয়ে আমার বংশগৌরবের অপমান করে কী শ্রেয়ঃ বস্তু আমার লাভ হবে—বলতে পার?

—কিন্তু সত্যি আজকাল ওসব বিশ্বাস লোকের কমে যাচ্ছে উদয়দা—অরু বলল।

—তার কারণ, দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা আমাদেরকে পরানুকরণে লুব্ধ করেছে অরু—তাই সর্বাগ্রে দরকার স্বাধীনতার! শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা আমি বলছি না; ভাবগত স্বাধীনতার প্রয়োজন আমাদের সব থেকে বেশী। চিন্তার স্বাধীনতা আজ একেবারে যারা হারিয়েছে পাশ্চাত্যের

মোহকারী আত্মম্ভরিতার আলোতে, তারাই আপনার জন্ম-মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করছে।

—এদের সংখ্যা কিন্তু বেশি—অরু আস্তে বললো।

জলের মধ্যে গোটা কয়েক ডুব দিয়ে উঠে মাথাটা মুছতে মুছতে উদয়ন বললো—ঠিক এই জলে ধোয়া ধুলোর মত ওরা ঝরে যাবে—যাবেই—ওরা এদেশের কেউ নয়—ওরা পরগাছা, ওরা রোগবীজাণু !

উদয়ন স্নান সেরে ফেলেছে—উঠে যাবে। অরুন্ধতী বললো,

—গামছাটা দিয়ে যান ; আমিও স্নান সেরে যাই।

উদয়ন তার হাতে নিজের গামছাটা দিতে ইতস্ততঃ করছে, অরুন্ধতী কেড়ে নিল। বললো—যান আপনি, আমি ফুল নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছি।

—তোমার শুকনো কাপড় ?

—কাপড় আছে আমার সুটকেসে ; আপনার ধুতি নিশ্চয় আমি নিতে চাইব না।······

উদয়ন আর কিছু না-বলে চলে এল ; অরু স্নান করতে লাগলো একলা।

স্নানাহার সেরে উদয়ন মাকে শুধুলো—আমার ঝোলাটা তো এলো না মা !

—কি জানি বাবা—সেই মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি তখন। হয়ত এতক্ষণে ফিরেছে।

—সেও তো আশ্রমের মেয়ে ?

—হ্যাঁ—নতুন এসেছে, হয়তো রাস্তা ভুল করেছে।

—তার খোঁজ পেলো কি না, খবর নাও মা—বলে উদয়ন বিশ্রাম করতে গেল।

অরু ডুবে স্নান করেছে পুকুরে, তারপর পূজা করেছে উদয়নের সঙ্গে। বললো,

—তুমি যদি পুকুরে নাইতে মা—তাহলে দেখতে কেমন ঘুম পেত ; ঘুমে আমার সর্বাঙ্গ এলিয়ে পড়ছে একেবারে।

—যা-না, ঘুমুগে—ইলা বললো ওকে। নন্দিতা বিছানা দেখিয়ে দিল।

তারপর ইলাকে নিয়ে গল্প করতে বসলো নন্দিতা। আজ সে ইলাকে ছেড়ে দেবে না—সন্ধ্যার দিকে আর একবার আশ্রমে গিয়ে সেখানকার কাজ-কর্ম ওকে দেখাবে ; এবং ইলা তাকে কতখানি সাহায্য করতে পারে, জানবে।

—উদয়নের এবার বিয়ে দাও ভাই নন্দিতা।—ইলা কথার মাঝে বললো।

—বিয়ে ? জেলেই তো আছে জন্মভোর! বিয়ে দেব কখন !—নন্দিতা হাসল!

—তা'হোক—বিয়ে দিয়ে বৌ আন, তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে!

—তা বলতে পার—আছে নাকি তোমার সন্ধানে ভাল মেয়ে ? তাহলে দাদাকে বলা যেতে পারে—মামার মত ছাড়া উদয়ন কিছু করবে না।

—মেয়ের অভাব কি ?—ইলা বললো।

—অভাব খুবই—নন্দিতা বললো—টাকা-গয়না-পণ খুব মেলে, মেলেনা মনের মত একটা মেয়ে।

—কি রকম মেয়ে চাই তোমার?

—আমার নয়—উদয়নের বৌ চাই—ভাই। উদয়ন দাদার হাতে গড়া, আর দাদাকে তুমি তো খুবই ভাল চেন—কেমন মেয়ে চাই, বুঝে দেখ!

—অরু আর একটু বড় হলে আমি তার কথাই বলতাম। ইলা হেসে বললো।

—অরু—না—কিন্তু অনুভা তো রয়েছে—নন্দিতা উৎসাহিত হয়ে উঠলো অকস্মাৎ।

—অনুভা?—ইলা যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে বললো—না ভাই নন্দিতা

—কেন?—নন্দিতা বিস্মিত হোল।

—ও বড় সৌখীন, বড় বিলাসী—উদয়নের পাশে ওকে দেওয়া যায় না।

—তুমি মা হয়ে একথা বলছো?

—হ্যাঁ—ওকে গড়েছে ওর বাবা—আমার কিছু নেই ওর মধ্যে—তবু আমি ওর মা! কিন্তু উদয়নও আমার ছেলের চেয়ে কম নয়।

—তা হলে—নন্দিতাও যেন অন্যমনস্ক হয়ে বললো—কিন্তু অরু বড্ড ছেলেমানুষ! ওর বিয়ের বয়স হতে দেরী আছে; তবে আমাদের সময় ঐ বয়সেই বিয়ে হোত।

—তারও আগেও হত, আট বছরে। কিন্তু সে-সব দিন

আর নেই এখন! সে যাক—তোমার আশ্রমে কি কোন ভালো মেয়ে নেই—বেশ মনের মত?

—আশ্রমে?—নন্দিতা কথাটা বলেই চুপ করে রইল মিনিট দুই; পরে বলল,—ঠিক সেভাবে তো খোঁজ করিনি ইলা—এ কথা মনেই হয় নি কোনদিন। কিন্তু আশ্রমের কোনো মেয়ের সঙ্গে উদয়নের বিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? না ইলা,—সে হয় না। আশ্রমের সব মেয়েই আমার কন্যা—সকলেই সমান—বিশেষ পক্ষপাতিত্ব কারো উপর করা উচিত হবে না!

—পক্ষপাত কেন নন্দিতা—যে যোগ্যা হবে, তারই কথা আমি বলছি।

—লোকে সেটা বুঝবে না ইলা—আশ্রমের কোনো মেয়েকে উদয়নের বৌ করা চলে না; সে অসম্ভব।

—আসতে পারি মা?—বাইরে থেকে কে বললো।

—এসো মা, এসো—নন্দিতা ডাকলো—এত রোদ্দুরে কেন এলে মা?

—এমনিই যথেষ্ট অন্যায় হয়ে গেছে—পাঞ্চালী ঝোলাটা নামিয়ে আঁচলের আগায় মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললো—তখন আপনারা ব্যস্ত ছিলেন পতাকা তোলা নিয়ে, তাই আমি এসেই নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম—বড্ড ত্রুটি হয়ে গেছে!

—না-মা—কিছু না। ত্রুটি কি আবার! বসো। বড্ড রোদ; খুব কষ্ট হয়েছে?

—আমার অভ্যাস আছে—বলে পাতা শীতল পাটির

একধারে বসল পাঞ্চালী। —আপনাদের কথার মাঝখানে এসে বিরক্ত করলাম—কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর ওর।

—তাহোক মা—আমাদের এমন গোপন কথা কিছু হচ্ছিল না। তুমি কতখানা পড়েছ মা?

নন্দিতা প্রশ্ন করলো পাঞ্চালীকে। পাঞ্চালী শুনেছে নন্দিতার মুখের শেষ কথাটা—আশ্রমের কোনো মেয়ে উদয়নের বৌ হতে পারে না। মুখ নামিয়ে রয়েছে পাঞ্চালী; কিন্তু জবাব তাকে দিতে হবে। নন্দিতা আবার বললো—বলতে কি বাধা আছে মা কিছু?

—না মা! আমি স্কুল-কলেজে তো পড়িনি; বাড়িতে টোল আছে আমাদের; আমার বাবা জ্যেঠা কাকা পড়ান; তাঁদের কাছেই কিছু কিঞ্চিৎ পড়েছি; খুব সামান্য পড়া!

—এখানে তোমাকে ক্লাশ থ্রীতে কেন ভর্তি করা হোল মা?

—ইংরেজি খুব কম জানি। কাকা জেলে যাওয়ার পর আর পড়াই হয়নি ইংরেজি।

—তোমার কাকা কতদিন জেলে গেছেন?

—জেলেই রয়েছেন; মাঝে একবার দিন কুড়ি-পঁচিশের জন্য এসেছিলেন বাড়ি; তার পরই আবার ধরে নিয়ে গেছে। আমার এগার বছর বয়স থেকে তিনি জেলে।

—তাঁর বয়স?

—ত্রিশবছর, কি কিছু বেশি হবে!

—বিয়ে করেছেন?

—না—বিয়ে উনি করবেন না। দেশের কাজেই জীবন উৎসর্গ করেছেন!

কিছুক্ষণ থেমে থাকলো নন্দিতা, পাঞ্চালীও আর কিছু বলছে না। ইলা প্রশ্ন করলো,

—তোমার কি বিয়ে হয়েছে মা?

—হ্যাঁ—'সারদা আইন পাস হবার আগেই ঠাকুরদা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন নয় বছরে।—হাসল পাঞ্চালী ম্লান হাসি। ইলা আর নন্দিতা দেখলো তার হাসির আশ্চর্য কারুণ্য। ইলা বলল,

—তোমার ঠাকুরদা······?

—তিনি দেহরক্ষা করেছেন বছর তিনেক হোল।

—শ্বশুর বাড়িতে তোমার কে কে আছে মা?—ইলা পুনরায় প্রশ্ন করলো।

—যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তিনি ছাড়া আর সকলেই আছেন, শুনেছি!

—তুমি কখনো শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিলে?

—একবার সেই বিয়ের সময়। তার দুবছর পরেই উনি মারা যান টাইফয়েডে।

—আহা! নন্দিতা অব্যক্ত শব্দ করে উঠলো; নির্ণিমেষ চোখে চাইল পাঞ্চালীর পানে।

—প্রাচীন বংশে অনেক ভাল প্রথা আছে কিন্তু কয়েকটা খুবই খারাপ প্রথাও আছে। অত ছোট মেয়ের বিয়ে কেন দিলেন তোমার ঠাকুরদা?

—তা তো আমি জানি না মা। তাঁর ছেলেরা বাপের বিরুদ্ধে কথা বলতে অভ্যস্ত নন—তবু শুনেছি, ছোটকাকা আপত্তি করেছিলেন—কিন্তু তাঁর আপত্তি টেকেনি।

—তুমি এখানে কেন পড়তে এলে মা?—নন্দিতা প্রশ্ন করলো, কে পাঠালো! শ্বশুরবাড়ি থেকে?

—না। আমার ছোটকাকা জেল থেকেই বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন, আমাকে যেন এই আশ্রমে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তাই বাবা ভর্তি করে দিয়ে গেছেন!

—বেশ মা, পড়; ইংরেজিটা ভাল করে শেখ। স্বরাজ এলে হয়তো ইংরেজি উঠে যাবে কিন্তু ইংরেজি খুব বড় ভাষা; বিশ্বভাষা—শিখলে উপকার হবে তোমার।

—চেষ্টা করছি।—পাঞ্চালী মুখ নামালো।

—মা—বলে উদয়ন ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে যাচ্ছে। ইলা বলল,

—এসো উদয়; যাচ্ছ কেন? ও আশ্রমের সেই মেয়েটি; তোমার ঝোলাটা নিয়ে এসেছে।

—ও ধন্যবাদ—আমি ওঁকে অন্য কেউ মনে করেছিলাম—উদয়ন ফিরে দাঁড়ালো।

—আপনার জিনিসগুলো দেখে নিন—পাঞ্চালী বললো আস্তে।

—দেখে আর কি নেব? ওতে টাকা-পয়সা তো কিছু নেই—সবই ঠিক আছে!

—তাহলেও দেখে নিন!—পাঞ্চালী আবার বললো।

—তুমিই ওর ঘরে ওগুলো রেখে এসো তো মা—ঐ সামনের ঘরে—নন্দিতা আদেশ দি

পাঞ্চালী উঠে ঝোলা আর মহাভারতখানা নিয়ে চলে গেলো। ঘরে ঢুকলো গিয়ে; নন্দিতা বললো উদয়নকে,—যা, দেখে নে তোর জিনিস, নইলে মেয়েটি শান্তি পাবে না। একেই দেরী করার জন্য ও কুণ্ঠায় মরে রয়েছে।

উদয়ন কিছু না বলে ধীরে ধীরে চলে এল সেই ঘরে—বললো—খুলুন ঝোলাটা—খুলে দেখান যে টাকাপয়সা সব ঠিক আছে। হাসছে উদয়ন; পাঞ্চালী চাইল ওর মুখ পানে, তখুনি মুখ নামিয়ে নিয়ে বললো—টাকা-পয়সা শব্দ করে; এগুলো দেখছি শব্দহীন শব্দ-সম্পদ।—পতঞ্জল যোগসূত্রটা বের করলো। উদয়ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো পাঞ্চালীর পানে; বললো,

—কোন্‌টা বেশী মূল্যবান?

—মূল্য তো অধিকারী ভেদে হয়—কুক্কুটের কাছে মণির মূল্য কি?

—মণির নিজস্ব মূল্য কুক্কুট নিশ্চয় কমাতে পারে না—।

—সে মূল্য মানুষের চোখেই যাচাই হতে পারে! খনিগর্ভে সেটা পাথর ছাড়া কিছু নয়।

উদয়ন চুপ করে রইল এবার; পাঞ্চালী ওর বুকশেল্‌ফে বইগুলি সব গুছিয়ে রেখে দিল—সবশেষে মহাভারতখানা রাখছে—ওটা পড়তে হবে উদয়নকে।

—টেবিলেই রাখুন—ওটা এখনো শেষ হয়নি পড়া—উদয়ন বললো।

—কি বই দাদা?—অরুন্ধতী ঘুমচোখেই লাফিয়ে এসে হাজির হোল—মহা—ভারত! ওরে ব্যপ্! মহাভারত পড়েন নাকি এখনো আপনি?

—কেন! মহাভারত কি তোমার বয়সে পড়বার বই নাকি? উদয়ন বললো।

—ওতো মেয়েরা দুপর বেলা পড়ে সুর করে—তাও শুনেছি পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা।

—শহুরে মেয়েরা তোমার মত কুক্কুট, তাই মণি-মুক্তার দাম নেই তাদের কাছে।

—বা রে! আমাকে কুক্কুট বললেন! ফাউল কাট্‌লেট খাবার সখ?

—রাঁধতে পার? উদয়ন শুধুলো।

—হুঁ—নিশ্চয়? বলেন তো আজই রেঁধে খাওয়াতে পারি আপনাকে। দিদি অবশ্যি আমার থেকে ভালো জানে! খবরের কাগজে ও রান্নার প্রবন্ধ লেখে পাকপ্রণালী দেখে দেখে। ঐ প্রবন্ধ পর্যন্তই;—জানেন উদয় দা—যে-দিন কিছু রাঁধে দিদি—সেদিন বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে যায়—ইলেকট্রিকস্টোভ, গ্যাস থেকে কয়লার উনুন পর্যন্ত কিছু বাদ থাকে না—আর রান্না যা হয়—কেউ যদি মুখে দিতে পারে!—হিঃ হিঃ হিঃ!

অরুন্ধতী নিজের খুশির খেয়ালেই হাসতে লাগলো। উদয়ন বললো—অত হেসো না অরু, যে মেয়ে রান্না জানে না, তার নারী-জীবনের অর্ধেকটাই অন্ধকার।

—কেন? রান্না করা ছাড়া মেয়েদের আর কিছু কাজ নাই, বলতে চান?

অরুন্ধতী চ্যালেঞ্জ করে বসলো উদয়নকে। উদয়ন শান্ত কণ্ঠে বলল—কাজ অনেক—তার মধ্যে রান্না করাও একটা কাজ। ঐ মহাভারতে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাঁধুনী ছিলেন দ্রৌপদী; পৃথিবীতে অতবড় নারী-চরিত্র খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে—বীরত্বে—তেজস্বিতায় —স্বাধীন-মনোবৃত্তিতে—স্বরাটত্বে!

পাঞ্চালী তাকিয়ে ছিল উদয়নের মুখপানে—কিছু যেন বলবে, কিন্তু বলল না।

—ওঁরা সব ভাই বর লাভ করতেন আর রাতারাতি পাকা হয়ে উঠতেন এক একটা বিদ্যায়।

অরুন্ধতী নিতান্ত অগ্রাহ্যভাবেই বললো কথাগুলো—ওর বয়সের যোগ্য কথা, কিন্তু উদয়ন গম্ভীর হয়ে গেল—বলল, —তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে অরু, তোমার পড়াশুনো সব মিথ্যে হচ্ছে; আমার কোনো বোন এরকম বস্তু-স্বত্বাহীন হবে— এটা আমার কাছে খুবই দুঃখের ব্যাপার; রাতারাতি বর-লাভ কেউ-ই করতেন না—বর লাভের জন্য সুদীর্ঘ তপস্যা তাঁদের করতে হোত। দ্রোণ-গুরুর মূর্তিকে কি গভীর নিষ্ঠায় পূজা করে তবে একলব্য ধনুর্বেদ আয়ত্ত করেছিলেন—আর সেই গুরুর তুচ্ছ অভিলাষ পূরণ করবার জন্য নিজের শ্রেষ্ঠ শক্তি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অকাতরে ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। মানুষের ইতিহাসে এই তপস্যার তুলনা আছে, দেখাতে পার? ভেবে দেখ, ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কারে যে গুরু তাকে অস্ত্র শিক্ষা দেন নি একদিন, তাঁর সেই

ব্যাধশিষ্য গুরুর কত উর্ধ্বে আপন চরিত্র-মহিমা বিস্তার করেছেন! কোথায় রইল গুরুর ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার? এমন কি মনুষ্যত্বের মহিমাতেও তিনি খর্ব হয়ে গেলেন শিষ্যের কাছে।

এ সব গুরুগম্ভীর আলোচনা বরদাস্ত হয় না অরুন্ধতীর। ওর এখন হেসে-খেলে বেড়াবার সময়; বলল—কি জানি দাদা, আমি অতসব পড়ি নি।

—পড়ো—কাশীদাসের মহাভারতখানা অন্ততঃ পড়ো একবার।

পাঞ্চালীর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল—এতক্ষণে সময় পেয়ে বলল আস্তে—এবার আমি যেতে পারি?

—না—অরু বললো—মাসিমা বলে পাঠালেন, আপনি এখানে জলখাবার খেয়ে যাবেন।

পাঞ্চালী কি জবাব দেবে ভাবছে, অরুন্ধতী ততক্ষণ তার খোলাচুলগুলো সামলাতে সামলাতে চলে গেল—বলে গেল, —চুলগুলো বেঁধে নিই আমি ততক্ষণ।—ও দমকা হাওয়ার মতন—ফুরফুর করে আসে, আর চলে যায়। উদয়ন বললো,

—বেশ গুছিয়ে দিলেন তো! ধন্যবাদ জানাচ্ছি না, অতটা অভদ্র আমি নই!

—কিন্তু কিছুক্ষণ আগে একবার জানিয়েছিলেন—পাঞ্চালী নীচু মুখে বললো আস্তে।

—তাই নাকি! তাহলে তো অভদ্রই হয়ে পড়েছি, দেখছি! কি করা যায়?

—কি আর করবেন! এখনো ইংরাজ আমল রয়েছে;

ধন্যবাদ জানানো ইংরাজের আইনে ভদ্রতা—মহাভারতের যুগে যেটা কন্যা-ভগ্নীর স্নেহ ভেবে নেওয়া যেতে পারতো, এ যুগে সেটা ধন্যবাদ দিয়ে কিনে নিতে হয়—অল্প হাসলো পাঞ্চালী।

—অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা এখন অর্থের কেনাবেচার সম্পর্কে নেমেছে !

—নেমেছে কিংবা উঠেছে, জানি না—তবে এটাই চলছে। আর যেটা যখন চলে তখন সেইটাই চালাতে হয়—।

—কিন্তু এইটাই কি চলবে এরপর থেকে ?—উদয়ন প্রশ্ন করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল।

—তা জানি না ; মানুষের সঙ্গে মানুষের যে আত্মীয়তার ঐক্য, তাকে তো বর্তমান সভ্যতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছে।—পাঞ্চালী নীচু গলায় বললো।

—কিন্তু ভারতের বাণী ঐক্যের বাণী। সর্বভূতে সেই পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ভারতের আজ বড় দুর্দিন—তার যুগার্জিত সাধনার বাণী তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

—ভুলতে দেবেন কেন! আপনারা তো রয়েছেন। আপনারা আবার ভারতকে তার সুপ্রাচীন সাধনার গৌরবময় ভূমিতে নিয়ে আসুন, যে ভারত ঐক্যের সাধনায় সর্বজীবকে আত্মীয় করতে পেরেছিল—যাঁরা ঈশ্বরের স্তুতি করতেন—

যো দেব্যোঽগ্নৌ যোহ্‌প্‌সু—
যো বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ, য ওষধিষু ; যো বনস্পতিসু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"

উদয়ন ওর নিচুপানে তাকানো মুখখানা দেখছিল ; হঠাৎ

অরুন্ধতী এসে বললো—ওরে বাবা! বিয়ের মন্তর চলছে যে! আসুন, খেতে আসুন।

লজ্জিত হয়ে দুজনেই বেরিয়ে এল।

পাঞ্চালী নিঃশব্দে জলযোগ সেরে বিদায় চাইল, কিন্তু নন্দিতা বলল,

—কাল সন্ধ্যায় তোমার প্রার্থনা বড় ভালো লেগেছিল মা, আজ এই ঠাকুরঘরে একটু প্রার্থনার আয়োজন করেছি; তুমি থাক—প্রার্থনা করবে।

আপত্তি করার উপায় নেই পাঞ্চালীর! নন্দিতা আবার বলল,

—তারপর আমরা সবাই যাব আশ্রমে—ইলাকে সেখানকার কাজ দেখাতে হবে।

পাঞ্চালী চুপ করে রইল। অরুন্ধতী ওর হাত ধরে টানতে টানতে বলল,

—চলুন পাঞ্চালী দি—পুকুরপাড়ে বেড়িয়ে আসি একটু।

অরু টেনে নিয়ে চললো ওকে; ইলা বললো নন্দিতাকে,

—বেশ মেয়েটি,—বালবিধবা; দেখে কষ্ট হয়। এতবড় জীবনটা সামনে!

—বেশ বনেদী বংশের মেয়ে; শুনলাম, এখনো ওর বাবারা একান্নবর্তী আছেন।

—ওকে ভালোকরে মানুষ কর নন্দিতা, ও হয়তো তোমার

আশ্রমের মূল্যবান সম্পদ হবে। বেশ সলজ্জ, অথচ সাবলীল মেয়েটি—কেমন সুশ্রী!

—তোমার খুবই ভালো লেগেছে—না ইলা?—নন্দিতা হাসলো একটু!

—ভালো তোমারও লেগেছে—ওকে ভালো লাগবেই—!

উমাশঙ্কর ভেতরে এলেন; ইলা বলল—ঘুমুচ্ছিলে নাকি শঙ্করদা?

—না; দিনে তো আমি ঘুমাই না কখনো!—কিছু খেতে দে নন্দা! উদয় কোথায়? বেরুলো নাকি?

—না—সে তো জল খেয়ে গেল—হয়তো বাইরের ঘরে আছে।

—কৈ না তো;—আমিই তো সেখান থেকে আসছি—গেল তাহলে কোথাও।

—হবে; বসো—নন্দিতা দাদার জন্য একটা আসন পেতে দিল। ইলা দিল খাবার—কয়েকটা ফল-মূল আর সামান্য ছানা-গুড়—বৈকালিক জলযোগ।

—তোমার দাঁতের ব্যথাটা এখনো রয়েছে নাকি?—ইলা শুধালো।

—ও থাক্—এবার এক-একটা করে পড়তে পড়তে আমিই কোন্‌দিন পড়ে যাব—হাসলেন উমাশঙ্কর ইলার মুখপানে চেয়ে।

—ভারতের স্বাধীনতা না দেখে তুমি তো মরবে না শঙ্করদা; এই কথা বহুদিন পূর্বে তুমি একদিন বলেছিলে আমায়। ইলা বললো।

—ইংরাজ ভারত ছেড়ে দেবে, তার আর দেরী নেই—কিন্তু ভারতের সত্য স্বাধীনতা আসতে অনেক বিলম্ব ইলা—হয়তো একটা যুগ কেটে যাবে পরাধীন শাসনের গ্লানি মুক্ত হতে। যে নৈতিক অধঃপতন আজ জাতির জীবনে দেখা যাচ্ছে, তাকে পুনরুত্থিত করবার শক্তি আছে শুধু মহাকালের। আরো অনেক বিপ্লব, অনেক দুর্ভাগ্য রয়েছে এ জাতির ভাগ্যে—সেটা না দেখাই ভালো।

—কেন এমন কথা বলছো শঙ্করদা ?

—দেখে শুনে বলতে হচ্ছে ;—কিন্তু তবু দরকার স্বাধীনতার ; স্বাধীনতা পেলে তখন গণশক্তিই পরিচালিত করতে পারবে শাসন-যন্ত্র। কিছুদিন বিভ্রাট-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু তারপরে আসবে শারদ-তরঙ্গিনীর স্বচ্ছ স্রোত—সেদিন হয়তো আমি বেঁচে থাকবো না—কিন্তু যারা থাকবে—তাদের আমরা সৃষ্টি করে গেলাম—এই আমাদের গৌরব—এই সান্ত্বনা।

চুপ করে রইল ইলা অনেকক্ষণ ; শঙ্কর খাওয়া শেষ করলেন। জল খেয়ে উঠছেন,—নন্দিতা বললো,—সন্ধ্যায় তুমি একটু থাকবে দাদা—মন্দিরে পূজা দেব।

—আচ্ছা—এখন আমি একটু ও-পাড়ায় যাচ্ছি ; মহাত্মাজি এই জেলায় আসবেন, তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে।

—কবে আসবেন মহাত্মাজি ?—ইলা জিজ্ঞাসা করলো।

—দিন এখনো ঠিক হয়নি—তবে শীঘ্রই আসবেন।

শঙ্কর হাত ধুয়ে বাইরে চলে গেলেন, যাবার সময় আর একবার বলে গেলেন, তাঁর ফিরতে যদি দেরী হয় তো নন্দিতা

যেন পূজা বন্ধ না রাখে। উনি চলে যাবার পর নন্দিতা জলযোগ করালো ইলাকে, নিজের হাতে তাকে মার্জিত করে দিল—বললো,—দাদার কাছে তোমার কথা কত ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, এতকাল পরে তোমাকে দেখলাম; ছোটতে আরো সুন্দর ছিলে নাকি?

—কি জানি—হাসলো ইলা—উনি বুঝি আমাকে সুন্দর বলতেন?

—না—উনি ওসব কিছু বলেন না। উনি বলতেন, 'ইলাকে দেখলে অবাক হয়ে যাবি। ঠিক যেন তলোয়ার—ঝক্‌ঝক্ করে তার মনের স্বাধীনতার উজ্জ্বলতা!'

—তাই ধ্যাবড়া ভোঁতা আঁস্‌বঁটি হয়েই রইলাম।—হাসলো ইলা ম্লান।

—আঁস্‌বঁটি তো ভোঁতা নয় ইলা—ওর ধারালো মুখটা ঢেকে থাকে মরা মাছকে কেটে নিজের অপমান করতে হয় বলে; আসলে সে ইস্পাত—বীরের অস্ত্র তৈরির উপাদান—।

—কোন্ বীরের কোন্ কাজে লাগলাম আমি?—ইলার হাসিটা আরো ম্লান হয়ে নিবে গেল।

—সব ইস্পাতই বীরের তরবারী হবার সৌভাগ্য পায় না ইলা—তাবলে ইস্পাত ছোট নয়। হয়তো এই আঁস্‌বঁটি দিয়েই কোনোদিন আত্মরক্ষার উপায় হতে পারে—দুঃখ করো না। তোমার থেকে আমার জীবন অনেক বেশী দুঃখময়।—কিন্তু সইয়ে নিয়েছি—নিজকে তৈরি করে নিয়েছি ক্ষেত্রের উপযুক্ত করে; জানি,—ঈশ্বরের বিধানে অকল্যাণ নেই।

ইলা চুপ করে রইল এবার। সত্যই নন্দিতার দুঃখ অনেক।

অকালে বিধবা হয়েছে নন্দিতা—একমাত্র পুত্র রাজরোষেই জীবন কাটায় জেলের শেলে—রাজনৈতিক মহাকর্মী ভ্রাতাকে অবলম্বন করে কোনোরকমে ঐ আশ্রমটা খাড়া করেছে; —আনমনে তাই দিন চলে যায় কাজ নিয়ে—কিন্তু ইলার আনমনা হবারও কিছু নেই। স্বামী সব সময়ে সন্ধানে ফিরছেন শিকারের,—মুনাফাবাজির; ছেলেও তাঁর যোগ্য পুত্র। মেয়ে অনুভা ইলার আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে গড়া। একমাত্র অরু এখনো ততখানা বিরুদ্ধবাদিনী হয়ে ওঠে নি! সান্ত্বনার মধ্যে ইলার আছে প্রচুর অর্থ, অলঙ্কার, আর মেকী সম্মান—কিন্তু তাতে তো ওর মন ভরে ওঠে না!

নন্দিতা ইলাকে নিয়ে একটু বেরুলো পাড়াটা দেখাবার জন্য; বললো—পাড়াগাঁয়ের লোকদের ঘরকন্না দেখে যাও ভাই —কলকাতায় গিয়ে বক্তৃতা করতে তোমার সুবিধা হবে।

—বক্তৃতা আমি কখনো করি না নন্দিতা—লেডী গুপ্তাকে দেখালে সুবিধা হোত!

—তিনি কে আবার?—নন্দিতা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো।

ইলা বললো সংক্ষেপে লেডী গুপ্তার কথা, তার ছেলের আগমন আর অনুভা কর্তৃক রক্ততিলক দানের ইতিহাস; সবশেষে হেসে বলল,

—মানুষের মেকী মনই আজকাল দাম পাচ্ছে নন্দিতা, খাঁটি মনের মূল্য নেই।

—খাঁটি মন তাই অমূল্য—নন্দিতা বললো—সস্তা প্রচারের রংমশাল দিয়ে তাকে দেখাতে হয় না ইলা—আঁধার যত বেশী হবে তার দীপ্তি তত বাড়বে—মেকীর কদর দুদিনের বেশী থাকে না।

ওরা দু'জনে পাশের বাড়ি ঢুকলো বৃদ্ধা জেঠিমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

অরুন্ধতী টেনে আনলো পাঞ্চালীকে ঘাটে; পুকুর ভরা পদ্মফুল, আর ঘাটের উপর বাগানে চাঁপা-যুঁই-চামেলীর মিশ্রিত গন্ধ জায়গাটাকে অপরূপ করে রেখেছে। সূর্য তখনো আছেন। মেঘঢাকা হয়ে তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতি স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে—বেশ ছায়াময় কোমল আলোক। অরু ওকে এনে বসালো।

—জায়গাটা কেমন লাগছে পাঞ্চালীদি?—অরু হেসে শুধুলো।

—তোমাদের কলকাতার লোকের কাছে স্বর্গ—সেখানে এ সব কোথায় পাবে?

—সত্যি বিউটিফুল—কিন্তু আপনাদের কাছে—?

—সুন্দর তো নিশ্চয়ই—তবে কি জান অরু, সুন্দর দৃশ্য দেখবার মত মন মানুষের সব সময় থাকে না—খুব সুন্দরকে অনেক সময় খুব বিশ্রী লাগে—হাসলো পাঞ্চালী।

—তার মানে?—অরু বিস্মিত হচ্ছে।

—মানেটা তুমি আর একটু বড় হলে বুঝবে ; কিন্তু তোমার যিনি দিদি আছেন বলছো, তিনি এলেন না কেন ?

—তার নিমন্ত্রণ আছে আজ অন্য জায়গায়। তাছাড়া ও অনেকবার এসেছে এখানে।

—তোমার দিদির সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছে ?

—কার সঙ্গে বলছেন ?

—তোমার উদয়দার সঙ্গে ?

—না—উদয়দা তো জেলে ছিলেন। দেখা কখন হোল ! —অরু বলল হেসে !

—চলো, তোমাকে চাঁপা ফুল পেড়ে দিই—পাঞ্চালী উঠে চলে এল প্রকাণ্ড চাঁপা গাছটার কাছে ; অনেক দিনের গাছ, বেশ বড় বৃক্ষ। অরুও উঠে এসে বলল,

—দিদি এবার যখন আসবে, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে দেব তাকে।

—বেশ তো, দিও—কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে তিনি যদি না যান আশ্রমে ?

—আপনি তো এখানে আসবেন ?

—আমি এখানে খুব কম আসি অরু—আজই প্রথম এসেছি—আর হয়তো আসবো না।

—ও-মা—কেন ?—মাসিমা তো আপনাকে খুবই ভালবাসেন।

—হ্যাঁ—তিনি আমাদের মা—সকলকেই ভালবাসেন আমাদের—নাও, ফুল নাও !

অরুন্ধতী চাঁপার ফুলদুটো নিয়ে বলল—আপনি একটা,

আমি একটা—বলেই পাঞ্চালীর খোঁপায় একটা ফুল দিল গুঁজে। পাঞ্চালী বিব্রত এবং বিষণ্ণ হয়ে বলল—আমার ওসব নিতে নেই ভাই—তুমি নাও—নাও।

—কেন—আপনার নিতে নাই কেন?—অরু সরে দাঁড়ালো খানিকটা—বা—রে?

—আমি যে আশ্রমের মেয়ে ভাই অরু—ওসব সাজসজ্জা করতে নেই আমার।

—ধুৎ—আশ্রমের মেয়ে তো কি হয়েছে?—যত মিছেকথা! অরু ভ্রূভঙ্গী করলো।

—হ্যাঁ—'আমারে ফুটিতে হোল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে—আমি চম্পা'—হাসলো পাঞ্চালী ম্লান! অরুন্ধতী বিশেষ কিছু বুঝতে পারলো না তার কথাটার—কি বল্লেন?

পাঞ্চালী আবার হাসলো একটু জোরে। বললো—'আমারে ফুটিতে হোল, বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে'—এসো, করবী গুলো বড় চমৎকার ফুটেছে; চাঁপার থেকে ও-গুলো সুন্দর—চাপার বেশ বিধবার মত অরু—করবী বেশ সুন্দর, যেন নবোঢ়া বধূ—আলতা পায়ে—চেলী গায়ে—চুল বেঁধে ঘাটে আসে, যেন ননদের সঙ্গে নাইতে এসেছে—কয়েক গুচ্ছ করবীতে হাত দিল পাঞ্চালী।

—ভা-রী সুন্দর করে তো আপনি বলতে পারেন! কবিতা লেখেন নাকি পাঞ্চালীদি?

—কবিতা!—হাসলো পাঞ্চালী নিঃশব্দে—বললো কবিতা আমার হারায়ে গিয়েছে······

কয়েকটা ফুল তুলে অরুন্ধতী সন্তবাঁধা খোঁপায় পরিয়ে দিতে লাগলো। পাঞ্চালীর অন্তরে কোথায় বেদনার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে, বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও অরুন্ধতী বুঝতে পারলো যেন; বলল—আপনার কথাগুলো বড্ড করুণ পাঞ্চালীদি।

—কারুণ্য থেকেই কবিতা জন্মেছিল; শোক থেকেই শ্লোকের উৎপত্তি—হাসলো।

—তা হোক—আপনি ওরকম করে কথা বলবেন না, আমার কষ্ট হচ্ছে—অরুন্ধতী বলল এতক্ষণে; ও যেন বুঝতে পারলো, পাঞ্চালীর মন তার মনের সমপর্যায়ে নেই—সে সুর একেবারে নিখাদে বাঁধা—বিষণ্ণতার শেষ সপ্তকে বাজে। পাঞ্চালী ওর মুখ পানে চেয়ে দেখলো, সত্যি অরুন্ধতীর মুখভাব করুণ হয়ে উঠেছে। হেসে বললো,—তুমি বড্ড বোকা মেয়ে অরু; এরকম জায়গায় ঐ রকম কথা না বললে কাব্যি জম্‌বে কেন? তাই বলছিলাম! আমি কবিতা লিখি কি না……

—সত্যি লেখেন! কি লিখেছেন, আমায় শোনাবেন?

—না—আমার কবিতা অক্ষরে লেখা হয় না—জীবনের প্রতিদিনের পাতায় লেখা হচ্ছে।

—তার মানে?

—মানেটা একটু কঠিন অরু—তোমার বিয়ের সময় যদি আমাকে নিমন্ত্রণ কর তো বলে আসবো তোমার বরকে বাসরঘরে—কিন্তু আমাকে নাকি আবার বাসরঘরে যেতে নেই!

—ওমা—কেন! আমরা কলকাতার লোক ওসব মানিনা—যত সুপারস্টিস্যান্—

—চুপ—কুসংস্কার বলো—পাঞ্চালী যেন ধমক দিল অরুন্ধতীকে—বলল,—সংস্কারের মূল্য কিছু আছে অরু, হোক তা 'কু' হোক তা 'সু'—এই পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের, প্রতি জাতির মধ্যেই আছে সংস্কার—আর সংস্কার-পথেই সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান হয়ে আসে জাতির মধ্যে…। ওর সবটাই খারাপ নয়—কিছু ভালও হয়তো অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে।

করবী গাছটা ছাড়িয়ে এপাশে এল ওরা—দুজনেই দেখতে পেল, বৈঠকখানার বাইরের ছোট রোয়াকটিতে উদয়ন চুপ করে বসে রয়েছে। ওদের কথা নিশ্চয় শুনেছে সে—পাঞ্চালী লজ্জিত হতে যাচ্ছে, কিন্তু উচ্ছ্বসিতা অরু ডাক দিল জোরে,

—আপনি এত কাছে রয়েছেন উদয়দা—দেখতে পাইনি…

—কাছেরটাকেই মানুষ দেখতে পায় না সহজে—উদয়ন হাসলো।

উত্তর দিতে ভাববার জন্য অরু চাইল পাঞ্চালীর মুখের পানে। উদয়ন আর ওদের মাঝখানে একটা ঘনপত্র টগর গাছের ব্যবধান। পাঞ্চালী কানে কানে বলে দিল অরুকে,

—চুম্বক লুকিয়ে থেকেও লোহাকে টানে ভাই—দেখুন না, ঠিক আপনার কাছে চলে এলাম।

শেষের অংশটুকু অরু নিজের বুদ্ধিতে যোগ করে দিতে দিতে একেবারে চলে এল রোয়াকের কাছাকাছি। পাঞ্চালীর হাত ধরেই সে টেনে এনেছে। উদয়ন বলল,

—তুমি তাহলে স্বীকার করছো যে তুমি লোহা?

—হাঁ—ভালো লোহা—ইস্পাত, যাতে তরোয়াল হয়!—অরু সোচ্ছ্বাসে বলল।

—কিন্তু তার থেকে ভালো ফেরাস আয়রন—যে লোহা নিজেকে ভস্ম করেও মানুষের পাণ্ডুরোগ সারায়—স্বাস্থ্যকে সুন্দর করে—জীবনকে সুস্থ নিরাময় করে তোলে।

উদয়নের কথাগুলো নিশ্চুপে শুনলো পাঞ্চালী দাঁড়িয়ে; তার মুখের ভাব একটু কঠিন, একটু কোমল, কিছু বিষণ্ণ, কিন্তু হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো,—ধনুর্বেদ ছেড়ে আপনি কি এখন আয়ুর্বেদকেই গ্রহণ করতে বলছেন?

—না—ধনুর্বেদকে আমি ছাড়তে বলছি না একেবারে—তবে ধনুর্বেদের প্রয়োজন জগতে যতখানি, আয়ুর্বেদের প্রয়োজন তার থেকে বেশি—এই সত্য আবার মানুষের সমাজকে শেখাতে হবে; নইলে মানুষ তার নিজের আবিষ্কৃত ধনুঃশরে নিজেই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

—তাতে হয় তো আবার নব সৃষ্টির সম্ভাবনা—নতুন পৃথিবীর নবরূপের বীজ থাকবে।

—পুরানো—পরিচিত পৃথিবীকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট করবার কী অধিকার আছে মানুষের?

—মানুষ তার বৈজ্ঞানিক সাধনায় সেই অধিকার অর্জন করছে—পাঞ্চালী বলল।

—এই নিষ্ঠুর সাধনা আসুরী—মানবত্বের বিরোধী এ সাধনা। এতে কল্যাণ নেই!

পাঞ্চালী একটুখানি চুপ করে থেকে বললো—মানুষ আজো

জানে না, কিসে তার কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ। ধ্বংসের যিনি দেবতা তিনি সৃষ্টির বীজ হাতে নিয়েই ধ্বংস করেন। আমার মনে হয়, পৃথিবী যে-পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে এই ভোগপন্থী বৈজ্ঞানিক মানব-সমাজের ধ্বংস হয়ে যাওয়াই উচিত—শান্তিময় আরণ্যক সভ্যতার পত্তন হোক আবার···

কথার আলোচনা শেষ হোল না—ইলা ডাক দিল ঠাকুর ঘরে যাবার জন্য।

সারা রাত ভাল ঘুম হোল না অনুভার; কি যেন একটা অভাব-বোধ ওর অন্তরে জাগছে; সোসাইটির সেরা মেয়ে অনুভা সোসাইটির সেরা ছেলের সঙ্গে বিবাহের পথে যাত্রা করবে জীবনের সুবিশাল প্রাসাদে—কিন্তু কোথায় যেন একটা ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ মনের মধ্যে আশঙ্কা উৎপাদন করছে। বিরক্তির তিক্ততা যেন শিরার শোণিতের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে ওর! প্রথম যৌবনের সৃষ্টিধর্মী প্রেমকে অতিক্রম করে ও যেন আরো এগিয়ে যেতে চায়—যেখানে প্রেম সৃজন-পালন-লয়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—যেখানে প্রেমই শুধু ভাস্বর; চন্দ্রের মতো একা অনন্ত আকাশ জুড়ে দীপ্ত হয়ে রয়েছে—কিন্তু কোথায় সেই প্রেম—কার কাছে!

বর্তমান আধুনিকতায় অভ্যস্থা অনুভার কাছে আধুনিকতা যেন বিস্বাদ ঠেকছে—বাড়ি-গাড়ি-শাড়ির মহিমা ম্লান হয়ে গেছে —মলিন হয়ে উঠেছে রূপ-যৌবনের ঔজ্জ্বল্য—অথচ সত্যি

কিছুই মলিন হয় নি—সবই ঠিক আছে। কেন এমন হোল? —ভাবতে ভাবতে বিছানা ছাড়লো অনুভা। তখনো খুব ভোর। এতো ভোরে উঠা ওর অভ্যাস নয়—কিন্তু আজ উঠেই পড়লো। স্নান এখনি করবে কিনা, ভাবতে ভাবতে নেমে এলো নীচের বাগানে। ম্যাগনোলিয়া ফুটে রয়েছে—ক্রীসান্থিমাম—কসুমস্…কিন্তু ওর পাশে কোণার দিকে ওটা কি? তুলসী গাছ একটা!—আশ্চর্য হয়ে গেল অনুভা—ওটা যে তুলসী গাছ, তা অনুভা চেনে, নন্দিতার বাড়ির উঠোনে দেখে এসেছিল একদিন—কিন্তু এখানে কে ওটা অত যত্ন করে বসিয়েছে মাটিতে? অরুন্ধতী? না—অতসব কাণ্ড সে করবে না—করলে দিদিকে নিশ্চয় বলতো বাহাদুরী দেখাবার জন্য। তবে কি মা লাগিয়েছেন—কে জানে!

মালিরা তখনো সব ওঠে নি—শুধু দারোয়ানটা গেট খুলেছে ওদিকে—অনুভা তুলসিগাছটার কাছে চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল; ছোট গাছ, মাত্র হাতখানেক উঁচু—কিন্তু দেখতে সুন্দর—অনুভা হাত দিল গাছটার পাতায়—হাতে গন্ধ লেগে গেল তুলসীর। গাছটা তো নেহাত মন্দ নয়—এই গাছ নাকি হিন্দুদের ঠাকুর। অনুভাও তো হিন্দু!—কে জানে? অনুভা যদি হিন্দু হয় তো সেটা 'বাই এ্যাক্‌সিডেণ্ট'—সেটা দুর্ঘটনাক্রমে। হিন্দু না হলেই ওর ভালো হোত। ও এখন আন্তর্জাতীয়তার কথা নিয়ে মাথা ঘামায়—বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যেকার ভেদ-বিভেদ মুছে করতে চায় পৃথিবীতে এক জাতির প্রতিষ্ঠা। ও সেই স্বপ্নে মসগুল থাকে—তুচ্ছ তুলসীগাছ নিয়ে ওর এত ভাবলে চলে না।

তবু অনুভা হিন্দু—এটা অস্বীকার করার উপায় ওর নাই। ওর হিন্দুত্ব মার্জিত—পরিষ্কৃত; তাতে কোনো গোঁড়ামী নেই—কোনো শুচিবায়ু নেই, কোনো অহেতুক বিদ্বেষ নেই অপরের ধর্মের প্রতি; ওর হিন্দুত্বই খাঁটি হিন্দুত্ব। তাহলে তুলসীগাছটাকে অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না—হিন্দুরা ওকে দেবতা বলে। কেন বলে তা অবশ্য জানা নেই অনুভার, তবে বলে—এটা অনুভা ভালই জানে।—অনুভা গাছটাকে আর একবার ছুঁলো। ঠিক নমস্কার করলো কি না, বলা যায় না—তবে সে অনুভব করলো, তার মজ্জায় মজ্জায় হিন্দুত্বের একটা অন্তঃসলীলা স্রোত বহমান রয়েছে; কোন রকম ইউরোপিয়ানাই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে না—সে আছে, সে থাকবে—তাকে বলে সংস্কার!

অনুভা অনেক বিলাতী বই পড়েছে, বিজ্ঞানও পড়েছে কিছুটা—ইউরোপের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান তার আছে—কিন্তু দেশীয় অধ্যাত্মনীতি সম্বন্ধে সে একেবারে অজ্ঞ। ঈশ্বরে অবিশ্বাস সে করে না—কিন্তু বিশ্বাসের যে দৃঢ়তা, তার কিছুই ওর নেই; তাই ওর মনে হয়—ঈশ্বর নামে কোনো কিছুর চিন্তা না করাই ভালো! বর্তমান যুগ মানব-চেতনা যুগ—গণচেতনার যুগ—বিজ্ঞানের কঠোর কষ্টি-পাথরে এযুগের সব কিছু যাচাই হয়ে যায়—; ঈশ্বর যাচাই হতে পারলেন না এখনো। কোনো দৃশ্যমান প্রমাণ তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজো মেলে নি—তবু অনুভা আজ অকস্মাৎ ঈশ্বরকে যেন বিশ্বাস করে বসলো—ঐ তুলসী গাছেই বিশ্বাস করলো

না—তবু মনে হোল, ঐ সুন্দর গন্ধের পবিত্রতাকে আচ্ছন্ন করে তিনি রয়েছেন।

—টেলিফোন……হুজুর—। আয়া ডাক দিল অনুভাকে। এতো সকালে কার টেলিফোন? বিরক্ত হচ্ছে অনুভা—কিন্তু মনে পড়লো, গত কাল তার অসুখের জন্য কোনো শুভানুধ্যায়ী খবর নিতে চান—অনুভা ভেতরে এসে ফোন ধরলো!

—কেমন আছ মা এখন? কতক্ষণ উঠেছ?—লেডী গুপ্তার কণ্ঠস্বর!

—ভাল আছি; ধন্যবাদ—এই কিছুক্ষণ হোল উঠেছি: আপনার শরীর ভালো?

—হ্যাঁ মা—ভাল! তোমার মা কাল ফেরেন নি?

—না—আজও ফিরবেন কি না কে জানে!

—আহা! একলা কষ্ট হচ্ছে মা?—এখানে চলে এসো: গাড়ি পাঠিয়ে দেব?

—না, মাসীমা—আমাকে একবার শ্যামবাজার যেতে হবে এখুনিই—অনুভা জবাব দিল।

—শ্যামবাজার যাবে? কেন মা—কি দরকার?

—মামীমার কাছে যাব—একটু দরকারী কথা আছে; তিনি ডেকেছেন।

—আচ্ছা মা, ওবেলা তাহলে খবর নেব—লেডী গুপ্তা ফোন কেটে দিলেন।

অনুভা একটু হাসলো নিজের মনে। মামীমার কাছে

শ্যামবাজার যাবার ওর কিছু দরকার নেই—মামীমাকে ও মোটে পছন্দ করে না। গোঁড়া জমিদার বংশের মেয়ে তিনি, সকাল থেকে স্নান আর পূজা নিয়েই আছেন—গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে যখন বেরুন—অনুভার মনে হয়, কিম্ভূতকিমাকার একটা জীব কোটোর থেকে বের হয়ে এল।—তবু আজ মামীমার কাছে যাবার কথাটাই বললো অনুভা—কেন বললো, তা ও জানে না—ওর মনের অবচেতন স্তরে কোথায় তুলসীবৃক্ষের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা লুকোনো ছিল, এটা হয়তো তারই প্রকাশ। —কিন্তু কথাটা যখন বলেই ফেলেছে, তখন সেটাকে সত্য করে তুললে কেমন হয়? একলা ভালো লাগছে না তার—শ্যামবাজারে বেড়িয়ে এলে মন্দ হয় না। চাকরকে ডেকে অনুভা গাড়ি ঠিক করতে বলে স্নান করতে ঢুকলো। স্নান সেরে কিছু না খেয়েই চলে গেল শ্যামবাজার। ভাবলো—এখনো বেশি বেলা হয় নি—শ্যামবাজারে গিয়েই প্রাতরাশ করবে মামাতো বোন গায়ত্রীর সঙ্গে। গায়ত্রী ওর থেকে এক বছরের বড়—এবং দুজনে খুব বন্ধুত্ব। অনুভা ওর সঙ্গে কিছু পরামর্শও করতে পারে। গায়ত্রী কুমারী নেই—ওর বিয়ে হয়েছে সতের বছর বয়সে; স্বামী ডাক্তার, সন্তান হয় নি এখনো!

শ্যামবাজার পৌঁছে গেল অনুভা আটটার আগেই। গায়ত্রীই আদর করে ঘরে তুললো ওকে—বললো—পথ ভুলে নাকিরে অনু?

—ভুল পথে যদি ঠিক জায়গায় যাওয়া যায়, তাহলে পথ ভুল হওয়া ভাল।

—তোর যেন সেই রকমটাই হয়—সকাল বেলা আশীর্বাদ দান করলাম, ভুল পথেই যেন ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাস।

হাসলো গায়ত্রী।

— কিন্তু যদি পথ বেশি ঘুর হয় গায়ত্রী দি ?

—তা হোক—গল্পে শুনেছি, ছয়দিনের পথের থেকে ছয় মাসের পথ ভাল।

অতঃপর ওকে টেনে ওপরে তুললো গায়ত্রী। অনুভা নিশ্চিত হয়েই শুধুলো,

—মামীমা তো তাঁর চোরা-কুঠরীতে—ডাক্তারসাহেব কোথায় ?

—বেরিয়েছেন 'কলে'; মা গঙ্গা নাইতে গেছে—চোরা-কুঠরী এখন খালি রয়েছে।

এই মেয়েটিকে নিয়েই গায়ত্রীর মা বিধবা হন। স্বামী-বিয়োগের পর কন্যাটিকে যথাসাধ্য যত্নে বড় করে সতের বছরেই ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছেন কমলা দেবী—তার পর থেকে তিনি সংসারে প্রায় না-থাকা বললেই চলে ; নিজের পূজা-জপ-তপ নিয়েই কাটান। অবস্থা স্বচ্ছল—ডাক্তার জামাই তাকে স্বচ্ছলতর করেছেন। শুধু গায়ত্রীর কোলে একটা ছেলে এলেই মা কাশীযাত্রা করতে পারেন—কিন্তু মেয়ে-জামাই কাশী-যাত্রার বিরুদ্ধে !

—তাহলে চল, চা-টা খাওয়া একটু—কিছু না খেয়েই বেরিয়েছি।

—তাইতো দেখছি—জামা-কাপড়গুলোও তেমন জুৎসই

ঠেকছে না। ব্যাপার কি অনু? প্রেমে পড়ে গেলি নাকি? হাসলো গায়ত্রী।

—পড়লে মন্দ হোত না ভাই—পড়তে পারছি না। যার সঙ্গে পড়বো মনে করি, সেই দুদিন পরে দেখি জোলো হয়ে যায়।—

—তাই নাকি? আজ কাগজে দেখলাম, স্যার রঙ্গনাথের ছেলেকে তুই রক্ত-তিলক দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিস—ব্যাচারা এর মধ্যেই ফিকে হয়ে গেল?

—ও বরাবরই ফিকে—গঙ্গা দেখার আগে অনেকে ভাবে, গঙ্গা বুঝি রঙচঙা কিছু হবে—দেখতে এসে দেখে শুধু জল;—হাসলো অনু।

—তাহলে ওর আশা ছেড়ে দিতে হোল—কি বল?—গায়ত্রী চা খেতে বসাবার জন্য ওকে ওর মায়ের ঘরের বারান্দা থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। সুমুখেই সেই চোরা-কুঠরী—অর্থাৎ মার পূজার ছোট্ট ঘরটি—দরজা খোলা—সুন্দর কাঠের চৌকীর উপর দেবমূর্তি—অনুভা দাঁড়াল,

—খোলা রয়েছে যে চোরা-কুঠরী?

—আমি ধুয়ে পরিষ্কার করলাম এইমাত্র- গায়ত্রী বন্ধ করে দিচ্ছে দরজা।

—দাঁড়া না, দেখি—অনু অকস্মাৎ ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে।

—জুতো খোল—গায়ত্রী আদেশ করলো।

অনু জুতো খুলে ফেলেছে তার আগেই; ঢুকলো। এই প্রথম প্রবেশ করলো অনু ঠাকুরঘরে। এর আগে কখনও কোনো দেবমন্দিরে ও ঢুকেছে, এমন তো মনে পড়ে না। অনুভা

দেখতে লাগলো ঘরটা—ঠাকুর। বারান্দার একধারে এই ছোট ঘরটি আলাদা করে তৈরি করা—মার্বেলের মেঝে—দেয়ালগুলো পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। কাঠের চৌকীতে পেতলের শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি—বাঁশী বাজাচ্ছেন। পূজার সরঞ্জাম, ফুল-চন্দন-ধূপদান-তুলসীপাতা। সামনে মামীমার বসবার আসনটাও পাতা রয়েছে—অনুভা প্রণাম করলো হাঁটু গেড়ে বসে। গায়ত্রী জানে, অনু এরকম করে না। হেসে বললো,

—অকস্মাৎ এতো ভক্তি! ব্যাপার কি রে অনু?

—তুই যা না—ভাই, চায়ের যোগাড় কর, আমি একটু বসবো এখানে।

গায়ত্রী আর একবার চাইল অনুর মুখপানে, তারপর চায়ের যোগাড় করতে চলে গেল। অনু একা বসে রয়েছে—বসে বসে ভাবছে; বৃন্দাবনের ঠাকুর এই কৃষ্ণ—ওকে নাকি গোপীরা সব ভালবাসতো—ওর জন্য কূল-মান ছেড়ে বেরিয়ে যেত তারা; এতো নিবিড় ছিল তাদের প্রেম—ধ্যেৎ! ওসব গল্প—কাব্য—কল্পনা! অনুভা ভাবতে লাগলো, বেশ মিষ্টি গল্প—পড়তে খুব ভালো লাগে—প্রেম, বিরহ, মান, হাজার রকম লীলা-বিলাস। মানুষের জীবনে ওসব কি সম্ভব কখনো? মানুষের প্রেম যৌনধর্মী—তার সাধারণ সংজ্ঞা 'কাম'—সুচতুর মানুষ তাকে আধ্যাত্মিকতার আবরণে ঢেকে নাম দিয়েছে প্রেম; কিন্তু কে জানে—বৈষ্ণব সাহিত্যে ঐ প্রেম শব্দটাকেই কতরকম চুলচেরা ভাগে ভাগ করে 'বৈধী'—'অহেতুকী' ইত্যাদি কত নাম দেওয়া হয়েছে—শুনেছিল অনুভা একবার একজন ভাগবত

পাঠকের মুখে; আর বৈষ্ণব সাহিত্য মন্থন করেই তো কবি রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি-অমৃত পরিবেশন করেছেন বিশ্বের পিপাসী জনকে। কিন্তু ওগুলো সাহিত্য, অর্থাৎ কল্পনা-বিলাস মানুষের মনের; তা হোক—মন নিয়েই তো মানুষ—মন আছে বলেই তো মননের দ্বারা সে অদৃশ্যকে দেখতে পারে, অছোঁয়াকে ছুঁতে পারে—অনন্তকে অধিগত করতে পারে! ভারতীয় সাধনা এই মনের শক্তির সাধনা—মনের উন্নতির সাধনা—উৎকর্ষের সাধনা! আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন উন্নত হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু উৎকর্ষ কতখানি লাভ করেছে তা আজো বিচারাধীন। ভারতীয় মন প্রেম-সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করেছিল—তাই…

—অনু—মা, কতক্ষণ এয়েছিস তুই?—মামীমা ঢুকতে ঢুকতে শুধুলেন।

—এই আধঘন্টা হবে—তোমার পূজার ঘরে আজ ঢুকলাম মামীমা, অপরাধ নিও না—হয়তো ভুল করে ঢুকে পড়েছি। হাসলো অনুভা।

—এই ভুলটুকু তোর জন্ম জন্ম স্থায়ী হোক মা—। মামীমা আশীর্বাদ করলেন।

সবাই একই রকম কথা বলে এরা আজ। আশ্চর্য! অনুভা বিস্মিত হচ্ছে না। এগুলো এ্যাক্‌সিডেন্ট—এই কথার ভাবগত ঐক্য। কিন্তু আজ যেন তার জীবনে এগুলো বেশিমাত্রায় ঘটতে লেগেছে। মামীমার কথাটা ভাবতে ভাবতে অনু বেরিয়ে আসছে; মামীমা বললেন,

—যা—চা খেয়েছিস্? ওরে গায়ত্রী—অনুকে…

—আমি যাচ্ছি মামীমা—তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পূজোতে বসো। চা খাব এখন।

—আচ্ছা—থাক তবে—কমলা দেবী বসলেন আসনে।

পঁয়তাল্লিশের উপর বয়স কিন্তু গায়ের রং যেন আগুনের মত ওঁর; আশ্চর্য সুন্দরী এখনো—সে-রূপ দেখলে মনে হয় হোমশিখা। অনুভা মামীমার পিছনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো পূজা—ধীরে ধীরে উনি নিজের কাজ করতে লাগলেন আসনে বসে। গায়ত্রী এসে দাঁড়ালো, বললো,

—চল্—চা খাবি—।

—চুপ—অনু ঠোঁটে আঙ্গুল দিল নিজের। গায়ত্রী হাসলো; টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল আস্তে—এতো আকস্মিক পরিবর্তন ভালো নয় অনু—বুঝলি—এ টেকে না; যদি টেকে তো একেবারে ঘর-ছাড়া করে ছাড়ে!

—আমার কোন্‌টা হবে, মনে করিস?

—টিকবে না—আগামী কাল দেখবো মিঃ মেঘনাদ গুপ্তর মোটরে তুই ডায়মণ্ডহারবারের পথে হাওয়া খেতে যাচ্ছিস, কিংবা······

—থাম—অনুভা ধমক দিয়ে উঠলো—মেঘনাদ গুপ্তর মধ্যে মেঘের রহস্য কিছু নেই—আছে শুধু নাদ—শব্দ; ও 'গুপ্ত' হয়ে ভালই হয়েছে—প্রকাশ হলে পৃথিবী লজ্জা পেতেন।

—কিন্তু স্যার গুপ্তর ঘরেই তোকে মানাবে অনু!

—অনু থাকে সর্বত্র—সে কোথাও বেমানান হয় না। বিশ্ব অনুতেই সৃষ্টি হয়েছে।

—তাহলে মেঘেও তো আছিস !

—আছি, কিন্তু মেঘ ছাড়িয়ে আরো উপরে, যেখানে মেঘ নাগাল পায় না, সেখানেও আছি—আকাশে, মহাকাশে, মহাব্যোমে আছি—শুধু মেঘের নাদই শুনতে হবে, তার কি মানে!

—চল, চা খাবি ; বড্ড উত্তেজিত আছিস দেখছি—কেন রে?

—জানি না !

চা খেতে বসল দুজনে।

গত সন্ধ্যায় পাঞ্চালীর প্রার্থনা শুনেছিল উদয়ন—নিজেও যোগ দিয়েছিল ওর সঙ্গে ; পাঞ্চালী গাইছিল ঃ—

দেবী, প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ

প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য…

বড় চমৎকার লেগেছিল উদয়নের কাছে। কিন্তু ওদের বৈকালিক আলোচনাটা শেষ হতে পেল না। প্রার্থনার পরই নন্দিতা ইলাকে নিয়ে চলে গেল আশ্রমে ; পাঞ্চালীও গেল অরু যায় নি—তারই সঙ্গে সমস্ত সন্ধ্যাটা গল্প করে কাটালো উদয়ন। তার বিপ্লব-জীবনের গল্প, জেলের গল্প আর ইংরাজের শাসনের গল্প—ইতিহাসে যে গল্প লেখা হয় না। রাজা নন্দকুমার থেকে অগাস্ট বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজ, লালকেল্লার বিচার পর্যন্ত। অরুন্ধতী এত মজার গল্প কখনো শোনে নি—ভারী চমৎকার লাগছিল ওর। বলল,

—ইংরাজ চলে গেলে এই সব গল্প ছাপা হবে উদয়দা?

—নিশ্চয়ই; এই সব গল্পকে আমরা রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের পাতায় লিখবো।

—সে গল্প লিখবার উপাদান, প্রমাণ সব ঠিকঠাক আছে তো?

উদয়ন একটুক্ষণ থেমে বললো—সব উপাদান ঠিক নেই, বহুকিছু ওরা নষ্ট করে দিয়েছে; তা হোক, যেটুকু আছে তাতেই হবে। জাতির জীবনে ইংরাজের এই দুশো বছরের শাসন ভুলবার নয়।

—ইংরাজ অনেক ভালো করেছে উদয়দা—এই যেমন পর্দা প্রথার বিলোপ, স্ত্রী শিক্ষা—মানুষের মনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা—

—ওসব কালের দান—অরু! মানুষ প্রতিযুগে যুগোপযোগী হয়ে আপনিই তৈরি হয়েছে—ইংরাজ অতিরিক্ত করেছে আমাদের দেশীয় ভাবধারাকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা—একে বলে 'কাল্‌চারেল্‌ কংকোয়েস্ট'; কিন্তু ইংরাজ সফল হয় নি। তুমি ছেলেমানুষ, এতো কথা বুঝবে না, শুধু জেনে রাখো, যে যুগ আসছে, যাকে শতাব্দীর সাধনায় এদেশের সর্বস্বত্যাগী শহীদগণ আনছেন—আজ তাকে সর্বতোভাবে বরণ করে নেবার জন্য চাই তোমাদের প্রস্তুতি। তোমাদের—যারা আজকার ছেলে-মেয়ে। কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েদেরকে ইংরাজ এমন শিক্ষিত করে দিয়ে গেল, যারা স্বদেশের সব-কিছুকে অগ্রাহ্য করতে যাচ্ছে!

—আমাদের অনেক ভালো আছে, উদয়দা, কিন্তু অনেক খারাপও আছে; যেমন ধরুন ছুঁৎমার্গ, যেমন ঐ পাঞ্চালীদির বিধবা হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন!

—পাঞ্চালী বিধবা নাকি?—উদয়ন প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ—জানেন না? খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল। আহা, কি সুন্দর মেয়ে!

—তা হবে! উদয়ন অন্যমনা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। পাঞ্চালীর বৈকালিক কথাগুলো মনে পড়ল অরুর সঙ্গে বাগানে—তাকে বুঝি বলছিল, "আমারে ফুটিতে হোল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে, আমি চম্পা"—কিন্তু পাঞ্চালীর বৈধব্য নিয়ে অধিকক্ষণ চিন্তা করবার অবসর তার নাই এখন—কারণ অরু জানতে পারবে যে উদয়দা পাঞ্চালীর সম্বন্ধে দুর্বল। উদয়ন ঘাড় সোজা করে বললো,—অকাল বৈধব্য—আর ব্রহ্মচর্য অনেক ঐতিহাসিক আবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকার রূপ পেয়েছে অরু—শুরুতে এরকম ছিল না। বুদ্ধদেবের আমলে পতি-পরিত্যক্তা নারী আবার বিয়ে করতে পারতেন; বিধবারা তো পারতেনই; তার পরেও দীর্ঘদিন এ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক সময় সমাজে এমন অনেক প্রথা চালু হয়ে যায়, যাকে পরবর্তী সমাজ কুপ্রথা মনে করে—কিন্তু ইতিহাস হয়তো বলবে, সেই প্রাচীন দিনে ঐ বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনটা খুব ভাল প্রথা বলে গণ্য হোত। তখন সমাজের গঠন যেমন ছিল, তা আজ আর নেই বলেই ওর পরিবর্তন আবশ্যক এবং সে পরিবর্তন আসবেই। মানুষের জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য মানুষ নয়—কিন্তু মানুষ যখন নিজের জন্য একবার সমাজ গড়ে তোলে, একদিনে নয়—বহু বছরে, তখন তাকে ভেঙে গড়তেও বহু বছর সময় লাগে; বহু শক্তিশালী সমাজ-হিতৈষীর দরকার হয়।

—সেরকম লোক আমাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই আসবেন?

—এসেছেন, আরো আসবেন। রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র থেকে আজকার বহু ব্যক্তি এ নিয়ে সমাজ-দেহকে আলোড়িত করেছেন। কিন্তু কি জান অরু—সবার আগে চাই স্বাধীনতা—পর-শাসিত দেশ নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য বিশেষ কিছুই করতে পারে না। তার শক্তি সব দিকেই সীমাবদ্ধ! তার বাধা বিপুল, তার চেষ্টা সংকীর্ণ!

অরুন্ধতী চুপচাপ শুনে গেল উদয়নের কথাগুলো। বক্তৃতার মত লাগলো ওর কানে—কিন্তু ওর বয়স বক্তৃতা শুনতে অভ্যস্ত নয়। হেসে বলল,

—থাক্ ভাই—বড্ড কড়া কড়া লাগছে; দিদি থাকলে তর্ক করতো আপনার সঙ্গে।

—তোমার দিদি খুবই তর্ক করতে পারেন নাকি?

—ওরে বাপ্—আমি ওকে বলি তর্করত্ন! কিন্তু আপনার সঙ্গে নিশ্চয় হেরে যাবে সে।

—কেন! হেরে যাবে কেন?

—এই রাজনীতি, সমাজনীতির ও কিছু বোঝে না। ইতিহাস অবশ্য জানে, তা ভারতের চেয়ে বেশি জানে ইংলণ্ডের ইতিহাস—বিলাত না গিয়েও দিদি লণ্ডন সম্বন্ধে এমন বর্ণনা দিতে পারে যে আপনার মনে হবে, সে অন্ততঃ ত্রিশ বছর লণ্ডনে ছিল—যদিও দিদির বয়সই হোল মাত্র বিশ—হিঃ হিঃ হিঃ!

হাসতে লাগলো অরুন্ধতী নিজের কথায়। উদয়নও হাসলো,

—তাহলে তোমার দিদিটি তো একটি রত্ন বিশেষ!

—হ্যাঁ—নাচতে-গাইতে, বাজাতে আর বক্তৃতা করতে ওস্তাদ—তর্ক তো ওর জিভের আ... কিন্তু আপনার মত ছেলের পাল্লায় এখনো পড়েনি দিদি।

—তার মানে?

—মানে—ওখানকার সবাই ইংরাজ-ঘেঁষা; ইউরোপের রীতি-নীতি, সমাজ, আচার ব্যবহার নিয়েই ওরা আলোচনা করে—দেশী ব্যাপারে ওদের মাথা খেলে না। ওরা জানে চতুর্দশ লুই-এর সব ঘটনা, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বড় জোর নামটা জানে।

—তুমি একটু বাড়াবাড়ি করে বলছো অরু—তোমার দিদি শুনলে রাগ করবেন।

—একটুও বাড়াচ্ছি না। দিদিকে দেখলেই আপনি বুঝবেন, ওর আপাদমস্তক বিলাতী; কেন যে ও বাংলাদেশে জন্মেছিল, তাই ভাবি। মা অনেক সময় বলে, 'তোর বিলেতে জন্মানোই উচিত ছিল—ডাল ভাতের দেশে কেন মরতে এলি! যা না, সেখানে, বেকন, হ্যাম, স্যামন, সার্ডিংস খা গিয়ে, আর বল ড্যান্স কর গিয়ে!' মার সঙ্গে ওর একদম বনে না—বাবার অবশ্য খুব প্রিয়।

—কে রে—ইলা প্রশ্নটা করেই ঘরে ঢুকলো। অরুন্ধতী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,

—আমি উদয়দাকে বলছিলাম মা, যে দিদি একদম বিলেতী আদর্শে তৈরি—ওর মধ্যে তোমার কিচ্ছু নেই—না রূপে, না গুণে—সত্যি কি না, তুমি বল।

—বলার দরকার কি—কাল চলো আমার সঙ্গে, চোখেই দেখে আসবে।

ইলা বললো। নন্দিতা পিছনে ছিল, বলল—তা যাবে, তবে কাল নয় ভাই, দিন চার পরে। এখানে ওর বিশেষ কয়েকটা কাজ করবার রয়েছে দাদার জন্য—জানতো, নির্বাচন চলছে, দাদা দাঁড়িয়েছেন।

—ও হ্যাঁ—ইলা সায় দিল। বললো—অনুভা এখানে কয়েকবারই এসেছে ওর বাবার সঙ্গে—কিন্তু আনন্দ আশ্রম দেখতে পায়নি একবারও। আমি দেখে এতো তৃপ্তি পেলাম উদয়, যে মনে হচ্ছে, আর ফিরে না গিয়ে ওখানেই কাজে লেগে যাই।—বসলো ইলা সেই ঘরেই।

—কাজে তোমাকে লাগতেই হবে ইলা—একা আমার কাজ নয় ওটা—বলে নন্দিতা ভেতরে চলে গেল। ইলা চুপ করে বসে রইল একটু। পরে বলল,

—তোমার জেল-জীবন হয়তো এবার শেষ হবে বাবা উদয়—এবার কিছু গঠনমূলক কাজ কর; দেশ যাতে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা কর। স্বাধীনতা আজ দ্বারদেশে এসে গেছে। এই স্বাধীনতাকে গ্রহণ করবার যোগ্য করে তোল তোমার দেশবাসীকে।

—স্বাধীন হবার যোগ্য আমরা সত্যি আজো হইনি মাসিমা, কিন্তু জলে না নামলে কেউ সাঁতার শিখতে পারে না। জলে নেমে কিছুটা হাত পা ছুড়বে, কয়েক ঢোক জল খাবে, তবে তো সাঁতার শিখবে! যোগ্য হতে দেরী আছে আমাদের।

—তা হোক—আমাদের চেষ্টার ত্রুটি না হয়।

—না—কিন্তু বহুদিনের পরশাসন—সাম্রাজ্যগর্বী ব্রিটিশ-শক্তির প্রভাব এমন করে ভারতীয়ত্বকে ভেঙ্গে দিয়েছে যে দুইজাতি-তত্ত্ব তো আছেই, দশ-বিশ জাতিত্বের বিভেদ বিদ্বেষে দেশটা পূর্ণ হয়ে গেল। পৃথক এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন থেকে শুরু করে আজকার এই দেশ বিভাগের দাবী পর্যন্ত তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে—হয়তো আমরা স্বাধীনতা পেলেও আরো অর্ধ শতাব্দি স্বাধীন হবার যোগ্য হব না। একটা বিশেষ বিপ্লব বা বিশিষ্ট পরিবর্তন ঘটা চাই, যার ফল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক জীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন আনতে পারে। ধর্ম-জীবনকে হারিয়ে আজ ভারতীয়রা ঐক্যের সাধনাকে ভুলেছে। তাকে ফিরে পেতে হলে চাই প্রচণ্ড পরিবর্তন—যুদ্ধ দিয়েই হোক বা অন্য যে-কোন রকমেই হোক—একটা ওলট-পালট দরকার হয়েছে।

—তাতে বহু লোকক্ষয় অনিবার্য।

—তা হোক মাসিমা—লোক যেখানে রোগগ্রস্থ, সেখানে তার কিছু ক্ষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়—তা হলে সে রোগের প্রতিকারে সচেষ্ট হবে, সমাজকে আবার স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্যে পূর্ণ করতে চাইবে —নিজকে বুঝতে পারবে।

—কিন্তু জাগ্রত গণশক্তি কি এর প্রতিকার করতে পারবে না?

—গণের জাগরণটাই যথেষ্ট নয় মাসিমা; গণ বড় স্থূল, বড় আয়েসী। আর্য-ঋষিরা তাই গণেশের মূর্তি 'খর্বং স্থূল তনুং'

কল্পনা করেছেন। হাতীর মত তার চোখ ছোট, কান বড় অর্থাৎ সে শুধু শোনে, কিছু দেখে না—শোনা কথাই তার কাছে পরম সত্য হয়; অথচ আজকালের প্রপাগেণ্ডার যুগে শোনা কথার মূল্য অত্যন্ত অধিক। গণশক্তিকে জোর ঢাকে যা শোনানো যাবে, সে তাই শুনবে, তার বিচার বিবেচনা করতে চাইবে না সে। গণমনকে ঠিক পথে চালনা করবার জন্য তাই দরকার মাহুতের—সুদক্ষ মাহুতের দরকার।

—অর্থাৎ নেতার ?

—না—নেতা থাকেন হাতীর পিঠের উপর, হাওদার মধ্যে। মাহুত থাকে মাথায়—অঙ্কুশ হাতে—সব হাতীকে একত্র করে সুশৃঙ্খলে চালাবার কাজ তার। সেই মাহুতই নেই আমাদের —গণমন তাই বিচ্ছিন্ন; দলগত স্বার্থ তাই এতো প্রবল হচ্ছে; নৈতিক অধঃপতন তাই এত বেশী। স্বতন্ত্র নেতা স্বতন্ত্র হাতীর পিঠের উপর থেকে নেতৃত্বের বুলি ছাড়েন, মাহুতহীন গণমন চোখ চেয়ে দেখে না, শোনে হাজার নেতার হাজার রকম বাণী, আর যে যে-দিকে খুশি চলতে থাকে। রথী অনেক, সারথী একজনও নেই—কিন্তু জানেন ত, প্রাচীন দিনের বৃহত্তম যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সারথী। সে যুদ্ধে রথী, অর্দ্ধরথী, মহারথী অসংখ্য ছিলেন—কিন্তু একা শ্রীকৃষ্ণ সারথ্য করেই যুদ্ধ জয় করালেন।

ইলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ভারতের এক মহামানবের কথা মনে পড়ছে ওর; তিনি মানুষের জগতের শ্রেষ্ঠ অবদান; তিনি মহাত্মা।

—মহাত্মাজীর সারথ্যে আজ দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ভারত যুদ্ধ চালিয়ে এল! তিনি নিশ্চয় আমা... যোগ্য সারথী!—ইলা বললো আস্তে।

—দীর্ঘকাল এক নেতৃত্বে কোনো জাতির জীবন পরিচালিত হওয়ায় অনেক ভাল হতে পারে কিন্তু কয়েকটি সাংঘাতিক দোষ ঘটে; শ্রীকৃষ্ণের আমলেও ঘটেছিল।

নন্দিতা ডাক দিল খাবার জন্য; ইলা বলল—যা, তোরা ভাইবোনে খা গিয়ে। সে উঠে গেল যে-ঘরে শঙ্কর বসে আছেন। উনি খেয়েছেন; বিশ্রাম করছিলেন একা। ইলা গিয়ে বসল এবং বলল—উদয়কে ঠিক তোমার মতটি করে তুলেছ; আমার একটা ছেলে বা মেয়েকে আমার মত করতে পারলাম না।

—তাতে ভালই হয়েছে ইলা। তোমার একটা জায়গায় একটু দুর্বলতা ছিল, সেটা তোমার ভোগ-ভীতু অন্তর; জীবনকে ঠিক যোদ্ধার দৃষ্টিতে তুমি দেখতে পারনি।

ইলা নিঃশব্দে মাথা নোয়ালো—কথাটা নিষ্ঠুর সত্য। এই সত্যটার জন্যই ইলা আজ এত বড় ধনীর গৃহিনী—। বলল, —তার জন্য আজ লজ্জা হয় শঙ্করদা—।

—লজ্জাটা অকারণ ইলা, মানুষ তার মনের যেখানে যতটুকু দুর্বল বা সবল তার ততটুকু প্রকাশ তার জীবনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে আজ হয়ত আশা করতে পারি, তোমার সেই ভোগতৃষ্ণা মিটে গেছে—এখন চাও ত্যাগীর জীবন।

—ঠিক ত্যাগীর জীবন আজ চাইতে পারছি নে শঙ্করদা,

ভবে কর্মীর জীবন আজ আমার একান্ত দরকার—কর্মসাধনার মধ্যে যদি ত্যাগ-সাধনা অভ্যস্ত হয়।

—নিষ্কাম কর্মই ত্যাগ শেখায়। বেশ, নন্দিতার কর্মক্ষেত্রেই যোগ দাও।

ইলা একটুখানি চুপ করে রইল, তারপর শঙ্করের পায়ে হাত রেখে বলল—সেদিন তোমাকে যেভাবে চেয়েছিলাম, আজ তার চেয়ে বড়ো করে পেলাম শঙ্করদা, গুরু রূপে। তোমার ত্যাগ-সাধনায় আমাকে দীক্ষিত কর।

ইলা চলে গেল।

পরদিন মধ্যাহ্নভোজনের আগে নন্দিতা ছাড়লো না ইলাকে। অরুন্ধতীর ইচ্ছা ছিল দিন কয়েক থাকবার, কিন্তু তার পড়া কামাই হবার ভয়ে ইলা ওকে সঙ্গেই নিয়ে এলো ফিরিয়ে—মন তাই ভালো নেই অরুন্ধতীর। তবে ইলা কথা দিয়েছে যে আগামী বড়দিনের ছুটিতে ওকে আবার নিয়ে যাবে ওখানে এবং সাতদিন পুরা থাকতে দেবে।

বাড়ি এসে ইলা শুনলো, অনুভা সকালেই মামার বাড়ি চলে গেছে; আশ্চর্য হোল সে—মামার বাড়িতে অনুভা দুঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতে পারে না। সেইখানে সে আছে সারাদিন! মামার বাড়ির নাম করে অন্য কোথাও—মেঘনাদের সঙ্গে কোনো দুর যায়গায় বেড়াতে যায় নি তো! কাপড় না ছেড়েই সে ফোন করলো। গায়ত্রী বললো;

—অনু এখানেই আছে পিসিমা—সন্ধ্যার সময় যাবে।

আর যদি উনি রাজি হন তো সিনেমা দেখার পর আমরা গিয়ে দিয়ে আসবো ওকে।

উনি অর্থে ডাক্তার, গায়ত্রীর স্বামী। সময় না পাওয়ায়, বেচারা সিনেমা ইত্যাদি বিশেষ দেখতে পায় না; অনুভাই মাঝে মাঝে তাকে টেনে বের করে। ইলা খুশি হয়ে বলল, —বেশ মা, থাক তা'হলে।

চাকর এসে জানালো যে স্যার গুপ্তর বাড়ি থেকে তিন বার ফোন করেছিল 'মিসিবাবার' জন্য, কিন্তু মিসিবাবার আদেশমত সেখানকার ঠিকানা বা ফোন নম্বর ওঁদের জানানো হয় নি—হুজুর ফিরেছেন, এখন যা ভাল বোঝেন, করবেন।

—অনু কি তার ঠিকানা বা ফোন নম্বর জানাতে বারণ করে গেছে?

—জি হ্যাঁ—বলে গেছেন, আমরা যেন বলি যে শ্যামবাজারের বাড়ির নম্বর বা ফোন নম্বর আমরা জানি না।

—আচ্ছা,—যাও!

ইলা চাকরকে বিদায় দিল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হোল। এমন কি ঘটলো, যার জন্য অনুভা লুকোলো গিয়ে তার মামার বাড়িতে, যেখানে যেতেই চায় না সে? মেঘনাদ কি কোনোরকম অসম্মান করেছে তার? বয়স্থা মেয়ে—তাকে অমন করে একলা ছেড়ে যাওয়া উচিত হয় নি ইলার।—ইলা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো অনুভার জন্য। যদিও সে নিরাপদে রয়েছে মামার বাড়িতে, তবু ভেতরে এমন কিছু ঘটেছে, যার জন্য তার এই আত্মগোপন—কি সেটা?

কাপড় ছেড়ে এক কাপ চা খাবে ইলা, অরু এসে বলল,

—ওরা ডাকছেন মা, ফোনে—লেডী গুপ্তা আর তাঁর ছেলে!

—দুজনেই ফোনে ডাকে কেমন করে?—ইলা ভ্রূকুটি করলো।

—প্রথম ছেলে ডাকলেন, বললাম 'মা খুব ক্লান্ত, তা' ছেলের মা তখুনি এসে বললেন—'একবার ডেকে দিতেই হবে।'
—যাও ধর গিয়ে ফোন।

নিজের কাপের চায়ে বেশী করে চিনি মিশিয়ে অরুন্ধতী চুমুক দিতে লাগলো। ইলা উঠে গেল নিরুপায়ের মত। অনুভার ভবিষ্যৎ রয়েছে ওখানে—কাজেই বিশেষ চিন্তিত হয়েই গেল। অনুভা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে; নিশ্চয় এমন কিছু কাজ সে করেনি, যাতে তার ভবিষ্যৎ জীবন গ্লানিযুক্ত হতে পারে,—ইলা ভাবতে ভাবতে ফোন ধরলো।

—কতক্ষণ ফিরলে ইলা? শরীর খুব ক্লান্ত শুনলাম! সেখানে এত তাড়াতাড়ি যাবার কী প্রয়োজন হয়েছিল?

—আনন্দমঠ দেখতে গিয়েছিলাম—ইলা বললো, যদিও সে জানে, লেডী গুপ্তা ঐ আশ্রমের নাম শুনেছেন কিনা, সন্দেহ, তবু বঙ্কিমের আনন্দমঠের কথা নিশ্চয় তিনি শুনে থাকবেন। এই আশাতেই সে 'আশ্রম' না বলে 'আনন্দমঠ' বললো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, লেডী গুপ্তা 'আনন্দমঠ' নামটাও শোনেন নি; বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,

—আনন্দমঠ? সেটা কি বস্তু ভাই? কোনো মেলা? নাকি ঠাকুরবাড়ি, না সন্ন্যাসীদের আড্ডা?

—ওসব কিছু নয়—একটা স্কুলগোছের প্রতিষ্ঠান—মেয়েদিগকে নানা রকম কাজ, লেখাপড়া ইত্যাদি সেখানে শেখানো হয়—তার সঙ্গে সমাজনৈতিক আর জাতিগঠনমূলক কাজ!

—ও, আই সি! তাহলে তো ভা...ই জিনিস। কোথায় সেটা? কতদূর কলকাতা থেকে?

—শ' খানেক মাইল হবে—মোটরেই যাওয়া যায়—যাবেন একদিন দেখতে?

—হ্যাঁ—সানন্দে—তবে সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটা আমন্ত্রণ......।

—সেতো নিশ্চয়ই। তাঁরা সাদরে আমন্ত্রণ করবেন। কাজটা ভালোই হচ্ছে, বর্তমান যুগের উপযোগী কাজ। মেয়েদেরকে সমাজ-গঠনের যোগ্য করে তুললেই সমাজ আপনি গড়ে উঠবে; জাতি বা সমাজ গঠনের মূলে নারী—এই তাদের মত—আর আমরাও মত।

—আমরাও।—বললেন লেডী গুপ্তা সজোরে, সুদৃঢ় কণ্ঠে; ফোনের যন্ত্রটা পর্যন্ত শিউরে উঠলো গলার জোরালো আওয়াজে!

কথাটার মধ্যে যে সত্য আছে, তা যেন আর একবার ভালো করে জেগে উঠলো ইলার অন্তরে; নিজের মতের উপর অন্যের সমর্থন মানুষের মনকে দৃঢ় করে। ইলার বর্তমান ধনিক জীবন দৃঢ়তাহীন বিলাসীর জীবন, যদিও বিলাস ব্যসন তার নেই; তবু ঐ সমাজে বাস করার এমন একটা মোহকরী

পারিপার্শ্বিক প্রভাব আছে যে বিলাসী না হলেও কিছু বিলাস থাকবেই। ইলার ঠিক সেই অবস্থা এখানে। অথচ ঐ ইলা একদিন মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরকন্নার কাজ অবিরাম করতে পারতো তার পিতৃগৃহে; চটের মত মোটা খদ্দরের কাপড় পরে বৈশাখের দারুণ গরমে গান গাইত হাসিমুখে,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই..." আজ সেই ইলা মিলের মিহি শাড়ি পরতে ভাল করে দেখে, শাড়িটা মিহি কি না।

—অনু কি ফিরেছে?—লেডী গুপ্তা ওপাশ থেকে প্রশ্ন করলেন—কাল বড্ড মাথা ব্যথা নিয়ে গিয়েছিল; খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি ইলা—এ সময় শরীর-টরির খারাপ না করে বসে।

—এখনো ফেরেনি। মাথাব্যথা—ও বিশেষ কিছু নয়। ও ফিরলে আমি ফোন করতে বলবো।

ইলা কাটিয়ে দিল লেডী গুপ্তাকে। অতঃপর 'আচ্ছা, ধন্যবাদ' শোনার পর ইলা তফাত হয়ে গেল লেডীর গুপ্তার বাক্যালাপ থেকে; কিন্তু ভাবতে লাগল, মাথাব্যথার অছিলা করে অনুভা চলে এসেছে কেন? মাথাব্যথাটা যে এখনকার মেয়েদের বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তা জানে ইলা। তবু ওর আভ্যন্তরীন কারণটা ইলাকে জানতে হবে; কারণ, অনুভা চট্ করে কোথাও থেকে চলে আসবার মত মেয়ে নয়। ইলা অপেক্ষা করতে লাগলো অনুভার জন্য।

অনুভা এসে পৌঁছালো আধঘণ্টার মধ্যে; ইলা প্রথমেই প্রশ্ন করলো,

—হঠাৎ মামার বাড়ি গেলি কেন অনু ?—সে জানে অনু ওখানে যেতে ভালবাসে না।

—গেলাম ; অনেকদিন যাইনি ! একা বাড়িতে কতক্ষণ টেকা যায় মা !

—লেডী গুপ্তা তোর খবর চাইছেন ; যা ফোন কর।

—থাক গে। উনিই করবেন ফোন—বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল অনু নিজের ঘরে। ইলা বুঝতে পারলো, ব্যাপার এমন কিছু হয়েছে, যাতে মেঘনাদ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আশা বর্তমানে পোষণ করা ঠিক হবে না। কিন্তু বয়স্থা, শিক্ষিত মেয়ে, তাকে ও-ব্যাপার নিয়ে কোনো রকমে বিরক্ত করতে ইলা ইচ্ছা করলো না। নীচে নেমে রান্নার তদারক করতে গেল।

অনু আপনার ঘরে এসে আয়নায় মুখখানা দেখলে একবার। এটা ওর অভ্যাস ; তারপর কৌচে শুয়ে পড়লে চোখ বুজে। অরুন্ধতী এসে ঢুকলো—ঘরে দিদি ? ওরে বাপ, সকাল বেলা ঘুমুচ্ছ নাকি ?

—না। কেমন কি দেখলি ওখানে ?—অনু চোখ না খুলেই শুধুলো।

—বলতেই তো এলাম ভাই—তা' তুমি দেখছি ক্লান্ত শ্রান্ত-উদ্‌ভ্রান্ত পান্থ। তোমাকে এখন 'জ্বালান্ত' (জ্বালাতন করা কি ঠিক হবে ?

—এরকম কথা কোথায় শিখে এলি রে !—অনু হেসে মাথা তুলে বললো।

—ওখানেই—যা একখানা দাদা পেয়েছি—জানো দিদি

তুমি তো দেখ নাই ; একেবারে 'অতলান্তর মতন গভীর' অন্ড মোহান্তর মতন—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ !

—যাঃ, ফাজিল কোথাকার ! দাদা আবার কে হোল তোর ?

—কেন ! নন্দিতা মাসিমার ছেলে !

—তিনি তো শুনেছি, জেলে !

—এসেছেন। আমরা যখন যাচ্ছি মোটরে, তখনি উনি নামলেন ট্রেন থেকে, আর······

—দেখতে কেমন ?

—দেখতে ? সে তুমি দেখেই বুঝবে ভাই ; কাঞ্চনজঙ্ঘাও বলতে পার, আবার স্বর্গ-গঙ্গাও বলতে পার—তবে রঙ-চঙা নয়।

—কেন ! কালো ?

—কালো হলে তো একটা রঙ হোত দিদি—হাসলো অরুন্ধতী—কালোও তো রঙ।

—বিজ্ঞানে বলে, কালো রঙটা রঙ নয়—পড়ছিস্-কি !

—ওরে বাপ্ ! কালো রঙ রঙই নয়—অন্ধকার ! তাহলে আমাদের মতন কালো মেয়েরা কি দিদি ?

অনুভার উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের দিকে তাকালো অরু, কিন্তু অনুভা কড়া প্রশ্ন করলো,

—কত বয়েস হবে তাঁর ?

—তা জানি না, বিশও হতে পারে, বত্রিশও হতে পারে—তবে বিয়াল্লিশ নয় ; যা লম্বা গড়ন, যেন পাহাড়—জেলের খাটুনি তাঁর কিচ্ছু করতে পারে নি !

—জেলে ওদের কিছু খাটায় না—খুব আদর করে রাখে জামাইয়ের মত !

—তুমি জান কচু ! উনি তো মেঘনাদ গুপ্তের মতন প্রথম শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন না। উনি ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে। সে খাটুনী আর অত্যাচারের কাহিনী শুনলে চমকে যাবে তুমি।

—তুই শুনলি নাকি ?

—শুনলাম—শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল কি জানো দিদি, "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে—" মনে হচ্ছিল, "ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ-কারা, আঘাতে আঘাত কর—" মনে হচ্ছিল...

—থাম ; তোর কি মনে হচ্ছিল, জানবার দরকার নেই আমার—তিনি এখন কি করবেন ?

—আবার জেলে যাবেন ; তার জন্যে তৈরি হয়েই আছেন ! যতক্ষণ জেলে না যেতে পারেন, ততক্ষণ স্বাধীনতার আন্দোলন চালাবেন—মামাবাবুকে সাহায্য করবেন নির্বাচনে দাঁড়াতে—আর ওঁর মায়ের যে আশ্রম আছে, 'আনন্দমঠ' সেটা ভালভাবে চালাবেন।

—আনন্দমঠ ? সেখানে আবার কি হয় ? আমি একদিনও যাই নি। তুই গিয়েছিলি ?

—হ্যাঁ ! সেখানকার মেয়েরাই তো ওঁকে অভ্যর্থনা করলো শাঁখ বাজিয়ে আর বন্দেমাতরম্ গেয়ে। তোমাদের এখানকার মত অবশ্য আঙুল কেটে রক্ত কেউ দেয়নি।

অনুভা কাটা আঙুলটার পানে একবার তাকালো। জুড়ে গেলেও ছুরির দাগটা এখনো রয়েছে তার লতানো আঙুলে।

—রক্ত দিল না কেন? দেওয়াই তো উচিত।—অনুভা সগর্বে বললো।

—আমি শুধিয়েছিলাম।

—কাকে? ওঁকেই?

—না—একটা মেয়েকে, তা' সে বললে, রক্ত ওঁকে দেবার তো দরকার নেই; ওটা অপব্যয়। রক্ত দিতে হবে দেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞে—ওঁকে দিয়ে অনর্থক একফোঁটা রক্তই বা নষ্ট করি কেন? রক্ত শক্তি, রক্ত বীর্য, রক্তই স্বাধীনতা লাভের মহাস্ত্র!

—কে সে মেয়েটা? কি নাম?

—পাঞ্চালী! ঐ আশ্রমেরই মেয়ে। চমৎকার মেয়ে, অবশ্য রঙটা কালো, অন্ধকার।

—আর তিনি বুঝি তপ্ত কাঞ্চন?

—তা' বলতে পার; ঐ শব্দটা আমার মনে ছিল না, বাংলায় বরাবর কম নম্বর পাই।

—তা' তুই তাঁকে দাদা বলে খুব ভাব করে নিয়েছিস তো?

—হ্যাঁ—ভাব করতে কিচ্ছু সময় লাগে না; দেখলেই ভাল লাগে কিনা, তাই ভাবও খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়—দেখবে, তোমায় সঙ্গেও হয়ে যাবে।

—আমার দরকার নেই তাঁর সঙ্গে ভাবে! অগাস্টের বিপ্লবী, ওরা তো গুণ্ডা!

—দিদি—অরুন্ধতীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো দিদির উপর।

তারপরই করুণ—মলিন হয়ে গেল মুখখানা, কিন্তু অত্যন্ত ঝাঁঝালো গলায় বললো সে,

—তোমার মত মেয়ের কাছে ওঁর কথা বলতে আসা ভুল হয়েছে দিদি, বুঝলে! প্যাঁচায় কি বুঝবে সূর্যের আলোর কত তেজ! থাক্—চলে গেল অরু সবেগে।

—অরু, ওরে ঠাট্টা করছি আমি—অরু!

অরু চলে গেছে। আর এলো না। এল ইলা, বললো,

—ফোন্ করলি না ওখানে?

—না। অনর্থক পাঁচ আনা পয়সা খরচের কি দরকার! ফোন করতে চার্জ লাগে।

—কিছু কি হয়েছে অনু? মেঘনাদ বা তার মা'র কোন ব্যবহারে কি খারাপ কিছু হয়েছে?

—না মা—ওঁরা খুব ভদ্র! কিন্তু ভদ্রতাটাই মানুষের স্বাভাবিক জীবন নয় মা, মানুষ মাঝে মাঝে অভদ্র হবে, আরণ্যক হবে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ-জীব হবে।

অনুভার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্লান্ত, ইলা লক্ষ্য করলো। বিস্মিত হয়ে বলল,

—মানুষ মূলতঃ আরণ্যক আর অসভ্য, কিন্তু সভ্যসমাজে তাকে ভদ্রতা রক্ষা করতেই হয়।

—হয়, কিন্তু মা, ভদ্রতার অতিরিক্ত ডিমনস্ট্রেশন—মানে, শো, মানে—প্রদর্শন, ওটা কৃত্রিম! তা যাক্, তুমি ভেবো না, ওদের সঙ্গে কোনো খারাপ কিছু ঘটেনি আমার। ওঁর ছেলে

মেঘনাদ গুপ্তকে আমি পছন্দও করি না, অপছন্দও করি না। তিনি আছেন, থাকুন।

অনুভা আস্তে উঠে বাথরুমের দিকে এগুলো; ভাববার ঐটাই ভালো জায়গা, কিন্তু দরজার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে শুধুলো,

—শুনলাম, নন্দিতা মাসিমার ছেলে নাকি ফিরেছেন জেল থেকে। সত্যি মা?

—হ্যাঁ। আসবে এখানে শিগ্রি একদিন।

—ছেলেটা নাকি খুব ভালো? অরু বলছিল।

—তা হতে পারে; ওর হয় তো ভালো লেগেছে।—ইলা জবাবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

—তোমার ভালো লাগেনি?—অনু এক পা এগিয়ে এলো প্রশ্নের সঙ্গে।

—ভালো লাগা ব্যাপারটা মানুষের মনের সুরের অব্যক্ত ধ্বনি অনু,—কার কাকে ঠিক ভালো লাগে, তা সেই জানে; অপরের তাকে ভালো না লাগতে পারে। যা কাপড় ছাড়।

ইলা চলে গেল; অনুভা বেশ বুঝতে পারলো, মা কথাটার ঠিকমত জবাব দিল না। কেন? কুমারী মেয়ের কাছে ভাল ছেলের গুণগান করা তো মা'র উচিত। কিন্তু অনুভার মনে পড়লো—তার মা'র মনে একটি মাত্র লোকের সম্বন্ধেই আগ্রহ জেগে থাকে চিরদিন—তিনি শঙ্করমামা। তারপর আর যে-কেউ, মা তাঁর সম্বন্ধে ভালোমন্দ কিছুই বলে না। মা'র এই মানসিকতা বিচিত্র।

সমস্ত দেশ জুড়ে তখন স্বাধীনতার আন্দোলন এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, ইংরাজ-সরকার আর সামলাতে পারছেন না। আজাদ-হিন্দ বাহিনী যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, তার ধাক্কা সামলাবার আগেই নৌ-বিদ্রোহ লাগলো। ইংরেজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্—বুঝতে পারলো, ভারতকে কিছু না দিলে আর ভারতে থাকা সম্ভব হবে না। তারা নানা প্রস্তাব পাঠাতে লাগলো, যার মূলে রইলো বিভেদ আর বিদ্বেষ জাগাবার গুপ্ত ষড়যন্ত্র। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতের বৃহৎ নেতৃত্ব তখন পরিচালিত—মহাত্মাজীর প্রভাব ভারত-গণমনে তখন এতো বেশী যে কংগ্রেসকে কোনোরকমেই পরাহত করা সম্ভব নয়; কিন্তু ইংরাজের কূটনীতি দ্বিজাতি-তত্ত্বের তলোয়ার এমন করে চালিয়ে দিল যে সারা ভারতে বিভেদ-বিদ্বেষের বহ্নিশিখা জ্বলবার আর বেশী দেরী নাই—এমনই অবস্থা। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

কিন্তু এসব ইতিহাসের কথা;—উমাশঙ্কর স্বদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করছিলেন। মন্বন্তরে বিস্তর মানুষ মরেছে—কিন্তু মন্বন্তর শেষ হয় নি আজো। চালে-ডালে কণ্ট্রোল—কাপড় অভাবে দেশবাসী উলঙ্গপ্রায়—মানুষ মরছে না-খেয়ে, কিন্তু প্রচার করা হয় অন্য রকম। নেতাদের মধ্যে [illegible]র মতভেদ, আর তারই সুযোগ নিয়ে ধনিক-শ্রমিক মিলে দেশটাকে অধঃপাতের পথে টেনে আনছে। সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করেছে যারা—তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করাও চলে না, এমন অবস্থা। সংস্কৃতি লুপ্তপ্রায়—গঠনকার্য স্থগিত—সবাই বলছে, স্বাধীনতা না এলে কিছু হবে না।

আনন্দমঠের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—উদয়ন খাতাপত্র দেখে একদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো। মা'র এত আদরের আশ্রম—এবং আজন্ম মানব-সেবাব্রতী মামার অন্তরের আদর্শে গড়া এই আশ্রম, অর্থাভাবে নষ্ট হয়ে যাবে—এটা চায় না উদয়ন। বাইরে থেকে অবশ্য আশ্রমের আর্থিক অবস্থার কথা বুঝবার উপায় নাই—নন্দিতা বাইরের ঠাট্ ঠিকই বজায় রেখেছে, কিন্তু ভেতরের অবস্থা খুবই খারাপ—এমন কি আজ চার-পাঁচ মাস শিক্ষয়িত্রীরা বেতন পান নি। কাজটা সেবামূলক এবং এঁরা সকলেই কিছু-কিঞ্চিৎ ত্যাগশীলা নারী, তাই মুখ বুজে আজো রয়েছেন।

খাতাপত্র দেখা শেষ করে একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে উদয়ন মামার কক্ষে প্রবেশ করলো, রাত তখন এগারোটা। উমাশঙ্কর নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন, তার জন্যও কিছু খরচ আছে। আশার কথা এই যে, এখানের সকলেই শঙ্করের উপর শ্রদ্ধাশীল, সেইজন্য ভোট তাঁকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে হবে না। তার উপর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে কংগ্রেস আজ অবাধে নির্বাচন-বৈতরণী পার হয়ে যাবে। তবু কিছু খরচ আছে। ওদিকে হাজার কয়েক টাকা আশ্রমের জন্য অবিলম্বে দরকার। উদয়ন মামার ঘরে ঢুকে দেখলো, শঙ্কর ভোটারের তালিকা নিয়ে নিবিষ্ট।

—একটা কথা বলছিলাম মামা,—আশ্রমটা হয়তো আর চালানো যাবে না।

—কেন?—শঙ্কর বিস্মিত হয়ে তাকালেন উদয়নের পানে।

—টাকা নেই—আশ্রম দায়গ্রস্ত ; শিক্ষয়িত্রীরা বেতন পাচ্ছেন না।

—আমি জানি—শঙ্কর ধীরে বললেন—কিন্তু টাকার অভাবে কোন ভাল কাজ, কোনো বড় কাজ নিশ্চয় আটকাতে পারে না উদয়ন ;—মানুষের মনে ভগবান যে বদান্যতার বৃত্তি দিয়েছেন—এই বৈজ্ঞানিক বর্বরতার যুগেও তা' অনুশীলিত হচ্ছে।

—বৈজ্ঞানিক বর্বরতা—উদয়ন মামার কথাটায় যেন আহত হোল।

—হাঁ—হিরোসীমা, নাগাসাকীর নৃশংস কলঙ্ক বৈজ্ঞানিক বর্বরতার চরম।

—কিন্তু বৈজ্ঞানিক তার জন্য দায়ী নন, মামা, দায়ী পৃথিবীর ক্ষমতালোভী রাজশক্তি—দায়ী বর্তমান যুগের ধ্বংসশীল মনোবৃত্তি।

—তুমি ভুলে যাচ্ছ উদয়ন, বর্তমান যুগের বাস্তববাদী মনকে গঠন করেছে বিজ্ঞান ; স্নেহ-দয়া-মায়ার কোমল বৃত্তির অস্তিত্বকে বিজ্ঞান তার বিশ্লেষণের ছুরিতে এমন করে কেটেছে যে জোড়া দিলেও আর বেদাগ করা যায় না। আজকার মানুষের যুদ্ধলিপ্সা, সাম্রাজ্য-স্থাপন, ক্ষমতাবিস্তার বা প্রভুত্বপ্রিয়তা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক হিসাবের বর্বরতা, মানবাত্মাকে অগ্রাহ্য করার বর্বরতা, কিন্তু মানবত্ব প্রাকৃতিক, তাকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়—আবার সেটার পুনরভ্যুদয় হবেই-হবে। এই ভারতেরই কটিবাস পরিহিত মহামানব তার প্রমাণ। কিন্তু যাক্—আশ্রমের অর্থাভাবের কথা আমি জানি ; তোমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এবং তোমাকেই সেকাজ করতে হবে।

—কি ভাবে ?—উদয়ন শুধুলো।

—'ভিক্ষা' কথাটা আমি উচ্চারণ করবো না—মানুষের দাক্ষিণ্যের তহবিল থেকে।

উদয়ন চুপ করে রইল। রাত বাড়ছে ক্রমশ। এখনো ওদের খাওয়া হয়নি। নন্দিতা ডাকতে এল খাবার জন্য; শঙ্কর তাকে কাছে আসতে বললেন।

—তোর আশ্রমের জন্য টাকার দরকার, নন্দিতা—ত্'এক-দিনের মধ্যেই তোকে টাকার জন্য বেরুতে হবে দেশের বদান্য জনসাধারণের কাছে। আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে সঙ্গে নিবি, উদয়নও যাবে সঙ্গে।

—দেশের লোক আর ক'টাকা দিতে পারে দাদা ? এই যে মহাত্মাজি আসছেন, তাঁর হাতে তোড়া দেবার জন্য ত্রিশহাজার টাকা এর মধ্যে উঠেছে, আরো উঠাতে হবে। গরীব দেশ, তার উপর কত চাপ দেওয়া যায়……নন্দিতার কণ্ঠ ম্লান, করুণ।

—গরীবরা ওসব টাকা দিচ্ছে না নন্দিতা, ওসব টাকা দেয় ধনী মহাজন, সুযোগ-সন্ধানী ব্যাবসাদার। কিন্তু ওসব কথায় অনেক অপ্রিয়-প্রসঙ্গ এসে পড়ে, যাক। আমি তোকে আমাদের মত দীন দরিদ্রের কাছে যেতে বলছি, যারা নিজের ঘরের রান্নার ক্ষুদ থেকে একমুঠো ভিক্ষে আজো দেয়—ফেরায় না। দানের রাজা এই দেশ; সর্বস্ব দিয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানের চণ্ডাল হয়েছিলেন; আপন দেহাস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করে দেন দধিচী; নিজের মাংস দিয়ে পারাবতের প্রাণ রক্ষা করেছেন শিবিরাজ। মানবত্বের মহত্তম আদর্শ হোল প্রেম—তার প্রধানতম অনুশীলন

ত্যাগ ; দান .এদেশের অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত নরনারী আজও সে-বৃত্তির অনুশীলন করে চলেছে···

—বাবুজি—বাবু—বাবুজী,—কে অতি আস্তে অথচ স্পষ্ট স্বরে ডাকছে বাইরে।

—কে? দেখতো উদয়ন!

উদয়ন উঠে বাইরে এসে দেখলো, জনৈক মহাজন। হয়তো পাওনাদার। উদয়ন এতরাত্রে তাকে দেখে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে শুধুলো,

—কাকে চান আপনি?

—শঙ্কর জিকে। আপ্ খবর দিজিয়ে, মেরা কাম্ বহুৎ জরুরী হ্যায়, আউর 'প্রাইভেট'।

—আসুন।—উদয়ন তাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এল।

—রাম-রাম! বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো লোকটি ; আড়ালে গেল নন্দিতা।

—আসুন। আপনাকে তো চিনতে পারছি না শেঠজি! শঙ্কর বললেন।

—হামি চিনে আপনাকে। বাবুজি, হামি মক্কার লাল··· বাংলামে আছে বিশ বরষ!

—ও আচ্ছা ; আমি কি করতে পারি আপনার জন্য? শঙ্কর শুধুলেন।

—হামি কুছ রূপেয়া দেবে ওহি তহবিলমে, পাঁচ হাজার,—নেহি, দশ হাজার······

—খুব তো ভাল কথা, তার জন্য এত রাত্রে গোপনে

আসবার কি দরকার শেঠজি? টাকাটা কি আমারই হাতে দিতে চান?

—জি, হ্যাঁ—আউর একঠো বাত্ আছে; আপ্ তো জরুর মেম্বারমে আ-যায়েঙ্গে, ওহি যো কণ্ট্রাক্ট দেনে মাংতা গভর্নমেণ্ট, আউর ডিশ্‌পোজাল কো মাল—শেঠজি উদয়নের পানে সন্দেহ দৃষ্টিতে তাকালো একবার। শঙ্কর বললেন,

—ও আমার ভাগ্নে; আপনি বলুন আপনার কথাটা। শেঠজি অত্যন্ত নীচু গলায় বলতে লাগলো,

—আপিকো হাতমে হ্যায়—ওহি পাণ্ডবেশ্বরমে যো মালউল সব নিলাম হোগা না—ওস্‌মে তুচারঠো ব্লক হামকো করা দিজিয়ে, উস্‌বাস্তে এহি……এক গোছা নোট রাখলো শেঠজি শঙ্করের সামনে।

করকরে নোট—সত্ত ছাপা—জলরং কলাগাছগুলো বেশ দেখা যাচ্ছে রাত্রের আলোতে—শঙ্কর তাকিয়ে রইলেন নোটের পানে।

—আভি একহাজার দেতা হায়, কাম্ হো যানেসে…

—থাক,—শেঠজি, এরকম কোনো কাজ করি না আমি—শঙ্কর চোখে হাত দিলেন নিজের—না—আর কোনো কথা বলবেন না, নোট তুলে নেন্।

—হামি জানে বাবুজি—বহুৎ কাপড়া হ্যায় উস্‌মে, আউর চাউলভি বহুৎ…

—থামুন শেঠজি—শঙ্কর যেন ধমক দিলেন; নোটগুলো নিজে না ছুঁয়ে উদয়নকে আদেশ করলেন—ওঁকে যেতে বলো উদয়ন—

শঙ্কর নিজেই উঠে চলে গেলেন ভেতরে। খাবার দি
বললেন নন্দিতাকে।

—ইসমে খারাপ কা?—শেঠজি বললো উদয়নকে—আ
জেরা মেহেরবানী করকে উন্‌কো বলিয়ে বাবুসাব্‌—উন্‌হিঁ
হাতমে ওহি চিজ রাখা হুয়া হ্যায়।

—না শেঠজি—ও জিনিস পাবার যদি আপনার যোগ্য
থাকে, তাহলে এমনি পাবেন, টাকা ঘুষ দিতে হবে না—আচ্ছ
আজ আসুন।

শঙ্করের মতই উদয়ন নমস্কার জানালো শেঠজিকে। হতভ
শেঠজি তবু বসে রয়েছে; উদয়ন বললো,

—রাত হচ্ছে শেঠজি, বাড়ি যান।

—হাম ফিন আয়েঙ্গে কাল-পরশু—নিতান্ত অনিচ্ছায় শেঠজি
উঠলো। যাবার সময় আবার বলে গেল উদয়নকে,

—আপ্‌ জেরা মেহেরবানী কি-জিয়ে, বলিয়ে শঙ্করজিকো…

ও বেরুবা মাত্র উদয়ন দরজাটা বন্ধ করে দিল। কি
ভাবতে লাগলো উদয়ন। এখনো দেশ পরাধীন। অতি সামান্য
মাত্র সূচনা দেখা দিয়াছে স্বাধীনতার, যাতে বোঝা যায়, দেশের
বৃহৎ নেতৃত্ব কিছু হয়তো পাবে; এরই মধ্যে ঘুষ চালাবার চেষ্ট
—আশ্চর্য!

উদয়ন ভেতরে এসে খেতে বসলো মামার পাশে। শঙ্ক
বললেন,

—এখন আর হয়তো তোদের জেলে যেতে হবে না কিছুদিন

এর মধ্যে আশ্রমটাকে স্বয়ং-পরিচালিত হবার মত করে তুলতে হবে।

—স্বাধীন দেশ হলে, এসব আশ্রমের জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ—কিন্তু স্বাধীন যখন নই আমরা, তখন ও আশা না করাই ভালো।

—একটা চ্যারিটি-শো করবো দাদা? আশ্রমের মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার বা…

—না। শঙ্করের কণ্ঠস্বর দৃঢ়—চ্যারিটি-শোর ফাঁকিতে মানুষের মনকে অনর্থক বিষাক্ত করার চেয়ে ভিক্ষা করা ভালো—তাতে, যে ভিক্ষা দেয়, সে বোঝে যে ভিক্ষাই দিল। চ্যারিটি-শো প্রতারণার ভদ্র পর্যায়।

—কিন্তু বড় বড় ব্যাপারে চ্যারেটি-শো করে মোটা টাকা তোলা হয় মামা—

—বড় ব্যাপারের বড় কথা উদয়ন—শঙ্কর বললেন—মস্ত বড় কাঁঠালের থেকে ছোট ল্যাংড়া আম নিশ্চয় খেতে ভাল। তা ছাড়া, বড়ত্ব—বৃহৎ হওয়াই মানুষের আদর্শ নয়; মহৎ হওয়াই তার আদর্শ—বড় আর মহৎএ এই তফাৎ। চ্যারিটি-শোর থিয়েটার দেখে যারা টাকা দিয়ে গেল, তারা বুঝলো,—আনন্দ পেলাম, তার মূল্য দিয়েছি। কিন্তু অন্ধের হাতে তুমি যে পয়সাটা দিলে, তার উদ্দেশ্য মহৎ; তাতে তোমার মনের দয়াবৃত্তি অনুশীলিত হয়। অন্ধ তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়ে তোমার অন্তরের সেই মহৎ বৃত্তিকে অনুশীলন করতে সাহায্য

করে; সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হোক আর নাই হোক—
—তোমারই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তার কাছে।

—সে তো নিশ্চয়, কিন্তু দাতারা কি অত ভাবে মামা? বরং দানের জন্য তাদের অহঙ্কার হয়।

—সেই জন্যই তো তোমাদের যেতে হবে দান গ্রহণ করতে! দাতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে, দান করার জন্য তার আত্মার উন্নতি কেমন করে হতে পারে, তার মানববৃত্তি কেমন করে পরিস্ফুট হতে পারে। মনে রেখো উদয়ন—আশ্রমের ঐ কয়েকটা প্রাণীই তোমার গঠনমূলক কাজের কল্যাণভাগী নয়—ঐ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত সারা ভারতের, সারা পৃথিবীর মানব-সম্প্রদায়. সে কল্যাণের অংশীদার। মানুষকে মহৎ করবার কাজের এই পরিকল্পনা আজ বটবৃক্ষের বীজের মত ক্ষুদ্র—কিন্তু বীজটা বটগাছের। একথা ভুললে চলবে না যে আমাদের প্রত্যেকটি কাজে সেই আদর্শ রক্ষিত হওয়া উচিত।

উদয়ন আর কথা বললো না। নন্দিতা বলল যে আগামী পরশুই তাহলে বেরিয়ে পড়া যাবে আবেদন নিয়ে। কিন্তু শঙ্কর বললেন—উদয়ন পরশু কলকাতা যাবে একবার, একদিনের জন্য—যদি ওর খুশি হয় তো ইলার ওখানেই উঠবে গিয়ে। ইলা নিমন্ত্রণ করে গেছে। কলকাতার কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করতে হবে তাকে, তাঁরা ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং ওঁদের শ্রেষ্ঠতম শীঘ্রই এদেশে আসছেন; তাঁর অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনটাও করতে হবে। অতএব আগামী পরশু যাওয়া চলে না। আশ্রম অর্থ-সঙ্কটে রয়েছে, আরো একটা মাস থাক

—খাবার চাল যদি ফুরিয়ে যায় তো, বাড়িতে যে চাল আছে নিজেদের খাবার জন্য, তাই এখন দিয়ে দেওয়া হোক—পরে বাড়ির জন্য কিনে নেওয়া হবে।

—দেশে চাল ফুরিয়ে গেছে দাদা—পরে কিনতেও পাওয়া যাবে না।

—তুমি কি মনে কর নন্দিতা, যে চাল কিনে ঘরে জমিয়ে তুমি ভাই আর ছেলেকে নিয়ে খাবে আর দেশের লোক উপবাস দেবে ?—শঙ্করের কণ্ঠকঠোর—চাল যদি নাই পাওয়া যায় তাহলে বহু লোকের সঙ্গে তুমিও উপবাস দেবে।

—চাল আছে, তবে কালো-বাজারে—তার দাম দিতে আমরা অক্ষম হব।

—অনেক লোকই হচ্ছে অক্ষম। তার উপায় করবেন সরকার, অবশ্য জাতীয় সরকার। কিন্তু তা'বলে তুমি চাল জমিয়ে অপরের অসুবিধা করতে পার না।

উদয়ন চুপ করে রইল। মামার কথার উপর কখনো কথা বলে না সে। শঙ্কর উঠে হাত ধুলেন, তারপর শুয়ে পড়লেন। উদয়ন অনেকক্ষণ জেগে 'যোগবাশিষ্ট' পড়লো।

পাঞ্চালী সেদিন আশ্রমে ফিরে গেল নন্দিতার সঙ্গে—ইলাও ছিল। সারাপথ সে কোন কথা কারো সঙ্গে বলেনি; কেন বলেনি, সেকথা সে নিজেও জানে না। অবশ্য ইলা আর নন্দিতা নিজেদের মধ্যেই বিস্তর কথা বলছিল—পাঞ্চালীর কথা

বলার অবসরও বিশেষ ছিল না,—তবু পাঞ্চালী দু'একটা কথা বলতে পারতো—বলেনি।

আশ্রমে ফিরেই নিজেদের ঘরে ঢুকে গেল পাঞ্চালী। শুয়ে পড়লো ওর নিতান্ত সাধারণ বিছানাটায়। মনের কোন্‌খানটায় যেন কি একটা বিষ-কাঁটা ফুটে গেছে ওর। কিন্তু কোথায়? কিসের কাঁটা? কি ভাবে ফুটলো? পাঞ্চালী টের পায় না। এ যেন অতি সূক্ষ্ম ফনিমনসার কাঁটা—রাস্তা দিয়ে চলবার সময় হাওয়ায় উড়ে এসে গায় বেঁধে; কোথায় বিঁধলো, তখনই টের পাওয়া যায় না—দু'একদিন পরে জ্বালা হয়, ফুলে ওঠে গা'—পেকে ওঠে স্ফোটক।—পাঞ্চালীর বুকে সেই ফনিমনসার কাঁটা লেগেছে।

নিশ্চুপ পড়ে রইল পাঞ্চালী অনেকক্ষণ; হাত-পাগুলো পর্যন্ত নাড়তে ওর ইচ্ছে করছে না। কি যে ও ভাবছে, তা ওই জানে। হয়তো ভাবনার সূত্রগুলো ওর গ্রন্থীবদ্ধ নয়—এলোমেলো—উচ্ছৃঙ্খল্।—দরজা ঠেলে বুড়ি ঝি প্রবেশ করলো; বললো,

—খেতে এসো দিদিমণি—সবারই খাওয়া হয়ে গেল যে!—

—খাবো না; আজ বিকেলে অনেক খেয়েছি বাইরে। মাসীমাকে বলো গে, খাবো না।

ঝি চলে গেল; বাঁচলো যেন পাঞ্চালী। উঠে দরজায় খিল দিল—তারপর টিনের বাক্‌সটা খুলে কয়েকখানা কাপড়-জামার তলা থেকে বার করলো একটা এল্‌বাম।—ছবিতে ভর্তি এলবামখানা। পাঞ্চালী পাতা উল্টে উল্টে এল্‌বামটা দেখতে

লাগলো। অনেকগুলো পাতা উল্টাবার পর আবার গোড়াকার পাতাটা খুললো পাঞ্চালী, একখানি মাত্র বড় ফটো সেই পাতায় —পাঞ্চালী নির্ণিমেষ চোখে দেখতে লাগলো ছবিটি।

কতক্ষণ দেখছিল, ঠিক নেই—ছবিটা দেখার চেয়ে ওর মন যেন আরো দূরের কিছু দেখছে—এমনি মনে হয়। দু'গাল বেয়ে ওর জলধারা, কাজেই ছবি ও নিশ্চয় দেখছে না। 'চোখের জল কয়েক ফোঁটাই পড়েছে ফটোর উপর। পাঞ্চালী সেটা দেখতে পেয়েই চমকে উঠলো। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিল ছবিখানা —এল্‌বামটা মুড়ে আবার রেখে দিল বাক্সে; কুঁজোর জলে চোখ-মুখ ধুলো—তারপর শুলো আলো নিবিয়ে।—ঘুম যেন আসতেই চায় না; বারবার মনের পটে একখানা সুন্দর মুখ ফুটে উঠছে। ছিঃ ছিঃ! পাঞ্চালীর এতোটুকু দৃঢ়তা নেই? এর থেকে পাঞ্চালীর মরে যাওয়া উচিত ছিল। না—পাঞ্চালী ওসব ভাববে না। চোখের পাতাকে জোরে বুজিয়ে পাঞ্চালী বালিশে মাথা গুঁজলো। ঘুমুতেই হবে, যেমন করেই হোক ঘুমুতে হবে ওকে।

ঘুমুচ্ছে—নিজের মনেই ভাবতে লাগলো পাঞ্চালী—ও ঘুমিয়ে গেছে। নিশ্চয় ও ঘুমিয়ে গেছে। হাত-পা নাড়তে পারছে না—মনটা ঝিম্‌ঝিম করছে—এই তো ঘুমুনো। ঘুম আবার কাকে বলে? বেশ মিষ্টি ঘুম ঘুমুচ্ছে পাঞ্চালী—কার যেন কোলে ওর মাথা। কে যেন কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর। কী সুন্দর হলদে হাত! সোনায় গড়া হাত নাকি? না—সোনা তো শক্ত হয়। এতো কোমল স্পর্শ সোনাতে

থাক্‌বে কি করে? তাহলে হাতটা কিসে গড়া? পাঞ্চালী হাতখানার উপর নিজের হাত রাখলো পরীক্ষা করতে। মোমের মত নয়—সোনার তো নয়ই, তবে কিসের হাত?—মাটির? কাঁচা মাটির—শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে হাতখানা ক্রমশঃ। অসম্ভব শক্ত হয়ে উঠলো—লোহার চেয়ে শক্ত—বজ্রের চেয়ে কঠিন—বীরের মত বিশাল। উর্ধ্ব উর্ধ্বতর লোকে উঠে যাচ্ছে হাতখানা; পাঞ্চালীর ক্ষুদ্র ললাটদেশ অতিক্রম করে; হাতে ধরা বজ্র-বৈজয়ন্তী—বিশ্ব-বিজয়ী নিশান!—কক্কড়—কড়—কড়……

পাঞ্চালী চমকে উঠলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর যেন মনেই পড়ছে না, ও কে, কোথায় ও রয়েছে—কি ভাবছে! তারপরই ঠিক হোল,—ও পাঞ্চালী; আশ্রমের ছোট ঘরটার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছিল—স্বপ্ন দেখছিল।

উঠে বসলো পাঞ্চালী। ভোর রাত্রে বৃষ্টি নেমেছে। বিদ্যুৎ চলছে আকাশে। আকাশে আলো জ্বলে উঠছে অন্ধকারকে ঘনীভূত করবার জন্য। মানুষের মনের উদ্দিপ্ত আশা-বিদ্যুৎ হয়তো তার ভবিষ্যৎ আকাশকে এমনি ঘনীভূত অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে।—ক'টা লোকের জীবনেই বা পূর্ণ হয় আশা!

রাত শেষ হতে দেরী আছে হয়তো; পাঞ্চালী ছোট ঘরের ছোট বিছানায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো জানালাপথে। অবিশ্রাম বৃষ্টি—ঝম্ ঝম্ শব্দ। মাঠ ঘাট ভরে উঠছে জলে—বিদ্যুতের আলোকে সে জল চক্ চক্ করে উঠছে। অজয়ের হয়তো বান আসবে কাল। শুকনো অজয়ের সাদা বালি ডুবিয়ে

গৈরিক স্রোত বয়ে যাবে। সাদা কাশের ফুলগুলো স্রোতের জলে ডুবে ভেসে খেলা করতে থাকবে—জানালা-পথে দেখতে পাবে পাঞ্চালী। আজ রাত্রে অতখানি দেখা যাচ্ছে না। পাঞ্চালী দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো। নাঃ, দেখা যায় না; শুধু নদীর জলের শব্দটা মেঘের গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে। বান এলো নাকি? হয়তো এলো। আসুক গে!

পাঞ্চালী সটান শুয়ে পড়লো। শুকনো নদ-নদীতে বান আসে। ধূসর মরুভূমিতে শস্য-সম্পদ জাগে—দীন-দরিদ্রও ধনী হয়ে ওঠে, কিন্তু…পাঞ্চালী কথাটা ভাবতে গিয়ে থামলো, কিন্তু আবার ভাবলো—সব সম্পদ-হারাও আবার সব সম্পদ ফিরে পেতে পারে—পথের ভিখারীর সিংহাসন লাভ করাও সম্ভব, কিন্তু হিন্দু বালবিধবার শুষ্ক জীবন-নদীতে আর প্লাবন আসে না—নিয়তির বিধান।

নিয়তি!—পাঞ্চালী উত্তেজিত হয়ে উঠলো অকস্মাৎ। নিয়তি কি আবার! মানুষেরই বিধান। মানুষই এই নিয়তিকে নিয়ন্ত্রিত করছে—নিষ্ঠুর করে তুলেছে! কিন্তু এসব কথা ভাবা উচিত হচ্ছে না পাঞ্চালীর।—পাঞ্চালী ব্রাহ্মণ ঘরের বাল-বিধবা কন্যা।—ব্রহ্মচর্যে, নিষ্ঠায়, ত্যাগে বৈধব্যধর্ম তাকে পালন করতেই হবে, এই তার ধর্ম, এই তার স্বভাব, এই স্বাতন্ত্র্য… পাঞ্চালী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লো।

কে জানে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল পাঞ্চালী; দরজায় ঝির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল,

—উঠো দিদিমণি—বেলা হয়েছে যে!

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি উঠে বসলো পাঞ্চালী বিছানায়। মাথাটা ধরে উঠলো। কিন্তু ধরুক মাথা; তার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। বেলা তার কোনোদিনই হয় না। অতি সকালে উঠে সে আশ্রমের কাজ করে—ফুল তোলে, বেদী সাজায়—পূজার ব্যবস্থা করে। আজ বেলা হয়ে গেছে তার, ছিঃ—ছিঃ!

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পাঞ্চালী স্নান করতে গেল। চারিদিকে রোদ উঠে গেছে। রাত্রের ঝড়-বৃষ্টির বিপর্যয়ের চিহ্ন গাছে-পাতায়, শস্যে-শষ্পে—কিন্তু এখন সোনালী সূর্যালোকে ছেয়ে গেছে সারা পৃথিবী—রঙীন ধরনীতে সাতরঙা রশ্মির আলপনা পড়েছে। দুর্যোগ আসে, আবার চলে যায়, কিন্তু হিন্দু বিধবার অন্তরের দুর্যোগ···ধ্যেৎ! কি সব ভাবছে পাঞ্চালী। তাড়াতাড়ি মাথায় জল ঢেলে গা-ভিজিয়ে দিল। শীত্‌ শীত্‌ করছে, বেশ লাগছে। সারা শরীরে কেমন শীতের শিহরণ। গা-মুছতে লাগলো পাঞ্চালী। কোনো রকম আজে-বাজে কথা ও আর ভাববে না। ফুল তুলে পূজো-পাট সেরে পড়তে বসবে।—কাকাকে আজ একখানা চিঠি লেখা দরকার। কুড়ি-পঁচিশ দিন কাকার খবর পায় নি পাঞ্চালী। কে জানে, জেলে কেমন আছে! ছাড়া নিশ্চয় পায় নি—পেলে আসতো পাঞ্চালীকে দেখতে এখানে।—পাঞ্চালী স্নান সেরে বেদীমূলে এল, প্রার্থনা করবে।

উদয়ন দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে। দূর থেকেই দেখেছে পাঞ্চালী। ছোট মাসীমাও রয়েছেন—এবং আরো অনেকগুলি মেয়ে। এত সকালেই উনি কেন এলেন এখানে! এমন কি

রুরী কাজ পড়েছে আজ ?—ভাবতে ভাবতে পাঞ্চালী এগিয়ে ল। ও আসবা মাত্র ছোট মাসীমা বললেন,

—তোর আজ এত দেরী হোল কেন পাঞ্চালী? শরীর গল আছে ?

—হ্যাঁ—মাসীমা, কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি—তাই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পাঞ্চালী প্রার্থনা আরম্ভ করলো,—উদয়নও যোগ দিল :দের প্রার্থনায়। স্তব শেষ হবার পর ছোট মাসিমা অনুরোধ করলেন উদয়নকে কিছু বলতে। উদয়ন আরম্ভ করলো ঃ—

"আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। এত বড় বিপদ ভারতের সনাতন সংস্কৃতির ইতিহাসে আর কখনও আসেনি। মানুষকে মহতো-মহীয়ান মানব-দেবতার স্তরে উন্নীত করবার সাধনা করে গেছেন যে জাতির পূর্বপুরুষ, সেই জাতি আজ অতি সাধারণ পার্থিবতায়—আত্মম্ভরিতার অহমিকায় আত্ম-বিসর্জন করেছে। অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির আজ আর প্রয়োজন নেই—সাধারণ ভাবে দেখলেই দেখা যাবে যে—পশ্চিমের এমন কতকগুলি 'ইজ্‌ম্'—অর্থাৎ উপ-ভাব আমাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে, যার ফলে আমাদের সাংস্কৃতিক চৈতন্য প্রতিহত হতে হতে অবলুপ্ত হয়ে আসছে ক্রমশ ; গুরুজনে শ্রদ্ধা, স্বধর্মে আস্থা, কর্তব্যে নিষ্ঠা থেকে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করার মধ্যে যে আকুতি আমাদের জাতীয় জীবনকে সুমহান সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এই দীর্ঘ শত শতাব্দী, তাকে আমরা শুধু ভুলেই ক্ষ্যান্ত হইনি—আঘাত করে অর্ধমৃত করে তুলেছি।

পশ্চিমের বড় বড় বুলির পিছনে আছে ভোগবাদ—ভোগ্যা বসুন্ধরাকে ভোগ করবার যোগ্য হবার তাগিদ—সাম্যবাদের সমর্থনের পিছনে শক্তিমানের প্রতি ঈর্ষা—সাম্রাজ্যবাদের রক্ষণশীলতার পিছনে অন্যের ওপর প্রভুত্বস্পৃহা; কিন্তু ভারতের আদর্শ ত্যাগের আদর্শ—ভারতের শিক্ষা মোক্ষের শিক্ষা—অর্থাৎ এই পার্থিব স্বত্বার উপরে যে লোকোত্তর জীবন, তাতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার শিক্ষা,—সেখানে শত্রু-মিত্র ভেদ নাই, আত্মীয় অনাত্মীয় নাই, সম্রাট এবং সাধারণ বলে কোনো রেখা টানা নাই,—সে ঐক্যের ভূমি, সর্বভূতের মধ্যে একত্ব অনুভব করবার সুমহান সাধনা-ভূমি।

আজ আমরা সেই সাধনার কথা ভুলে অতি-সাধারণ সমাজ-তন্ত্র বা গণতন্ত্র নিয়ে লড়াই করছি—আপন প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছি, ভেদ-বিভেদে বিদ্দিষ্ট হয়ে উঠছি। যে পশ্চিমি প্রচারণার প্রভাব আজ এই অবস্থা এনেছে, তাকে সহজে বাধা দেওয়া এখন সম্ভব নয়—সে প্রাচীন অট্টালিকায় বটগাছের মত শেকড় গেড়ে বসেছে; তবু অট্টালিকার অধিবাসী আমরা, পিতৃপুরুষের পুরানো ভিটে মেরামত করবো—তার জন্য আমাদের হতে হবে অনলস।

এই যে আশ্রম,—একে সেই ধারায় পরিচালিত করতে হবে। এখানকার প্রতিটি প্রাণীর প্রতি কর্মে যেন ভারতের সুমহান আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়—যার প্রভাব একদিন সারা ভারতে বিস্তৃত হবে—”

ওর বক্তৃতার ভাষাটা বেশ কঠিন এবং বিষয়টাও শক্ত;

মেয়েরা সবাই বুঝতে পারলো না—নিঃশব্দে শুনে গেল তারা। পাঞ্চালীও শুনলো। সে-ই বলল,

—আমাদের মধ্যে এসে আজ আপনি যে কথাগুলি বললেন, তার সরলার্থ আমাদের কাছে খুব স্বচ্ছ নয়; সকলের বোঝবার জন্য আপনি অনুগ্রহ করে আমার মত সাধারণ মেয়েদের উপযোগী কথা বললেই আমরা বুঝতে পারি।

—তা ঠিক, আমার ভাষাটা একটু কঠিন হয়েছে—উদয়ন স্বীকৃতির সস্মিত হাসি হাসল, কিন্তু একটু থেমেই বললো,—বক্তব্য বিষয়টাও জটিল—তার ভাষাও তাই কিছু শক্ত হতে বাধ্য; কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের দেশের মেয়েদের রক্তের মধ্যে যে কৃষ্টিধারা অনুপ্রবিষ্ট, তার শক্তিতেই তারা আমার কথা বুঝতে পারবে।

—তাকে 'ঠিক বোঝা' বলা যায় কি! সে শুধু একটা অনুভাব—অন্তরের সামান্য স্পন্দন।

—ঐ স্পন্দনটুকু জাগলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে—আপনাদের অন্তরে সবই সঞ্চিত রয়েছে, শুধু স্পন্দনের সাহায্যে তাকে সক্রিয় করে দেওয়ার দরকার।

—না, আমার তা মনে হয় না—অনেক সঞ্চয় আমরা হারিয়েছি; অনেক অপ-সঞ্চয়ও করেছি, দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার চাপে অনেক সঞ্চয় অতলে তলিয়ে গেছে, আর অনেক অপ-সঞ্চয় উপরে জমা হয়ে আবর্জনাময় করে তুলেছে অন্তরকে।

—ঠিক কথা। সেই অপ-সঞ্চয়কে ঝেড়ে ফেলতে হবে—ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে।

ছোট মাসিমা পাঞ্চালীর তর্কটা ভাল চোখে দেখছিলেন না। বললেন,

—তুমি থামো পাঞ্চালী, ওঁর সঙ্গে তর্ক করো না; মনে রেখো, তুমি ছাত্রী।

পাঞ্চালী একবার মুখ তুলে চাইল ছোট মাসিমার পানে, তারপর সগর্বে বলল,

—ছাত্রীদের কাছেই উনি কথাগুলো বললেন মাসিমা; বুঝতেই যদি আমরা না পারি, তো ওঁর বলার সার্থকতা কোথায়? কি দরকার ছিল ওঁর বক্তৃতা দেবার?

অন্যান্য সকল ছাত্রীই পাঞ্চালীর এই দুঃসাহস দেখছে, উপভোগ করছে।

—আপনি থামুন ছোট মাসিমা,—উদয়ন বলল—তুমি নিশ্চয়ই বুঝে নেবার জন্য যে-কোন প্রশ্ন করো পাঞ্চালী, আমি খুশি হব, কিন্তু গুরুজনের সম্মান ক্ষুণ্ণ করো না!

—আমি কোনোরকম অসম্মানের কথা কাউকে বলে থাকলে করযোড়ে মাপ চাইছি—কিন্তু গুরুজনদেরও তো উচিত আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত না করা; আমরা ছাত্রী, কিন্তু আমাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে, স্বাধীন চিন্তাধারা আছে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে।—পাঞ্চালী যেন উত্তেজিত হতে হতে থেমে গেল অকস্মাৎ। তারপর হাতযোড় করে বলল,—আমি মাপ চাইছি ছোট মাসিমা, কিন্তু ওঁর বক্তব্য আমরা খুব কম মেয়েই বুঝতে পেরেছি; আপনি বুঝে থাকলে আমাদের বুঝিয়ে দিন।

—আমিই দিচ্ছি বুঝিয়ে—উদয়ন বলল হেসে—কিন্তু তোমাদের কি সময় হবে অত কথা শোনবার ?

—আমরা এখানে শিক্ষা পেতেই এসেছি—সৎকথা শোনবার সময় সব-সময়েই হওয়া উচিত।

উদয়ন আশ্চর্য হচ্ছিল মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গী দেখে ; কতটা লেখা পড়া শিখেছে ও ? কিন্তু সে চিন্তা চাপা দিয়ে বলতে লাগলো,

—তা' ঠিক, তবে এখন যদি আশ্রমের নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচী থাকে, তাহলে আর একদিন এসে আমি আমার কথা বলবো। —কেমন ?

—তাই হবে—! পাঞ্চালী মাথা নামালো ধন্যবাদের ভঙ্গীতে। উদয়ন বলল,

—এই আশ্রমের পিছনে যে আদর্শ আছে, তাকেই রূপদান করতে হবে এখানকার ছাত্রীদের। সেই আদর্শটা সকলের মনে যাতে গেঁথে যায়, তার কথাই আমি বলছিলাম।

পাঞ্চালী বা অন্য কেউ আর কিছু বললো না। ছোট মাসিমাই বললেন,

—সেই আদর্শের পথেই এই আশ্রম পরিচালিত হচ্ছে ; আর আমি বিশ্বাস করি যে, এখান থেকে যে মেয়েরা বেরুবে শিক্ষালাভের পর, তারা সেই আদর্শেরই সৃষ্টি হবে।

অতঃপর তিনি উদয়নকে ধন্যবাদ জানালেন বক্তৃতা করার জন্য। মেয়েরা সকলে চলে গেল, পাঞ্চালীও গেল। উদয়ন অফিস ঘরে এসে বড় মাসিমার সঙ্গে আলোচনা করলো

অনেকক্ষণ টাকা কড়ির ব্যাপার নিয়ে। পরে ফিরছে বাড়ি, দেখে—পূর্বদিকের রোয়াকটায় পাঞ্চালী ছোট একটা বাছুরকে ভাতের ফেনা খাওয়াচ্ছে। উদয়ন প্রশ্ন করলো—ওকে কি খাওয়াচ্ছ, ফেনা ?

—হ্যাঁ—ওর মা নেই !—পাঞ্চালীর কালো চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য মিললো উদয়নের চোখের সঙ্গে। উদয়ন আস্তে একটু এগিয়ে বললো,—তুমি এ আশ্রমে কেমন করে এলে ?

—যেমন করে অন্য সব মেয়ে এসেছে ; পড়তে এসেছি।

—কিন্তু তোমার বাড়ি শুনলাম অনেক দূরে, খুলনায়। এখানকার খবর জানলে কোথায় ?

—আমার কাকা জানেন ; তিনিই পাঠিয়েছেন—

—তোমার কাকা ! কি নাম ?

—তিনি এখন জেলে আছেন ; নাম রণধীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—রণধীর ! উদয়ন বিস্মিত হবার অবসরে পাঞ্চালী ধীরে ধীরে চলে গেল সেখান থেকে।

বৈকালিক ভ্রমণের জন্য অনুভা সাজ-সজ্জা করে নীচে নামলো। মেঘনাদ অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে নীচে। সেদিনের সেই সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি অনুভার। আজ ফোনে এনগেজমেণ্ট করে সে এসেছে অনেক আশা নিয়ে, মেট্রোতে 'রোমিও-জুলিয়েট' দেখতে যাবে ; অনুভা সম্মতি দিয়েছে। একে অনুভা, তার উপর যাবে মেট্রোতে, অতএব

সাজ-সজ্জা করতে যে ঘণ্টা দুই-তিন সময় তার ব্যয় অনিবার্য, একথা বুঝেই মেঘনাদ অনেক আগে এসেছে। তার টু-সীটারটা নূতন। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে।

অনুভা সম্মতি দিয়েছিল, না দিয়ে পারে নি। লেডী গুপ্তা তাকে ফোন করে প্রায় অস্থির করে তুলেছিলেন গত কাল থেকে এবং মাও চায় যে অনুভা ওদের সঙ্গে মেলামেশা করুক; অবশ্য ইলা তার ভাষণে এমন কিছু বলে নি, কিন্তু ইঙ্গিতটা ঐ দিকেই যাচ্ছে।

অনুভা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মনে মনে। বিয়ে তাকে করতে হবে, কিন্তু নিজে দেখে-শুনে পছন্দ করে বিয়ে করাই ওদের সমাজের রীতি; অথচ তার উপর এমন অদৃশ্য চাপ দেওয়া হচ্ছে যে পছন্দের সময় সে পাচ্ছে কোথায়! তবে মেঘনাদ মন্দ ছেলে নয়; মা অবশ্য বলেছে যে মুরগীর ডিমে গড়ুড় পক্ষী জন্মায় না—তা গড়ুড় পক্ষী ক'টা মেয়েই বা পায় আজকাল। তবে মেঘনাদ মুরগী নয়, ময়ূর; মা ওকে অনর্থক খাটো করছে। ময়ূর খুব সুন্দর পক্ষী; তাকে পোষা এমন মন্দ কি!

মন ঠিক করে অনুভা সাজ পোশাক সেরে নীচে নামলো, মেট্রোতে যাবে। মেঘনাদ বসবার ঘরে বসে ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লির পাতা উল্টাচ্ছিল, অনুভাকে নামতে দেখেই বইখানা সমেত দাঁড়িয়ে উঠলো।

—অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—মাফ চাইছি—অনুভার হাসিটা অ্যাপলজির।

—না-না, আমার কিছু অসুবিধে হয় নি অনু; তোমার দেরী

হবে জেনেই আমি অনেক আগে এসেছি। ‘শো’ ঠিক ছটায়—এখনো ত্রিশ মিনিট পুরো রয়েছে।

—চলুন—অনুভা ওঘরে না ঢুকেই বাইরে বেরুবার রাস্তা ধরলো।

খোলা ফটক দিয়ে কে একটা লোক আসছে ; হাতেকাটা মোটা খদ্দরের ধূতি-পাঞ্জাবী পরণে, হাতে খদ্দরের থলে, ডান হাতে কাগজে জড়ানো কি একখানা—হয়তো প্ল্যান, না হয় ক্যালেণ্ডার। পায়ের জুতো জোড়া অনেকদিনের পুরানো, তবে পালিশকরা ; মাথায় খদ্দরের টুপী। কে লোকটা ? অনুভা নিজের মনে প্রশ্ন করতে করতে মেঘনাদের গাড়ির কাছে এল।

—কাকে চাইছেন ?—প্রশ্ন করলো অনুভা ; মেঘনাদ ঠিক তার পিছনে।

—ইলা দেবীকে—তিনি কি আছেন বাড়িতে ?

—আসছেন কোত্থেকে ?—ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অনুভাই প্রশ্ন করলো আবার।

—বিজয়পুর থেকে—বললো ছোকরা—তিনি কি নেই বাড়িতে ?

—আছেন—অনুভা তাকালো লোকটার পানে। পাদমস্তক দেখলো তার ; বললো,

—যান ভিতরে ; আপনার মুখ দেখে আমি যাত্রা করছি, দেখি, কি ফল হয়—হাসলো অনুভা, হাসিটা রহস্যময়ীর হাসি নয়, সাহসিকার সম্মতি হাসি। গাড়ির দরজা খুলেই রেখেছে মেঘনাদ, অনুভা উঠে মেঘনাদকে ইঙ্গিত করলো পাশে বসতে।

পরমুহূর্তেই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে চলে গেল অনুভা ; লোকটা গাড়িখানা দেখলো।

—তুমি ওরকম কথা বললে কেন ওকে ? কে ও ? তোমার চেনা তো নয় !

—চেনাই ; চোখে দেখা না হলেও অন্তরের পরিচয় আছে।

—অন্তরের ?

—হ্যাঁ গো—মানে প্রেম ট্রেম্ নয়—শ্রদ্ধা। ভাবনা নাই। অনুভার এবারের হাসিটা রহস্যময়।

মেঘনাদ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। অনুভা গাড়ি চালাচ্ছে। লাইসেন্স ওর নেই, কিন্তু মেয়েদের সাত খুন মাপ ! ও জানে, ওকে কেউ ধরবে না। চৌরঙ্গীতে পড়ে অনুভা জোরে চালালো গাড়ি। সস্তা একটা এ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়ে কাব্যটাকে জমিয়ে তুলবে নাকি ? না—অনুভা অত সস্তা নয়। গাড়ি ঠিক চলে এলো মেট্রোর সামনে। দুজনে নেমে বসলো গিয়ে আসনে। মেঘনাদ রাস্তায় কোনো কথা বলেনি, সিগারেট খাচ্ছিল, এতক্ষণে প্রেক্ষাগৃহের ছায়াস্নিগ্ধ নীলভ আলোকে ভাল করে তাকালো অনুভার পানে ;—অনুভা সোজা সামনে পর্দার দিকে চেয়ে।

—আজ তোমাকে সত্যি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে অনু।

—আমি তো সত্যই সুন্দরী—অনু মুখ না ফিরিয়েই বলল ; ঠোঁটের লালিমা নীল আলোকে আরো লোভনীয় হয়ে উঠেছে। গলার কণ্ঠিটা ঝক্‌ঝক্ করছে হীরার হাসিতে, মুক্তার মোহে।

—সময় সময় সুন্দরকে বেশি সুন্দর লাগে।—মেঘনাদ বলল।

—যারা সত্যি সুন্দর, তাদের সৌন্দর্য প্রতিমুহূর্তে নব নব রূপ গ্রহণ করে।

—তা ঠিক; তবু বিশেষ একটি মুহূর্তে বিশেষ কোনো মেয়েকে বিশেষ রূপেই দেখা যায়!

—যখন তাকে বলতে পারা যায়, "তোমাকে আমি ভালবাসি"!' থাক্; অন্য কথা বলুন।

অনুভা বিরক্ত হচ্ছে, মেঘনাদ নির্বোধ নয়, বুঝতে তার সময় লাগলো না। রূপের প্রশংসা নারী শুনতে ভালবাসে কিন্তু অনুভার প্রশংসা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। মেঘনাদ তা জানে নিশ্চয়, তবু ঐরকম অতিসস্তা কথা কেন বলল সে! অনুভা এবার নিজে বলতে আরম্ভ করলো—পৃথিবীর সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ট্রাজিডি কী, বলুন তো? দেখি, আপনার সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান কতটুকু!

—'রোমিও জুলিয়েট'—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল মেঘনাদ! ওর ধারণা, যখন রোমিও জুলিয়েট দেখতে এসে অনুভা এই প্রশ্ন করলো, তখন উত্তরটাও নিশ্চয় রোমিও জুলিয়েট। অনুভা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো—মুখে কোনো কথা বললো না। মেঘনাদ শুধুলো,

—কথাটা ভাল লাগলো না! তোমার মতে কোন্‌টা?

—অনুভা 'মেঘনাদ'—বলে মহারহস্যময়ীর হাসি হাসলো অনুভা। মেঘনাদ বলল,

—কিন্তু ওটা তো এখনো পুস্তকাকারে বের হয় নি?

—তাতে কি? রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে তো!

—আমাদের রোমান্সের পরিণতি কি তাহলে ট্রাজিডিই দাঁড়াবে অনুভা ?

—আশা করি। আর আমার মনে হয়, ট্রাজিডি মানুষের মনে যতখানা দাগ কাটে, অত আর কিছুতে নয়। আমাদের জীবনের কাব্য স্মরণ করে লক্ষ লক্ষ লোকের বুক ভেসে যাবে চোখের জলে—স্বর্গে বসে দেখবো। আঃ, কি আরাম !

চপল হাসি হাসলো অনুভা ; মেঘনাদ ঠিক বুঝতে পারছে না, কি ও বলতে চায়। অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে সে। ছবি দেখানো আরম্ভ হলো।

—ভাববেন না। আপনার মনটাকে তৈরি করে নিলাম ভবিষ্যতের জন্য। যদি ঘটেই ট্রাজিডি, তাতেও তখন হার্টফেল যাতে না করেন।

—তুমি এ রকম কথা কেন বলছো অনুভা ?—মেঘনাদ সবিনয়ে শুধুলো।

—বলছি এই জন্য, যে আমাকে শুধু সুন্দরী দেখে যদি আপনি বিয়ে করতে চান, তা'হলে করবেন না—আপনার পৈত্রিক ধনসম্পদ দেখে আমিও তা করবো না। আমাদের মধ্যে যদি সত্যিকার ঐক্য কোথাও থাকে তো সেটাই আবিষ্কার করতে হবে আমাদের—যে ঐক্য কোনোদিন অনৈক্যের ছুরিতে বিচ্ছিন্নতা ঘটাবে না—যে সুর কোনোদিন কেটে যাবে না।

বাজনা চলছে, সুন্দর ইংরাজি গৎ—অনুভা গান ভালবাসে। চুপ করে শুনতে লাগলো। মেঘনাদ একটু থেমে, একটু ভেবে বললো,

—তোমার কি মনে হয়, আমাদের মধ্যে ঐক্য নেই ?

—এখনো সেটা আবিষ্কৃত হয় নি। আপনি আমাকে সুন্দর দেখে বিয়ে করতে চান, আর আমি আপনার টাকা দেখে আপনাকে চাই, এটা ঐক্য নয়, এর নাম মোহ। আপনার রূপের আর আমার অর্থের। এ মোহ নিতান্ত মাতালের কালী দেখার মোহ, নেশা ছুটলে ভক্তি উপে যায়। সাধারণ যুবক-যুবতীরা এই মোহবশেই আজকাল বিবাহিত হচ্ছে।

—তুমি কি অসাধারণ কিছু করতে চাও অনুভা ?

—না। অসাধারণ আমি নই; কিছু করতেও চাই না। কিন্তু আমি জানি, বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ের মেলা মেশা, বোঝাপড়া করে বর্তমান দিনে যেসব মিলন হচ্ছে, তাতে প্রথম দিকে কেউ কারো অন্তর আবিষ্কারের চেষ্টা করে না, করে মোহিত করবার চেষ্টা—রূপ গুণের ডিমনস্ট্রেশনে,—অর্থের সাড়ম্বর প্রকাশে, আর সাজ-সজ্জার অপরূপ চাকচিক্যে। অন্তর থাকে দূরে—অন্তরে, নিকট হয় শুধু দেহ, শুধু যৌনক্ষুধা, শুধু কামনা। এর থেকে আমাদের প্রাচীন সমাজে মা-বাপের দেখা-শোনা বরকে বিয়ে করবার প্রথা ভাল ছিল; তাতে পরস্পর অন্তরকে আবিষ্কার করার সুযোগ না পেলেও রূপ বা অর্থের মোহে ঘুরপাক্ খেতো না দম্পতী। কিন্তু আমি বক্তৃতা থামালাম, ছবি দেখুন।

ছবি চলছে। সুন্দরী জুলিয়েট পর্দায়—তার পরই কয়েকটি অর্ধ উলঙ্গ নরনারীর নৃত্য—পোশাকের মসৃণতায় মন পর্যন্ত মসৃণ হয়ে যায়। মানুষের মনকে প্রতি মুহূর্তে নিয়ে যাচ্ছে

উত্তেজনার পথে। এই ছায়াছবি—মোশেন পিকচার, যার সর্বত্র মোশেন—গতি। কিন্তু গতিটাই তো জীবনের সব নয়, গভীরতাও তো দরকার—দরকার গাম্ভীর্যের। নইলে—বৈজ্ঞানিক বলেন, 'এমন ক্ষুদ্র কীট আছে, যাদের গতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত এরোপ্লেন আজো তৈরি হয় নি।' গতি তাদের আছে, কিন্তু কোথায় গভীরতা, কোথায় ব্যাপ্তি বা দীপ্তি! 'কয়েক ঘণ্টার গতি-সম্বল জীবনেই সমাপ্তি তাদের। দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে দ্রুত মৃত্যু বরণ তাদের নিয়তি। এই কি জীবন? এই কি জীবনের শ্রেয়ঃ?—অনুভা ভাবতে ভাবতে চাপা নিশ্বাস ছাড়লো।

—ভালো লাগছে?—শুধুলো মেঘনাদ।

—ছবি ভালো লাগবার জন্য তো আসিনি এখানে, মিঃ গুপ্ত। এখানে আজ এসেছি যাকে ভালো লাগাবার জন্য, তাকেই ভাল লাগছে না; মাফ করুন।

—মাফ আমিই চাইছি অনুভা, আমারই চাওয়া উচিত। জানি না, কি তুমি চাও, কি আমার মধ্যে নেই। আমার মায়ের, বাবার এবং আমারও ইচ্ছা, তোমাকে আমরা পাই। কিন্তু সে-পাওয়া তোমার স্বেচ্ছায় আত্মদান হলেই সুখী হই।

—মানুষের ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই মিঃ গুপ্ত, ইচ্ছা পরিবর্তনশীল। আজকার ইচ্ছা কাল থাকে না। দশ বছর বয়সে পুতুল নিয়ে খেলেছি, আজ হাসি পায় পুতুল দেখলে। অপরের জীবন রক্ষার জন্য যে ত্যাগী স্বেচ্ছায় জীবন দান করতে যায়, জীবন দেবার মুহূর্তে সেও হয়তো তার ইচ্ছার পরিবর্তন লক্ষ্য করে—ভাবে, বোকামী করলো।

—তাহলে কোন্‌টা অপরিবর্তনীয় ?—মেঘনাদ যেন বিদ্রূপ করলো এবার।

—তা জানি না ; অত বিদ্যা আমার নাই। মানুষের মধ্যে কিছু অপরিবর্তনীয় আছে কি না, ঐ লোকটাকে শুধুবো আজ।

—কোন্‌ লোকটা ? ঐ যে এলো তোমাদের বাড়িতে ?

—হ্যাঁ। ঐ আধময়লা খদ্দরপরা লোকটা নাকি মহাভারত পড়ে।

—মহাভারত! সে তো পুরানো গল্প। তাতে তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলবে ?

—হ্যাঁ ; যা নেই 'ভারতে'-তা নেই ভারতে ; অর্থাৎ মহাভারতে যা নেই, তা ভারতের আর কোথাও নেই। ও নাকি সেই মহাভারত সারা দিনরাত্রি পড়ে।

—দিনরাত্রি পড়ে ? কে বললো ? তুমি তো ওকে পারসোন্যালি চেন না, বললে !

—অরু বলছিল। আমি চিনবো কি করে! ও এতদিন ছিল জেলে।

—আগস্ট-বিপ্লবী ?

—অনেক কালের বিপ্লবী। ওরা বংশগত বিপ্লবী। চেহারা দেখলেন না, হাতখানা যেন লোহার মুগুর—স্বদেশী আমলে ডাকাতি করেছেন ওঁর মামা এবং উনিও হয়তো করেছেন।

মেঘনাদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর আস্তে বলল,

—স্বদেশী হলেও ডাকাতি তুমি সমর্থন করো অনুভা ?

—লভ্য অর্থের ব্যয়ের উপর সেটা নির্ভর করে। না হলে, বড়লোকের নামে ফাণ্ড খুলে বড় বড় চাঁদা তুলে এরোপ্লেনে ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে ডাকাতির কোনো তফাৎ নেই।

—তার মানে?

—মানে, এদেশের অনেক বড় তহবিল গরীবের রক্ত জল-করা চাঁদার টাকায় তৈরি হয়েছে, যার খরচের অঙ্ক আজও চোখে দেখা গেল না। তবে ঐ স্বদেশী ডাকতরা গরীবের কিছু নিতেন না, বড়লোকদের ঘরেই ডাকাতি করতেন; এই যা তফাৎ। ওঁরা মারতেন বড়লোকদের বেছে বেছে, এঁরা মারেন গরীব-বড়লোক সবাইকে।

—কোনো ফাণ্ডে টাকা দেওয়া তুমি পছন্দ কর না?

—তা করবো না কেন? আমার টাকা আছে, দেব কিছু। তবে জেনেই দেব যে সে টাকার কানাকড়িটাও গরীবের কাজে লাগবার আশা নেই।

—ও-দেশে বড় বড় প্রতিষ্ঠান চলে চ্যারিটিতে, জানো!

—হ্যাঁ, চলুন। ওদেশে তো ফেরারী আসামী সন্ন্যাসী সেজে আত্মগোপন করতে পারে না, ধর্মের নামে ধাপ্পাও দিতে পারে না। ওদেশ স্বাধীন—সরকার সেখানকার মানুষের ভালমন্দের শুধু কর্তা নয়, মানুষই সেখানকার সরকারের প্রতিষ্ঠার কর্তা। তুলনা করবেন না,—চলুন, শেষ হয়ে গেছে ছবি।

দু'জনে বাইরে এল। বৃষ্টি হচ্ছিল বাইরে, রাস্তা ভিজে। ভিজেই ওরা এসে গাড়িতে উঠলো।

উদয়ন অনেক কিছু আলোচনা করলো ইলার সঙ্গে। আলোচ্য বিষয় বর্তমান সমাজনীতি এবং ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে বৈদেশিক সমাজতন্ত্রের আর সাম্যবাদের তফাৎ। আলোচনাটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে, এমন সময় ফিরলো অনুভা। মেঘনাদও উপরে উঠে এসেছে আলাপ করবার জন্য। ইলা সাদর আহ্বান জানিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। অনুভা ইতোমধ্যে ভ্যানিটি ব্যাগটা রেখে প্রণাম করলো।

—চিরায়ুষ্মতী হও—অতি পুরানো আশীর্বাদ উচ্চারণ করলো উদয়ন।

অনুভা তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে নিজের ঘরে ঢুকলো গিয়ে, বললো,—এক্ষুনি আসছি। ইলা জানে, অনুভা আর একবার কাপড় ছাড়বে; নতুন রকমে সাজবে, তারপর বেরুবে উদয়নের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। আর একটা নতুন মূর্তি তাকে দেখাতে হবে। কিন্তু এই তিন ঘণ্টার আল আলোচনায় ইলা বেশ বুঝতে পেরেছে, বাইরের রূপ-যৌ র কোন আবেদন এই ছেলেটির বুকে স্পন্দন তোলে না। অন্তরের সৌন্দর্যই ওকে আকৃষ্ট করতে পারে; সে হিসাবে অনুভার চেয়ে অরুন্ধতীই ওর অনেক নিকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু অরু বড্ড ছেলেমানুষ; ওর সঙ্গে উদয়নের মিলন মানাবে না।

—আমরা এসে বাধা দিলাম, মাফ্ করবেন—মেঘনাদ সহাস্য কুণ্ঠার সঙ্গে নিবেদন করলো।

—না না, আলাপ আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে আমাদের

মধ্যে—আপনারা কিছু বাধা দেন নি; তাছাড়া আমরাই প্রত্যাশা করছিলাম আপনাদের ফিরবার—উদয়ন বলল হেসে।

—আপনাদের বুঝি সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদ নিয়ে কথা হচ্ছিল ?

—হ্যাঁ, ঐ রকম অনেক কিছু—মাসিমা দেখছি পুরোদস্তুর সাম্যবাদী।—উদয়ন হাসলো ইলার পানে চেয়ে। মেঘনাদ অকস্মাৎ সোজা হয়ে বসে কথাটা লুফে নিয়ে বলল,

—সাম্যবাদ পৃথিবীর আদি এবং শেষ কথা—সকলেরই সাম্যবাদী হওয়া উচিত।

উদয়ন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললো—পৃথিবীর আদি এবং শেষ কথা সাম্যবাদ ?

—হ্যাঁ—আদিতে সাম্যবাদই প্রচলিত ছিল এবং অন্তে অর্থাৎ এখন সাম্যবাদই চলবে। অর্থাৎ চালাতে বাধ্য হবে মানুষ। সর্বহারাদের বুকের রক্ত নিংড়ে যারা মাটির ধূলায় মার্বেলের প্রাসাদ রচনা করেছে, তাদের দিন শেষ হয়ে এল; তারা যাবেই।

কথাগুলো নিশ্চয় কোন বই থেকে ধার করা, উদয়ন মুহূর্তে তা বুঝতে পারলো, কিন্তু সেদিকটা অগ্রাহ্য করে হেসে বললো,

—আপনি যাদের সর্বহারা বলছেন, তাদের সর্বস্ব কোনোদিন ছিল কিনা, জানা নেই। যার থাকে, সেই হারাতে পারে, যার নেই বা ছিল না, সে হারাবে কি! আর মাটির ধূলায় মার্বেল, এমন কি সোনাও জন্মায়। কৃতিত্বটা সংগ্রহের আর শিল্প-রচনার; অবশ্য সুযোগ সুবিধার কথা আপনি

বলতে পারেন—সেটা শক্তিমানেরই লভ্য! নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—কথাটার ভাবগত অর্থই হোল, শক্তিকে আয়ত্ত করা।

—সেই শক্তিই গণশক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে আজ। মেঘনাদ যেন জয় লাভ করছে, এমন ভাবেই কথাটা উচ্চারণ করলো—তারা সব-কিছু সমান করে নিয়ে সকলে একত্রে চলবে।

—এই মত সত্য বলে মনে হয় না। বৈচিত্র্যই বিশ্বের বিকাশের প্রধান লক্ষ্য—উদয়ন বলল,—চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ইত্যাদি অনন্ত গ্রহতারকা সবই গোল, তবু প্রত্যেকটির আকার, আয়তন, ভ্রমণপথ এবং হয়তো সেখানকার প্রাণীজগৎ বিচিত্র এবং বিভিন্ন; সব মানুষের দুটি হাত, দুটি পা—দুই চোখ আর এক মাথা থাকলেও মানুষের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য, অসীম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত শক্তি বা প্রতিভা কদাচিৎ একজনের সঙ্গে অন্যের মেলে—তবে আর্থিক বা সামাজিক দিকটা সমান করা যেতে পারে এবং সকলকে সমান সুযোগ পাবার ব্যবস্থাও হয়তো করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে পৃথিবীর সভ্যতার গতিপথ ঋজু হবে কি তীর্যক হবে, বলা কঠিন! সে পরীক্ষা অনেক শতাব্দীর পরীক্ষা—কিন্তু…

উদয়ন থামলো কথা বলতে বলতে। অনুভা এসে দাঁড়িয়েছে; চমৎকার শাড়ি পড়ে এসেছে একখানা। বারান্দার উজ্জ্বল আলো লেগে ঝকমক করছে জরীর পাড়।

—কিন্তু কি বলুন!—অনুভা হেসে প্রশ্ন করলো; হাসিটা অনুগৃহীত করার হাসি।

—কিন্তু এই যে সাম্যবাদের ধুয়া আমাদের যুবক যুবতীর

মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে, তাকে তো ঠিক অগ্রগতি বলে না। এমন কি, ওটা গতিই নয়। অন্যের ভাবকে আশ্রয় করে অ-বোঝা ভাষা প্রয়োগের মত শক্তিহীন হয়ে পড়ছে ওটা; এতে সৃষ্টি হয় উচ্ছৃঙ্খলতার—উন্মার্গের, উৎসন্নের পথের।

—কেন!—মেঘনাদ যেন মেঘমন্দ্রবৎ গর্জন করে উঠলো সামান্য 'কেন' কথাটার ধ্বনিতে।

—কারণ, মানুষের মনকে—সাধারণ মানুষের কথাই বলছি—তাদের মনকে লুব্ধ করে তুলেছে ঐ মতবাদ, অথচ ঐ লোভকে, ঐ একান্তলভ্য বলে জানা বস্তুকে লাভ করবার যোগ্যতা অত তাড়াতাড়ি অর্জন করা সম্ভব নয়। স্থায়ী সবকিছুকে উৎখাৎ করে আজই সব সমভূমি করার ইচ্ছার মূলে যে শক্তি, তার নাম দানবীয় শক্তি। গঠনের কাজ তা দিয়ে চলে না। সে শক্তি যখন গঠন করবে তখন সেই হবে দেবশক্তি। কিন্তু সে শক্তি আসবার পূর্বেই লোভের দুর্দমনীয় বেগ আমাদের কোন্ পথে নামাচ্ছে, দেখুন। এ পথ ধ্বংসের পথ; সৃষ্টির পথ লোভের দ্বারা তৈরি করা যায় না, যায় ত্যাগের দ্বারা, কিন্তু এ আলোচনা থাক এখন—উদয়ন কি ভেবে কথা বন্ধ করে দিল অকস্মাৎ।

—থাকবে কেন!—মেঘনাদ বললো—আপনার মতকে আপনি যুক্তি দ্বারা সমর্থন করুন।

—যুক্তিদান অনেক সময় অযৌক্তিক হয়ে পড়ে—মাফ করবেন। শুধু তর্কের জন্যই যাঁরা তর্ক করেন, তাঁদের কাছে যুক্তি দেওয়া অযৌক্তিক।

—আপনি কি তর্কের জন্যই তর্ক করবার অভিযোগ করছেন আমার উপর?—মেঘনাদ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো, যেন আক্রমণ করলো উদয়নকে। উদয়ন হেসে বললো,

—অভিযোগ নয়, অনুযোগ। আপনি স্বয়ং সাম্যবাদী নন, সেটা প্রকাশ হয়ে পড়লো অকস্মাৎ।

—কিসে? আমার মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন নাকি? জ্যোতিষ জানেন?—ব্যঙ্গ করল মেঘনাদ।

—জ্যোতিষ বিদ্যার দরকার হয় না—উদয়ন অতি শান্ত কণ্ঠে বললো—জ্যামিতি বিদ্যায় ত্রিভুজের দুইবাহু একত্রে তৃতীয় বাহুর থেকে বড়, প্রমাণ করা যায়।

—এখানে দুই বাহু কে?

—আপনি আর অনুভা!—উদয়ন কথাটা বলেই হাসলো নিঃশব্দে—তর্কে আমি হেরে যাব—তাই আগেই হার স্বীকার করে নিলাম।

—অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আপনি প্রমাণ করলেন যে আমরা তর্কের জন্যই তর্ক করছি। কোনো কিছু মীমাংসার জন্য নয়—এই তো?—অনুভা বললো অপরূপ মুখভঙ্গী করে।

—হ্যাঁ, সেটা সত্যি—উদয়ন আবার হাসলো একটু—তর্কের জন্য তর্ক এদেশে বিস্তর হয়ে থাকে—ঘরে, বাইরে, মাঠে, ময়দানে, চায়ের দোকানে, রাস্তার ফুটপাতে। প্রয়োজনমত যে-কোনো এক পক্ষকে সমর্থন করা আমাদের নীতি। কিন্তু নিজেরা আমরা কোনো মতেরই নই—এই হচ্ছে অধিকাংশ

মানুষের অন্তরের কথা। তাতে সুবিধা হয় এই যে, যে-কোন সময় যে-কোনো দলের বলে নিজকে চালিয়ে নেওয়া যায়।

—আর অসুবিধা?—অনুভা প্রশ্ন করলো।

—অসুবিধাকে তারা এড়িয়ে চলে সাধ্যমত।

—অর্থাৎ আমরা সুবিধাবাদী—মেঘনাদ বিরস কণ্ঠে বললো। ওর হাসিটা নিবে গেছে।

—ব্যক্তিগত কথা টেনে না আনাই ভালো। দেশে যা ঘটছে, তাই আমি বললাম।

ইলা উঠে গিয়েছিল, এসে বলল—রাত হয়েছে উদয়, চলো খাবে।

মেঘনাদ নমস্কার জানিয়ে বলল—কাল আছেন তো? নাকি চলে যাবেন?

—ঠিক বলতে পারি না—কাজ শেষ হলেই চলে যাব; নমস্কার।

উদয়ন উঠে গেল ইলার পিছনে। মেঘনাদ অনুভাকে জনান্তিকে বললো,

—এই তোমার আদর্শ বীরপুরুষ? একটা ইডিয়ট!

—থামুন! উনি আমাদের অতিথি; তাছাড়া ওঁর কথাগুলো ঝাঁঝালো হলেও সত্যি?

—সত্যি? তুমিও তাই ভাবো অনুভা!

—হাঁ,—স্যার রঙ্গনাথের ছেলে সাম্যবাদী, বিশ্বাস করতে বলেন নাকি?

—স্যার রঙ্গনাথের ছেলে হওয়া আমার অপরাধ নাকি অনুভা?

—না, তবে তাঁর অর্থের আর পদমর্যাদার উত্তরাধিকারী হওয়াটা সুবিধাবাদীর সুযোগ করে দিতে পারে—অনুভা চলে গেল কথাটা বলতে বলতে।

ইলা খেতে বসিয়েছে উদয়নকে ; অরুন্ধতীও খেতে বসেছে ওর পাশে। অকস্মাৎ অনুভা প্রবেশ করে বললো—আমারও খিদে পেয়েছে মা, খেতে দাও।

—আয়, বোস।—ইলা আহ্বান করলো। অরুন্ধতী তখন উদয়নকে বলছিল,

—আচ্ছা উদয়দা, এই যে সব বারোয়ারী পূজা হয় কলকাতায়, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা—এগুলো পূজো, না কি শুধু আমোদ ?

—মানুষ আনন্দ চায় অরু, পূজার উৎসবের মধ্যে সেটা লাভ করে—ওর মুখ্য উদ্দেশ্য আমোদ।

—তাহলে দেশের বাড়িতে যে-সব পূজো হয়, সেগুলোও আমোদ ?

—না—আমোদ করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—সেখানে সেটা গৌণ। নিজের আধ্যাত্মিক চৈতন্যকে জাগ্রত করাই সেখানকার মুখ্য উদ্দেশ্য। বারোয়ারী পূজায় সে উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয় এই জন্য যে, বারোশো জনের বৃত্তি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে একত্ব আনা কঠিন। যদি ঐ একত্ব সম্ভব করা যায়, তাহলে বারোয়ারী পূজাই বেশী সফল হয়ে ওঠে।

—হয় না কেন?—

—হবার আগের সাধনাটা আমরা অনেকদিন ভুলে গেছি। আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনাই ঐক্যের সাধনা ছিল, কিন্তু আজ আমরা লক্ষ্য করছি সাম্যকে। প্রাণে প্রাণে একতা সম্ভব কিন্তু আকারে-আকৃতিতে-ওজনে সেটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে—বোঝা যায় না।

—প্রাণে প্রাণেই বা একতা সম্ভব হবে কেমন করে? অনুভা দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

—নিখিল বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রের যিনি চৈতন্য, তিনি এক মেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁর থেকেই স্ফুরিত হয়েছে সব প্রাণ, সব প্রাণী—সৃষ্টির বিচিত্র বৈষম্যের মধ্যে ঐক্যই দেখা যায়—ঐক্য শুধু ওখানেই আমাদের। কারণ প্রতি জীবের যিনি আত্মচৈতন্য, তিনিই চৈতন্য-স্বরূপ।

—কিন্তু প্রতি মানুষের প্রাণ তো এক হয় না—কেউ হিংস্র, কেউ অহিংস, কেউ দাতা, কেউ পরস্বাপহারী, কেউ নিষ্ঠুর, কেউ দয়াবান, কেউ কবি, কেউ রাজনীতিক কেন হয়?

—সেটা অবস্থা গতিকে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে; মানুষের সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক আইন-কানুনের আতিশয্যে আর অন্তরকে উন্নয়ন করবার অনুশীলনের অভাবে।

—অনুশীলন করলে সবাই কি হৃদয়বান দাতাকর্ণ হয়ে যাবে?—বিদ্রুপ করলো অনুভা।

—সবাই না হোক, অনেকে হবে। দাতাকর্ণের যুগে দাতার সংখ্যা নিশ্চয় বেশী ছিল। বৌদ্ধযুগে অহিংসার আশ্রয় গ্রহণ

করেছিলেন কোটি কোটি মানুষ ; আবার রক্তের এই বন্যার যুগে মানুষ অবাধে নরহত্যা করছে……কিন্তু ঐ নরহন্তাকেই যোগ্য ব্যক্তির প্রভাবে এসে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের ঋষিকল্প হতে দেখা গেছে—এমন ইতিহাস বহু।

অনুভা ভাবছে, অতঃপর কি কথা বলে উদয়নকে কায়দা করা যায়।

অনুশীলন কে করাবে, বলুন তো ?. লোক কৈ ?—অনুভা বলল।

—এই পৃথিবীতেই এমন মানুষ এসেছেন, আবার নিশ্চয় আসবেন, যিনি মানুষের এই পশুস্বভাবকে দেবভাবে জাগ্রত করবেন।—

—কে জানে, সে আর হবে কি না, বলা যায় না।—অনুভা সনিশ্বাসে বলল।

—যদি না হয় তবে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। অন্ততঃ মানব জগৎ নিঃশেষে নষ্ট হয়ে যাবে। ইলেকট্রিক আলো, মোটর গাড়ি আর এরোপ্লেনের যুগের যতই আমরা বড়াই করি না কেন, —মানুষকে মানুষ করার দিকে এদের লক্ষ্য কোথায় ? বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক বা স্নায়ুজীবী শ্রমিক পার্থিব সুখের যতখানি পেয়েছে আর পাবে ভবিষ্যতে, তাতে তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাই শুধু বাড়বে। লোভের ছুরিটাই শুধু শানানো হবে। কিন্তু কোথায় মানুষ স্থিতধী ? কোথায় তার প্রজ্ঞা ? কোথায় বা তার আত্মান্বেষণের অনুশীলন ক্ষেত্র ?

—সেইজন্যই তো বলছি, ওসব আর হবে না।

—হবে—উদয়নের কণ্ঠে গভীর আশ্বাস—হবেই। মানুষ এই ভয়ঙ্কর অবস্থা বেশীদিন সইতে পারবে না—এই পার্থিব মত্ততা, এই দানবীয় শক্তির প্রভুত্ব—এই সীমাহীন শারীর-ক্ষুধা তাকে অচিরে বুঝিয়ে দেবে, তার অন্তর-সীতাকে সে নির্বাসিত করেছে—সোনার সীতা-মূর্তিতে চলছে তার অশ্বমেধ যজ্ঞ।

—কিন্তু সোনার সীতা দিয়েই যজ্ঞটা পূর্ণ হতে পারতো।—অনুভা সুন্দর হাসলো।

—হতে পারলো না। দুর্ভাগা রামের অন্তর-বধূর আনন্দ-বেদনার মূর্ত প্রতীক এসে দাঁড়ালো লব-কুশ রূপে—মহাকবি বাল্মিকী দেখিয়ে দিলেন, অন্তর-বধূকে নির্বাসিত করে যে অশ্বমেধ তার নাম আত্মমেধ। অভাগা রামের ঐশ্বর্যের অহঙ্কার, প্রজানুরঞ্জনের আত্মপ্রসাদ ধূলিসাৎ হয়ে গেল চির দুঃখিনী, বনবাসিনী সীতার অঞ্চল-পতাকা তলে—তারপর……

—তারপর? অনুভা দীপ্ত চোখে চেয়ে রয়েছে উদয়নের পানে—তারপর কি?

—অন্তর জাগলো—জাগলো মানুষ রাম—দেবতা হবার প্রলোভন ছেড়ে সে হোল সত্যি মানব-দেবতা।

—কেমন করে? রামায়ণে তো একথা পড়িনি?—অনুভা শুধুলো হেসে।

—সবটাই বইয়ে পড়ে বুঝতে হয় না অনুভা। রাম-চরিত্রে এই মহতোমহীয়ান বিয়োগান্তক জাগরণকে অনুভব করতে হয়; —মহাকবি সে-ভার মানুষের উপর দিয়ে গেছেন।

অনুভা নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল উদয়নের দিকে আধ মিনিট

খানেক। উদয়ন আর কথা না বলে খাওয়া শেষ করতে চাইছে, কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতে ওর মনের তারে যে সুর বেজে উঠেছে, তাকে অগ্রাহ্য করে খাদ্য গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে—সেও নিঃশব্দে বসে রইল পাতার দিকে চেয়ে। ইলা আড়ালে থেকে শুনছিল ওদের কথা—কাছে আসেনি ইচ্ছে করেই। ভাবছে,

—সেই মানুষের ভাগনে তো? নরানাং মাতুলক্রম—তা ঠিকই হয়েছে—কথাটা ভাবতে ভাবতে এসে ওদের অবস্থাটা দেখলো ইলা, নির্বাসিতা সীতার মতই সেও নির্বাসিত হয়েছিল শঙ্করদার পার্থিব সাম্রাজ্য থেকে, বধূত্ব থেকে—কিন্তু শঙ্করদার অন্তর-বধূ···না; ইলা নিজের চিন্তাকে বাধা দিল। এ চিন্তা আর করবে না সে। শঙ্করদা অশ্বমেধ তো করেনি—বরং সেই করছে অশ্বমেধ যজ্ঞ সোনার গদিতে বসে; ইলা কিন্তু ওদের কাছে এসেও কোনো কথা বলতে পারছে না। উদয়নের কথাগুলো ঝঙ্কার তুলেছে কানে ওর।

—পুডিংটা চমৎকার হয়েছে—খাও উদয়দা,—সত্যি বলছি, ভাল হয়েছে উদয়দা।

অরুন্ধতী বাঁচিয়ে দিল পুডিংএর উপাদেয়তা বর্ণনা করে। উদয়ন বললো—তুই খা—আর খাবি?

—হুঁ, তা পেলে আর একপিস······অরুন্ধতী বললো।

—পেটুক কোথাকার;—অনুভা বললো।

—পেটটাই আসল দিদি, বুঝলে? আচ্ছা উদয়দা, তুমি বলতো, মানুষের এই জায়গাটায় কেমন মিল—এই খিদেয়

আমার মনে হয়, সবাই যদি এক খাদ্য খায়,—একই রকম, তাহলে সাম্যবাদ এসে যাবে। সবাই সমান হয়ে যাবে।

—ক্ষুধা ত্বং সর্ব ভূতানাং—ওখানেও একত্ব রয়েছে অরু—তবে তোর মত সবাই যদি গোগ্রাসে না গিলতে পারে, তাহলে যে কম খাবে, সে তোর উপর বিদ্বেষী হয়ে উঠবে।

—সে খাক না—তাকে তো কেউ মানা করছে না!—অরু বললো—সে যদি খেতে না পারে তার আমি কি করবো?

—সাম্যবাদ ব্যাপারেও ঠিক তাই—যে কবিতা লেখে তাকে শ্রমিক হতে বলার সামিল। সবারই সব ক্ষমতা থাকে না অরু।

—এই পৃথিবী খাবার ঘর; যে যত পারবে খাবে ভাই, এই হলেই সাম্য হয়।

—দেহের দিকে হয়তো হয়, কিন্তু মনের খাদ্য সকলের এক হওয়া সম্ভব নয়।—উদয়ন হাত ধোবার জন্য উঠে পড়ল।

নন্দিতা ডেকে পাঠিয়েছে পাঞ্চালীকে; প্রথমটা অবাক হয়ে গেল পাঞ্চালী—উনি কেন তাকে বাড়িতে ডাকলেন অকস্মাৎ! কিন্তু মনে পড়ল, সেদিন যখন গিয়েছিল সে উদয়নের ঝোলাটা দেবার জন্য, সেইদিনই সন্ধ্যায় নন্দিতা তাকে বলেছিল—আগামী পূর্ণিমার দিন বিশেষ পূজায় সে যেন আসে।

আজ পূর্ণিমা—কে জানে কি বিশেষ পূজা ওখানে। নন্দিতা ঠিক গোধূলিবেলায় রওনা হোল, সঙ্গে অবশ্য আরো চার-পাঁচটি মেয়ে আশ্রমের। নন্দিতা একা পাঞ্চালীকে নিমন্ত্রণ করেনি—আরো কয়েকজনকে করেছে, কিন্তু পাঞ্চালী যেন বুঝতে

পারছে, অন্যের চোখে পক্ষপাতিত্বদোষটা এড়াবার জন্যই নন্দিতা ওদের ডেকেছে—দরকার তার পাঞ্চালীকে নিয়ে—কিন্তু কেন ?

পাঞ্চালী কালোপাড় খদ্দরের শাড়ি পরেছে—সেটা খুব ফর্সা নয়—নিজের চারুতাকে যথাসম্ভব ঢেকে শুধু ভদ্রবেশটাই করেছে পাঞ্চালী।

—তোর শাড়িটা ভাই আধময়লা হোল পাঞ্চালী—বন্দনা রাস্তায় নেমেই বলল।

—হোক গে! আমি তো আর বরযাত্রী যাচ্ছি না! পাঞ্চালী জবাব দিল।

—ওর যা রূপ, যে-কোনো কাপড়েই অপরূপ হয়ে উঠে—শোভনা বলল হেসে।

—রূপ! চুপ্ কর—পাঞ্চালী ধমক দিল—কালো মেয়ে আবার রূপসী হয় নাকি ?

—হয় বলে জানতাম না, তোকে দেখে জেনেছি—শোভনা আবার বলল।

—তুই কালো নোস ভাই পাঞ্চালী—"তুই তন্বীশ্যামা শিখরি-দশনা……না কি রে ?

শ্লোকটা পাঞ্চালীই বলেছিল একদিন ওদের কথাপ্রসঙ্গে; নিজের রূপবর্ণনার জন্য নয়—সংস্কৃত-সাহিত্যের রূপবর্ণনা বোঝাবার জন্য। মেঘদূতের ঐ শ্লোকটুকু এবং আরো কয়েকটা শ্লোক ওদের শিখিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু পাঞ্চালী নিজেও জানে, সে রূপসী। অমন নিখুঁত গঠন-নৈপুণ্য বাঙ্গালী-তরুণীর

মধ্যে কদাচিৎ মেলে। কিন্তু হলে কি হবে, পাঞ্চালী যে বালবিধবা। দীর্ঘশ্বাসটা চেপে পাঞ্চালী বলল—আমার আবার রূপ! কি হবে ও দিয়ে?

সত্যি! ওরা এদিকটা চিন্তা করে নি এতক্ষণ। ওদের মধ্যে তিনজন কুমারী, একজন বিবাহিতা হয়েও স্বামী পরিত্যক্তা। কিন্তু তারই রূপসজ্জা সকলের থেকে বেশী। সবুজ শাড়িটা বেশ মানিয়েছে ওর গায়ে—নিটোল দেহ ঘিরে লাবণ্য। অঙ্গের উপযুক্ত স্থানগুলোতে অলঙ্কার—রংও ওর ভাল, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর নয়। নাম ছন্দা। ছন্দা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে; স্বামীর বাড়িতে শ্বাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে এসেছে—তারপর এখানে পড়তে এসেছে।

—কিছু না হোক, নিজের দেহটাকে তো সুন্দর করে রাখা যাবে; তাতেও যথেষ্ট তৃপ্তি আছে!—তুই বিধবা, আমিই বা বিধবার কম কি!—ছন্দা বললো।

—ছিঃ ছন্দা, এমন কথা বলতে নেই। তোর স্বামী কোন-না-কোন দিন তোকে আদর করে নিয়ে যাবেন। মানুষ আশায় আশ্বস্ত থাকে—তুইও থাক।

—নিয়ে যাবে—আমাকে? হুঁঃ! তুই যেমন পাঞ্চালী! কবে শুনবো ও আবার বিয়ে করেছে! এ দেশের পুরুষের কি কোনো দরদ আছে মেয়েদের উপর? তার থেকে বিধবা হলে বোঝা যায় যে স্বামী নেই, ভগবান কেড়ে নিয়েছেন।

ওর মনের সুর কোথায় উওপ্ত, বুঝতে পারছে পাঞ্চালী, কিন্তু তবুও দীর্ঘদিনের সংস্কার—ভারতনারীর স্বামীপরায়ণতা

আর সতীত্ব গৌরব ওকে ক্ষুণ্ণ করলো ছন্দার কথাটাতে। পাঞ্চালী একটু নীরব থেকে বলল,

—এসব প্রথার সংস্কার হবে দেশ স্বাধীন হলে। পুরুষের বহু বিবাহ নিশ্চয় ভাল নয়—আর.........

—শাশুড়ীর গঞ্জনা? উঃ, সে যে কি ভয়ানক, তুই বুঝবি না পাঞ্চালী—নরক!

হবে! পাঞ্চালী জানে না—শুনেছে। বহু বাঙ্গালী বধূ শাশুড়ীর গঞ্জনায় গলায় দড়ি দেয়—বিষ খায়, ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—নিত্যকার খবর।

—স্বামীর স্নেহভালবাসা পেলে মেয়েরা সবই সইতে পারে!—পাঞ্চালী বললো।

—সেইটাই যে পেলাম না মশাই—ছন্দা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।—তাহলে তো আর কথাই ছিল না। মা গুরুজন, তাঁর উপর স্বামী কথা বলবেন না। মাতৃভক্তির এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ কোথায় পাবি তুই? রামায়ণ মহাভারতে নেই।

পাঞ্চালীর মনটা ছোট হয়ে গেল যেন। কোনো কথাই ও আর বলছে না। পথের পাশে মোটা একগুচ্ছ নিশিন্দা ফুল ছিঁড়ে গুঁজে দিল সে ছন্দার মাথায়।

—বড্ড বিশ্রী গন্ধ পাঞ্চালীদি এই ফুলগুলোর!

—হ্যাঁ, কিন্তু বড্ড উপকারী—পাঞ্চালী বললো—গন্ধ ছাড়া আরো অনেক গুণ আছে ওর।

—কি গুণ? বরকে বশ করা যায়?—ছন্দা শুধুলো হাসতে হাসতে।

—হ্যাঁ, যায়। পাঞ্চালী বললো—এদের মত সহ্যশীলা হতে পারলে বরকেও বশ করা যায়।

—ফুৎ—ছন্দা বিদ্রূপ করে উঠলো—সহ্য আমি বিস্তর করেছি পাঞ্চালী। আগুনে তাতানো চিমটের ছ্যাঁকা পর্যন্ত,—তিনদিন জলগণ্ডুষ না পাওয়া পর্যন্ত—খিদের সময় পাতে নোংরা ফেলে দেওয়া পর্যন্ত—স্বামীমহারাজ রাতদুপুরে আড্ডা থেকে ফিরে বেদম প্রহারের আদরে পিঠ ফুলিয়ে দেওয়া পর্যন্ত—কিন্তু পারলাম না কখন জানিস?—যখন শাশুড়ী আমাকে একগা গয়না পরিয়ে নিমন্ত্রণবাড়ি নিয়ে গিয়ে বললো—"রূপ থাকলে কি হবে, ছেলেকে বশ করতে পারছে না বউ"—

—তাই বললো?—পাঞ্চালী অতিবিস্ময়ে শুধুলো!

—হ্যাঁ—জানবি কি করে? বাংলার ভক্তিভাজনীয় শাশুড়ী-মার অনেক গুণ।

—সবাই তা নয় ভাই, ভাল শাশুড়ীও বিস্তর আছেন!

—ভাল-কপালীদের আছেন হয়ত, আমার পোড়া কপাল কিনা!

কথা আর এগুলো না। পাঞ্চালীর মনটা যেন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছে। সটান ওরা চলে এল নন্দিতার বাড়ি। ঠাকুর ঘরে ছিল নন্দিতা, সাদর আহ্বান করলো। শঙ্করও ছিলেন ওখানে কিন্তু কোথায় উদয়ন? পাঞ্চালী এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—না কোথাও তো দেখা যাচ্ছে না? কৈ তিনি? মনটা কেমন যে পিপাসার্ত হয়ে আছে পাঞ্চালীর উদয়নকে দেখবার জন্য! কেন এমন হচ্ছে! হওয়া উচিত নয়—পাঞ্চালী দৃঢ় হতে চেষ্টা করছে

নন্দিতা ওদের কয়েকটা কাজের ভার দিয়ে সকলকেই শুনিয়ে বলল,

—কেউ একজন আমার সঙ্গে ভেতরে এসো—নৈবেদ্যগুলো আনতে হবে—পাঞ্চালী, তুমিই এসো তো মা—এসো নন্দিতা এগুলো।

পাঞ্চালী বুঝতে পারলো কথাটা বলার কৌশল। সে নীরবে চলতে লাগলো পিছু পিছু। নন্দিতা কাউকে জানাতে চায় না যে অপর মেয়ের থেকে পাঞ্চালীকে অধিক স্নেহ দিচ্ছে। ভেতরে এল দুজনেই।

—তুমি কি রণধীর বাবুর ভাইঝি? পরশু উদয় আশ্রম থেকে ফিরেই বললো যে তোমার কাকার সঙ্গে জেলে তাঁর পরিচয় হয়েছে। উদয় তাঁর কাছে এই আশ্রমের কথা বলেছিল—তিনি নাকি আজন্ম-বিপ্লবী?

—হ্যাঁ—মা—পাঞ্চালী অতি আস্তে জানালো—উনিই আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছেন আমার মা মারা যাওয়ার পর। বিয়ে করেন নি। উনি বাবাকে চিঠি লিখে আমাকে এখানে পড়তে পাঠান।

—এ খবর আমি জানতাম না পাঞ্চালী।

—আপনাকে জানাবার দরকার হয় নি মা।

—দরকার আছে মা—তোমার কাকার অপরিমেয় শক্তির কথা উদয় বলল আমাকে; তাঁকে আমাদের দরকার হবে এখানে।

—তিনি জেলে—পাঞ্চালীর কণ্ঠস্বর অশ্রুসিক্ত।

—তিনি মুক্তি পাবেন—আর দেরী নাই। তুমি তাঁর ঠিকানা জানো মা?

—না মা—কোথায় এখন তাঁকে রেখেছে, জানি না—হয় তো তাঁর ফাঁ—সী…

—ছিঃ মা!—না—ওসব ভাব কেন? কতদিন খবর পাও নি তাঁর?

—দু'মাসের উপর—তাঁর অপরাধ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। স্বয়ং বহু বিশিষ্ট শাসককে হত্যা—বহু দিনের বহু অভিযোগ আছে এমন।

—তা থাক্—উদয় গেছে কলকাতা; তাঁর খবরও আনতে পারে সে। আজই ফিরবার কথা, এই সাতটা-পঞ্চাশের ট্রেনে। চল, নৈবেদ্যগুলো নাও!

পাঞ্চালী যেন বিশেষ আশ্বস্ত হোল। উদয়ন কলকাতা গেছে, কাকার খবর আনবে—নিশ্চয় আনবে। রাজবন্দীদের তো দেওয়া হচ্ছে মুক্তি। কাকাও মুক্তি পেয়ে যাবেন—পাঞ্চালী হাতযোড় করে প্রার্থনা করলো একবার; তারপর নৈবেদ্যের থালা দুটো নিয়ে চলে এল ঠাকুরঘরে। এই মাত্র ছয়টা ত্রিশ—এখনো ট্রেনের দেরী আছে, তারপর অতখানি রাস্তা আসবে উদয়ন—দশটা বেজে যাবে নাকি আসতে তার? পাঞ্চালী আপন মনে ভাবছে পূজোর কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

গ্রামেরও কয়েকটি মেয়ে রয়েছে ওখানে। পাঞ্চালী বুঝতে পারছে না, কেন এমন করে হঠাৎ পূজো দেওয়া হচ্ছে ঠাকুরের। নন্দিতাকে শুধুলো,

—আজ এ উৎসবটা কেন হচ্ছে মা ? কারো জন্মদিন ?

—না মা—উদয় মুক্তি পেয়ে ঘরে এলো, তারই জন্য। দেশের সব ছেলে মেয়ে মুক্তি লাভ করুক, শ্রীভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাতে চাই।

দেশের সব ছেলে-মেয়ের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি-কামনায় এই পূজা। কারাবাসীরা মুক্তি লাভ করুন—কিন্তু ঐ যে ছন্দা; কে দেবে ওকে মুক্তি? কোথায় মুক্তি অভাগী পাঞ্চালীর? ভগবান—মুক্তি কি আছে এদেশে? পাঞ্চালীর দীর্ঘশ্বাসটা শূন্যে বিলীন হয়ে গেল—সহস্রাব্দীর সঞ্চিত কালিমা এই জাতির অন্তর-তলে; কে তাকে মুছে পরিষ্কার করবে? কবে? রাজনৈতিক মুক্তি হয়তো আসবে একদিন, কিন্তু মানুষের মুক্তি, মনের মুক্তি, মানবত্বের মুক্তি। আসবে? নিপীড়িত অন্তর কোনোদিন পরিত্রাণ পাবে সমাজ-সৌন্দর্যের রাজপথে—ব্যক্তিগত জীবনের সুষমায়—আত্মগত জীবনের উন্নতিতে?—পাঞ্চালী ভাবতে লাগলো।

ঠাকুর ঘরের বাইরের বারান্দায় বহু লোক জমেছে প্রা[illegible]।

সকলেই এ বাড়ির অতিথি এবং সকলেই [illegible]ীয়। পাঞ্চালী ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো—কত লোক, কত রককের লোক; পাড়ার কার বাড়ি থেকে এনে একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে—জোর-আলো—অকস্মাৎ সেই আলোকলেখার অত্যুজ্জ্বলতায় এসে দাঁড়ালো এক তরুণী—অসামান্যা সুন্দরী—অনুভা দেবী! পিছনে উদয়ন ঝোলা হাতে।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল লোকগুলোর—বাঃ, কী সুন্দর!

—এসো মা, এসো—শঙ্কর ডাক দিলেন—নন্দ, অনু এসেছেরে!

—অনু? অনুভা? এসো মা!—নন্দিতা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল বাইরে! জরীর জুতো খুলতে দেরী লাগছে অনুভার। কিন্তু খুলে ফেললো শেষ তক। প্রণাম করলো শঙ্করকে, নন্দিতাকে, আর নমস্কার করলো লোকগুলোকে। ধন্য হয়ে গেল গ্রামবাসী সব। পূজার প্রসাদ নিতে এসে চোখের এমন প্রসন্নতা লাভ হবে, জানাই ছিল না ওদের। —বাঃ, চমৎকার!

—তুমি এলে মা, বড় আনন্দ হোল আমার—নন্দিতা বললো অনুভাকে।

—না এসে পারলাম না মাসিমা। অনেকবার এখানে এলেও ঠাকুর ঘরে আসিনি।

মৃদু হাসলো অনুভা—তা বলে ভাববেন না, আপনার এই মেয়ে ঠাকুর-দেবতা মানে না। ও না মেনে উপায় নেই আমাদের।

—হ্যাঁ, মা, ও সংস্কার আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। স্নান করবে না?

—না—হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়বো শুধু—অনুভা বললো।

—পাঞ্চালী, একে ভেতরে নিয়ে চলো তো মা—আমিও যাচ্ছি, চলো।

পাঞ্চালী!—কে মেয়েটা? নাম যেন শোনা অনুভার। তীক্ষ্ণ তীর্যক দৃষ্টিতে চাইল অনুভা অর্ধমলিন বস্ত্রাবৃতা শ্যামলাঙ্গী পাঞ্চালীর পানে। হাজার ওয়াট্‌সের বিদ্যুৎবাতির আলোতে গৃহদীপ যেন গুপ্ত হয়ে গেছে—না, গৃহদীপ মঙ্গলদীপ—পাঞ্চালী ঠাকুরের জন্য চন্দন ঘষে ছোট বাটিটায় তুলছে—করাঙ্গুলী থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাতের ভঙ্গিটুকু যেন মৃৎপ্রদীপ—আস্তে উঠে এল কাজ সেরে।

—চলুন—পাঞ্চালী বললো এসে অনুভাকে।

অনুভা আর একবার চাইলো পাঞ্চালীর আপাদমস্তকের পানে। বিধবা—না কুমারী, না বিবাহিতা? বুঝতে পারছে না অনুভা ঠিক। এগিয়ে চললো। জরীর জুতো জোড়া পরতে আবার সময় লাগবে—কিন্তু অকস্মাৎ পাঞ্চালী ওর জুতোদুটি হাতে নিয়ে বলল—আসুন—পা ধুয়ে পরবেন।

ঝি নাকি মেয়েটা? হাতেই নিল জুতো দুটো? কিন্তু ঝি ও নয়। ওর সর্ব অবয়ব জানিয়ে দিচ্ছে—ও যদি ঝি [illegible] তো রাজর্ষি ঝি না হলেও ঋষির ঝি! কী শান্ত, কী [illegible]—কী উদাস ওর তনু-তনিমা!

অনুভা ধীরে চলে এলো ওর পিছনে পিছনে। বাসবাড়ির দরজার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে শুধুলো—তুমি—আপনি কি গ্রামেরই মেয়ে?

—না, আমি আশ্রমের মেয়ে—পড়ি।

—অরুর কাছে যেন নাম শুনেছিলাম, মনে হচ্ছে আপনিই তো?

—হ্যাঁ—ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেদিন। এইদিকে কূয়ো—আসুন।

তাহলে এ-ই, যার কথা অরু বলেছিল সেদিন। অনুভা কূয়োতলায় এলো। পাঞ্চালী সযত্নে তার জুতো জোড়া এক যায়গায় রেখে শুধুলো,

—আপনার কাপড় জামা কোথায়?

—সুটকেশে আছে—আপনিই আনবেন?

—হ্যাঁ—পাঞ্চালী চলে গেল অনুভাকে কূয়োতলায় রেখে।

উদয়ন এসেছে, কিন্তু পাঞ্চালীর কাকার খবর কি এনেছে সে? যদি এনেছে তো বললো না কেন? ভুলেই গেছে নাকি বলতে? কিংবা খবরই নেয় নি কাকার? নেয় নি খবর! এই অনুভা-অরুন্ধতীর কাছেই সময় কেটে গেছে তার—জেলের খবর কি আর নিতে গেছেন উনি? অনুভার সুটকেশটা নিয়ে এল পাঞ্চালী কূয়োতলায়।

নন্দিতা ভোলে নাই; পাঞ্চালীকে ভেতরে পাঠিয়ে উদয়নকে ডেকে শুধুলো,

—তুই কি পাঞ্চালীর কাকার খবর জেনেছিস উদয়?

—হ্যাঁ মা, জেনেছি; তিনি বাংলার বাইরে আছেন। তাঁর ছাড়া পেতে দেরী আছে।

—ছাড়া পাবেন তো?

—তা ঠিক বলা যায় না; তাঁর বিরুদ্ধে বহু দিনের বহু অভিযোগ তো আছেই, কিছুদিন আগে তিনি জেলের মধ্যে

কারা-সংস্কার আন্দোলন করে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন—সে অপরাধের বিচার এখনো হয়নি।

—ফাঁসী-টাসী হয়ে যাবে না তো ?—ব্যগ্রভাবে শুধোলো নন্দিতা।

—ইংরাজের হাতের ফাঁসী তাঁদের বরমাল্য মা, হয় যদি তো কি আর হবে !

—কিন্তু মেয়েটাকে তিনিই নাকি মানুষ করেছেন—নন্দিতার চোখে কারুণ্যের উৎস।

—এর পর থেকে তোমার স্নেহ ওকে বেশি করে দিও মা—উদয়ন হাসলো।

—তা হয় না উদয়—আর পাঁচটা মেয়ের থেকে বেশি স্নেহমমতা ওকে দেবার অধিকার নেই আমার—তাছাড়া, মা, বাবা, কাকার যায়গা পূরণ হয় না।

—হয় মা—ছেলেদের না হোক, মেয়েদের হয়। এদেশের মেয়ে শ্বশুরবাড়ীর সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে দিব্যি মা, বাবা, কাকা পেয়ে যায়, ভাইবোন পায়—নিজের কাকা, বাবা তখন পর হয়ে ওঠে।

উদয়ন শঙ্করের ডাকে বাইরে গেল, কিন্তু কি বলে গেল ! পাঞ্চালীকে সেরকম অধিকার কি করে দিতে পারে নন্দিতা ? না, পারে না। পাঞ্চালী বিধবা, আশ্রমের কন্যা—এবং···নন্দিতা প্রায় দু'তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে ঘরের দিকে এগুলো অনুভার তদ্বির করবার জন্য। অনুভা অকস্মাৎ কেন এলো এখানে ? উদয়নকে কি তার ভাল লেগেছে কিংবা উদয়নই

তাকে ডেকে এনেছে নিজের ভাল লাগার জন্য! অনুভা ভাল লাগার মত মেয়ে, কিন্তু তার ভাল না লাগলে সে নিশ্চয় আসতো না। অথচ ইলা বলে গেছে, অনুভার সঙ্গে কোন্ এক গুপ্তপুত্রের নাকি হৃদ্যতা জন্মেছে, বিয়ে হবে। নন্দিতা যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে একটু। কিন্তু সে চিরদিন ঈশ্বর-বিশ্বাসিনী—তিনি ভালই করবেন, ভেবে আশ্বস্ত হোল!

—পাঞ্চালী! কোথায় মা তোরা?

—এই যে মা—পাঞ্চালী সাড়া দিল কূয়োতলা থেকে। জ্যোৎস্না মেঘঢাকা, কিন্তু তাতেই দেখা যায়, পাঞ্চালী কলাগাছের কাছে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একা। ওকে ঠিক বল্কলবসনা বন-কন্যার মত দেখাচ্ছে।

—অনুভা কৈ? নন্দিতা এগিয়ে আসতে আসতে শুধুলো।

—স্নান করছেন—চাঁচ দেওয়া স্নানের জায়গাটা দেখিয়ে দিল পাঞ্চালী।

—তোমার কাকা ভাল আছেন মা, ভেবো না। তবে এখনও মুক্তি পান নি।

—কোথায় আছেন? আলিপুর জেলে?

—না, বাংলার বাইরে। রাজবন্দীরা সবাই মুক্তি পাচ্ছেন, উনিও পাবেন।

—ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বড় কঠিন মা; আমি জানি, হয়তো…

না মা, ভাবনা কি? যাই হোক, তোমার দুর্বল হওয়া চলবে না। ভেবে দেখ, তুমি তাঁর হাতের তৈরি মেয়ে—ইস্পাতের মত কঠিন হতে হবে তোমাকে।

নন্দিতা ওর মাথাটা বুকের কাছে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে। পাঞ্চালী সামলে নিল। ইতোমধ্যে অনুভা স্নান ঘর-থেকে বেরিয়ে এসে বলল,

—কি হয়েছে মাসিমা? কে মুক্তি পায়?

—এই মেয়েটির কাকা—ওকে মানুষ করেছেন তিনিই; জেলে আছেন।

—ওঃ, তার জন্য এখন আর ভাবতে হবে না মাসিমা, ওরা সব ছাড়া পেয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই কামনা করি—আয় পাঞ্চালী, এসো অনুভা।

'আয় পাঞ্চালী' কথাটার মধ্যে যে গভীর আত্মীয়তার ঝঙ্কার, আর 'এসো অনুভা' কথাটায় যে আতিথ্যের অনুরঞ্জন, এ দুইয়ের তফাতটা যেন অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো অনুভার কানে। কিন্তু ও আশ্রমের মেয়ে, ও হয়তো অনেকবার এখানে যাতায়াত করার জন্য নন্দিতা ওকে 'তুই' বলেই ডাকে; তাতে আত্মীয়তা না বোঝাতেও পারে। আর আত্মীয়া কমই বা কিসে অনুভা! পাঞ্চালীর সাথে এদের ক'দিনের পরিচয়! অনুভার সঙ্গে পরিচয় কত বছরের।

ভাবতে ভাবতে ভিজে কাপড় ছাড়লো অনুভা। ওর দীপ্ত যৌবনশ্রী মেঘাবৃত চন্দ্রালোকেও অপরূপ হয়ে উঠেছে—অনুভা সর্বাঙ্গ সুন্দরী! কথাটা ভাবতে ভাবতে নন্দিতা অনেকটা এগিয়ে গেল ঘরের দিকে, কিন্তু অনুভার বাহ্য সৌন্দর্য যতই হোক, অন্তরের কোন পরিচয়ই পায়নি নন্দিতা আজও। পাঞ্চালীরও খুব বেশি পায়নি পরিচয়, তবু বেশ বোঝা যায়,

পাঞ্চালী সুষমাময়ী, অন্তরে এবং বাহিরেও। কিন্তু পাঞ্চালী বিধবা, আশ্রমের মেয়ে; উদয়নের সঙ্গে তার বিয়ে—ছিঃ—নন্দিতা কি আশ্রমে ম্যাট্রিমোনিয়েল বুরো খুলেছে নাকি—নাকি বিধবা বিবাহ আফিস! তা হয় না—হয় না, হয় না—না।

—আমি যাই মা ঠাকুরঘরে—সুটকেশটা ঘরের বারান্দায় নামিয়ে বলল পাঞ্চালী।

—হ্যাঁ, যাও তুমি—নন্দিতা বিদায় দিল ওকে। অনুভাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

এক মুহূর্তের জন্য চেয়ে দেখলো পাঞ্চালী, এখানে তার ঠাঁই নেই। সে বিধবা, আশ্রম-বাসিনী, অসহায়া। ঠাকুরের চরণতলেই তার সত্য ঠাঁই! জ্যোৎস্নার আলোআঁধারী আলপনার ভেতর দিয়ে চলে এল পাঞ্চালী বাইরে। দূরে নদী-কিনারে কাশবন দেখা যাচ্ছে, নাকি সাদা বালুবেলা! কাশ ফুলও হতে পারে—আবার শ্যামলতাহীন বালুকাও হতে পারে! যাই হোক—সুন্দর! ঈশ্বর মরুভূমিতেও সৌন্দর্য করেছেন, যেমন করেছেন অরণ্যে, সাগরে, উদ্যানে! না—উদ্যান মানুষের সৃষ্টি—যেমন কৌমার্য ঈশ্বরের সৃষ্টি, বৈধব্য মানুষের! কিন্তু ভেবে ফল নাই, মানুষের জগতে মানুষের সৃষ্টিকেই মেনে নিতে হবে—নইলে বাঁচা চলে না। অরণ্য কেটে মানুষ উদ্যান গড়েছে—অরণ্যের প্রতিবাদ একান্তই ব্যর্থ করে!

পাঞ্চালী নিজকে অতি সাবধানে সম্বৃত করে নিল যেন শুক্তি তার সারা দেহটাকে গুটিয়ে নিল খোলের মধ্যে। হোমাগ্নি

জ্বলে উঠেছে ঠাকুর ঘরে; উদয়ন দাঁড়িয়ে সেখানে। আলোক-শিখায় দেখা যাচ্ছে ওকে বীতিহোত্ররূপী—বীর্যাগ্নি!

পাঞ্চালী ধীরে এসে ঠাকুর ঘরেই ঢুকলো।

পূর্ণাহুতি হচ্ছে; উদয়নের আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি অগ্নির আলোকে দীপ্যমান! অনুভা অত্যন্ত কাছে ঘেঁসে রয়েছে ওর। ভাগ্যবতী অনুভা! ও কুমারী, ওর আশা অন্তহীন আশ্বাসে পরিপূর্ণ—ও ঈশ্বরের সৃষ্টি এখনও; মানুষ এখনো ওকে সমাজ-কুঠারের আঘাতে আহত করেনি।

শেষ হোল আহুতি; দিব্য সৌরভে পূর্ণ হয়ে উঠেছে মন্দির। এবার প্রসাদ বিতরণ হবে। যজ্ঞতিলক পরিয়ে দিলেন পুরোহিত ঠাকুর উদয়নের ললাটে—অন্য সকলের কপালেও ফোঁটা দিলেন; পাঞ্চালী সভয়ে সরে এলো। কে জানে, ওটা তার নিতে আছে কি নাই! হয়তো নিতে নাই, কারণ, হিন্দু বিধবার সবেতেই তো মানা, শুধু বেঁচে থাকতেই মানা নেই তার। খাও—না খাও, বেঁচে থাক, কেউ বারণ করবে না।

উদয়ন দেখলো পাঞ্চালীর চলে যাওয়া। নন্দিতা সকলকে প্রসাদ দেবার ব্যবস্থা করছে, পাঞ্চালী গিয়ে তার সাহায্যে লাগলো। অনুভা বড়লোকের মেয়ে, দিনেকের জন্য এসেছে; নন্দিতা খাটুনির কাজে তাকে ডাকতে ভরসা করে না। কিন্তু অনুভাই বললো উদয়নকে,

—আমিও যাব নাকি প্রসাদ বাঁটতে?

—থাক, ওঁরাই পারবেন।

অনুভা আর কিচ্ছু বললো না। সে যেতে চায় না ঐ নোংরা কাজে। শুধু উদয়নকে জানিয়ে দিল, সেও যাবার জন্য প্রস্তুত আছে। অর্থাৎ উদয়ন বুঝুক যে অনুভা এদের কারু থেকে কোনো অংশে কম নয়। উদ্দেশ্য সফল করে একটু হেসে বলল—ঐ যে মেয়েটি, ও বিধবা—না?

—হ্যাঁ—উদয়ন ছোট উত্তর দিল, তারপর বাইরে এল অতিথিদের কাছে।

অনুভা একা পড়ে গেল এবার। শুধু পুরোহিত ঠাকুর রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কী কথা বলবে অনুভা? নিরুপায় হয়ে সে হোমের আগুনে পোড়া কলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। ওটা আগুনে ফেলে দেওয়া হোল কেন? খেতে? অতিথিরা নাকি খাবেন ঐ কলাপোড়া?—হেসে ফেলল অনুভা!

কিন্তু মনে পড়লো, হাসা উচিত নয়। কয়েকদিন আগেই সে মামার বাড়ি গিয়ে মামিমার পূজোর ব্যাপার দেখে এসেছে। সেদিন মনে তার কি যে হয়েছিল, কে জানে! অমন আকস্মিক ভাব-বিপর্যয় কম হয় তার; তবু হাসা উচিত নয়। অবশ্য ঠাকুর দেবতা আছেন, তবে কলাপোড়া খেতে নিশ্চয় আসেন না তাঁরা। কিন্তু উদয়নের মত পণ্ডিত লোকও এই সমস্ত মানে; শুধু মানে নয়, রীতিমত ভয়-ভক্তি করে মানে, দেখা যাচ্ছে। তা হোক—ও যা মানে মানুক; ওকে বড্ড ভালো লাগছে অনুভার। ঈশ্বর-বিশ্বাস, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কারো থাকে, কারো থাকে না। কিন্তু মানবীয় প্রেম প্রত্যেকের আছে, তাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। অনুভা বাইরে তাকালো

—জ্যোৎস্নালোকে উদয়নকে আব্ছা দেখা যায়। দীর্ঘ, ঋজু, উন্নত মস্তক উদয়ন! যেন সূর্য! অনুভা বিস্তর পুরুষ দেখেছে, কারো পানে ও আকর্ষিত হয় নি। উদয়ন যেন চুম্বক পাথর। দেখামাত্র অনুভার মনটাকে……

—চল মা, তুমি প্রসাদ নেবে—নন্দিতা ওর মাথায় আশীর্বাদ ঠেকিয়ে ডাক দিল। নিঃশব্দে চলে এল অনুভা পিছনে। দেখলো, মেয়েরা সবাই দাঁড়িয়ে, পাঞ্চালীও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার দেখলো অনুভা। ওর কাছে এসে বলল—আমি কাল যাব আপনাদের আশ্রমে।

—বেশতো, যাবেন।—বলল পাঞ্চালী।

—আমার বোনের সঙ্গে আপনার এত ভাব, আমার সঙ্গে তো ভাব হোল না?

—অ-ভাব তো কিছু নেই ভাই—পাঞ্চালী ম্লান হাসলো।

—অ-ভাব না থাকা, আর ভাব থাকা এক নয় কিন্তু!

—অ-ভাব না থাকলে ভাব হতে পারবে; তার জন্য কিছু সময় লাগে তো!

—আচ্ছা, কাল হবে—বলে অনুভা প্রসাদ নিতে খেতে গেল সকলের সঙ্গে। নন্দিতা সকলকেই দিল প্রসাদ—দাঁড়িয়ে খাওয়ালো, তার পর আশ্রমের বাকি মেয়েদের জন্য একটা বড় থালায় সাজিয়ে দিল কিছু মিষ্টান্ন। ওরা নিয়ে যাবে। কিন্তু রাত অনেক হয়েছে। এতখানা পথ এই মেয়ে ক'টিকে এমন ভাবে ছেড়ে দিতে পারে না নন্দিতা। উদয়নকে ডেকে আদেশ করলো—তুই ওদের পৌছে দিয়ে আয়।

—থাক মা, উনি ট্রেনে এসেছেন।—পাঞ্চালী বলল—ওঁকে আর কষ্ট দেব না।

—এর থেকে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করা বিপ্লবীদের অভ্যাস আছে পাঞ্চালী।

উদয়ন বলল কথাটা ; পাঞ্চালী মুহূর্ত না ভেবেই বলল,

—সে কষ্ট দেশমাতার জন্য অবশ্য করনীয়—শ্লাঘ্য, শ্রেয়।

—মাতৃজাতিকে নিরাপদে রক্ষা করাও কি শ্লাঘ্য নয়? উদয়ন বলল।

দপ্ করে জ্বলে উঠলো পাঞ্চালী অকস্মাৎ। দীপ্ত কণ্ঠে বলল,

—থামুন! ঐ আসুরিক শক্তির অহমিকা মানাচ্ছে না। মাতৃজাতিকে শুধু চোর-ডাকাত-গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করাই বড় কাজ নয়। সেটা চৌকিদারের কাজ। লক্ষ নারীর অন্তরের-আর্তনাদ কে শুনতে পায়? ক'টা ছেলে এগিয়ে আসে শাশুড়ির হাত থেকে বউকে বাঁচাতে? সমাজের পীড়ন থেকে লাঞ্ছিতাকে বাঁচাতে? বৃদ্ধের তৃতীয় পক্ষ করার লোভ থেকে বাঁচাতে ক'টা মানুষ আছে এদেশে? শুধু গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য যে শক্তি, সে শক্তি দানবীয়, তাতে দেবত্ব নেই।

উদয়ন স্তব্ধ বিস্ময়ে মূক হয়ে গেছে যেন। পাঞ্চালী বলল,

—হাজার মেয়ের চোখের জলে ভেসে যায় অন্তর, কে দেখে? কে দেখে, কোথায় কোন্ অভাগীর মাতাল স্বামীর লাথির ঘায়ের আর্তনাদ—কে জানতে চায় শ্মশানঘাটে সীঁথির সিঁদুর

ধুয়ে আসার পরের করুণতম ইতিহাস ?—শুধু গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা—ও তারা নিজেরাও পারে !

—পাঞ্চালী······উদয়ন কথা বলতে গেল।

—গুণ্ডারা শেয়াল কুকুর—তারা মাংস খায়। আপনাদের সভ্য মানুষের সমাজ খাচ্ছে মনুষ্যত্ব। প্রতিকার নেই। যুগ-যুগান্তের অনুশাসন। থাক্, অনাহারে মৃত মানুষের শ্মশানে আর সোনার মিনার না তোলাই ভাল !—পাঞ্চালী আত্মসম্বরণ করলো অকস্মাৎ।

উদয়ন যেন নিবে গেছে। চেষ্টা করে গলায় স্বর এনে বললো,

—আজন্ম বিপ্লবী রণধীরের মানস-দুলালীর কাছে এই অহমিকা প্রকাশ সত্যি অপরাধ পাঞ্চালী—মাফ করো !

পাঞ্চালী মাথা নামালো—মিষ্টির থালাটা তুলে নিল হাতে, তারপর সঙ্গীনীদের বলল—চল্ সব। নন্দিতাকে আর অনুভাকে বলল,

—যাই মা—যাই ভাই। বেরিয়ে গেল পাঞ্চালী সদলবলে।

স্তব্ধ হয়ে রয়েছে নন্দিতা, উদয়ন, অনুভা,—যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেছে। ঐ ধীর, শান্ত দেহবল্লরী—ও যে অশনি ভরা বিদ্যুৎ ! নন্দিতা উদয়নের কথা ভাবছে, ডাকল—উদয়ন !

—মা, একদিন রণধীর বলেছিলেন আমায়, মেয়েটার রক্তের কণায় কণায় বিপ্লব তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন; সত্যি মা ! ও অগ্নিময়ী—বহ্নিকন্যা !

অনুভাই বলল উদয়নের কথার প্রতিধ্বনি করে—সত্যি !

আশ্রমে পৌঁছে পাঞ্চালী পেল একখানা চিঠি—হাতে এসেছে। কখন এসেছে, কেউ জানে না—ঘরের জানালা দিয়ে কে তার বিছানায় ফেলে রেখে গেছে। চিঠিখানা কাকার লেখা, খাম হাতে নিয়েই সে বুঝতে পারলো। মোমবাতিটা জ্বেলে খুললো চিঠিখানা—কাকার সুন্দর হস্তাক্ষর :—

স্নেহের পাঞ্চালী মা,—

এই চিঠিই হয়ত শেষ চিঠি আমার—কান্নায় ভেঙে পড়িস না মা—তোকে বজ্রগর্ভ মেঘরূপে গড়েছি—আকাশের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে হবে তোর যাত্রা—বজ্রে, বিদ্যুতে, বর্ষণে—বিপর্যয়ের আবর্তের অন্ধকারে! তারপর যখন উদয়-ভানুর আলোলেখা দেখা দেবে আকাশের প্রাচীপ্রান্তে—তখন তুই হোস সীমাহীন আকাশের মতই অচঞ্চল—শরত মেঘের মত সজল-স্নিগ্ধ—অরোরার আলোর মত অপার্থিব।

আমি যেদিন জন্মেছিলাম, মার মুখে শুনেছি, সেদিন নাকি ভূমিকম্প হয়েছিল, আর কম্পন-বেগে ভীতা মা আমার মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন; ঠিক সেই সময় আমি মৃন্ময়ী মা'কে স্পর্শ করি। মাতা ধরিত্রী থর থর কাঁপছিলেন তখন। সারা বাড়ির লোক বলেছিল, "ছেলেটা মহা অকল্যাণ ডেকে আনবে"—কিন্তু মা নাকি মূর্ছা ভঙ্গের পর আমাকে কোলে না নিয়ে মাটিতেই শুইয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"এই ছেলেকে পেয়ে ভারতমাতা আনন্দে শিউরে উঠেছেন—নাও মা ভারতজননী, তোমার ছেলে তোমাকে দিলাম"—তারপর থেকে মাটি খেয়েই মানুষ হয়ে উঠলাম, কারণ মা অতি অল্পদিন

পরেই চলে যান আমাকে মাটি-মায়ের কোলে দিয়ে। কিন্তু এসব পুরানো কথা মা পাঞ্চালী, তুই বহুবার শুনেছিস। দুরন্ত হয়ে উঠেছিলাম জন্ম থেকেই। মাতৃহারা বলে, ঠাকুমা-বাবা-দাদাদের আদর বেশী ছিল, কিন্তু কেউ আমায় স্নেহে বাঁধতে পারে নি। চির মুক্ত হয়ে আমি জন্মভূমি-মাতার মুক্তির সাধনাই করতে চেয়েছি—কিন্তু তোর মা যখন তোকে আমার কোলে দিয়ে বলে গেলেন—'ঠাকুরপো, এই রইল তোমার পাঞ্চালী—আমি চললাম'— তখন তোর কচি মুখের পানে চেয়ে ভেবেছিলাম চির মুক্ত আমাকে বন্দী করলো অভাগী এই মেয়েটা।

তারপর তোকে গড়ে তোলার পালা। তোর অন্তরের অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দিয়েছি বিপ্লব, বহ্নি, বজ্রগর্জন, ধ্বংসের শূল! কিন্তু থাক সে কথা—নিজকে কঠোর কর মা—শোন,—

আমাদের কয়েক জনের ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেছে…… কাঁদিসনে পাঞ্চালী, কেঁদে বুক ভাসাবার জন্য তোকে তৈরি করিনি আমি। জেগে থাক—তোর উদ্যত পাশুপত নিয়ে জেগে থাক—তোর কাকার সবটুকু শক্তি তোর শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে যেন তোর রক্তেই আশ্রয় পায়!

এ পৃথিবীতে আর কারো বন্ধন মানি না আমি—মরতে তাই দুঃখ নেই। শুধু তোর কথা ভেবে মরতে আমার ভয় করছে পাঞ্চালী; কেন জানিস্—? এই হতভাগা দেশেরই মানুষের হিংস্রতার জন্য, কদর্যতার জন্য, বর্বরতা আর কাপুরুষতার জন্য! সম্রাটের দয়া ভিক্ষা করে হয়তো বেঁচে যেতে পারতাম, কিন্তু

দয়ার জীবন তো মাতা ভারতের কোনো কাজে লাগবে না, তাই ও প্রলোভন ত্যাগ করেছি। শুধু তোর মুখখানা বারবার মনে পড়ছে—কিন্তু মা পাঞ্চালী, মরণকালে মাতা ভারতের বন্দিনী মূর্তির পাশে যেন তোর ধ্বংস-শূলহস্তা মূর্তিটি মনে জাগে—তাহলেই আমি মরণে তৃপ্তি পাব।

এবার কাজের কথা—উদয়ন হয়ত ফিরেছে; তাকে আমি তোর কথা বলেছিলাম জেলেই, আর তারই মুখে ঐ আশ্রমের কথা শুনে তোকে ওখানে পড়তে পাঠিয়েছি। তোর অন্তর ওখানে আরো সজাগ হবে, আরো দৃঢ় হবে, আরো জ্যোতির্ময় হবে—এই আশা!

আগামীকাল মধ্যরাত্রের পর আমাদের কয়েক জনকে যেতে হবে এই পৃথিবীর থেকে; কোথায় যাব, কোন্ লোকে, জানি না —যদি মৃত্যুর পরেও পৃথিবীতে থাকার কোনো উপায় থাকে—তাহলে নিশ্চয় জানিস—তোর কাকা এই পৃথিবীতেই আছে—হোক সে জলাভূমি, হোক জঙ্গল, হোক শ্মশান। কিন্তু কাঁদিস নে মা—চণ্ডিকা রূপে পুরুষের পৌরুষকে জাগিয়ে দিয়ে বলিস—

"অহং রুদ্রায় ধণুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ—"

বেঁচে থাক—জেগে থাক—জলে থাক জলদর্চি লেখার মত —অজপার জপের মত!

আশীর্বাদক—কাকামণি।

পাঞ্চালীর দু'চোখে দু'ফোঁটা জল, নাকি অগ্নিময় রক্তকণা! মোমবাতীর কম্পিত আলোকে বিন্দুদুটি অগ্নিগোলকের মত জ্বলছে। দু'চোখে দু'টি বহ্নিকন্যা…কিন্তু—

পাঞ্চালী চোখ বুঝে রইল আধমিনিট—দু'টি বিন্দুই ঝরে পড়লো চিঠিটার খামের উপর। কাল মধ্য রাত্রের পর কাকার ফাঁসী হবে! এখনো প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আছে কাকা পৃথিবীতে। চব্বিশটা পুরো ঘণ্টা—অনেক সময়। পাঞ্চালী কি কাকাকে একবার চোখের দেখা দেখবে না? দেখতে কি দেবে না ওরা, যদি পাঞ্চালী সেখানে পৌঁছতে পারে?—

কাকামণি!—পাঞ্চালী উবুড় হয়ে পড়লো মেঝের উপর—চিঠিটা বুকের তলায়।

না—পাঞ্চালীর কাঁদলে চলে না; যেতে হবে। দেখতে হয় তো দেবে ওরা। পাঞ্চালী শুনেছে, ফাঁসীর আসামীর শেষ সাধ নাকি পূরণ করা হয়, শেষ সময় নাকি আত্মীয়দের দেখতে দেওয়া হয়। হয়তো সত্যি নয় একথা, তবু যাবে পাঞ্চালী।

—উঠে বসলো পাঞ্চালী—যাবে সে, যাবেই। কাকাকে শেষ বারের দেখা না দেখে সে বেঁচে থাকবে কি করে? কাকার শেষ আদেশই বা পালন করবে কি করে? যেতে হবে, যত দূরেই হোক, যেমন করেই হোক, যেতে হবে। পাঞ্চালী উঠে দাঁড়ালো।

খামখানার উপর চোখের জল পড়েছে—মোমবাতীর আলোতে আগে দেখতে পায়নি পাঞ্চালী। কপিং পেনসিলের লেখা কি যেন একটা অক্ষর ফুটে উঠলো খামের উপর। কী? পাঞ্চালী কুজোর জল দিয়ে ভিজিয়ে নিল খামখানা—লেখাটা ফুটে উঠলো—

"আমরা ওঁকে জেল ভেঙ্গে বাইরে আনবো; তুমি এসে আমাদের পরিচালনা কর পাঞ্চালী, এসো, অবিলম্বে!

চণ্ড-সংঘ।"

পাঞ্চালী হেসে উঠলো নিঃশব্দে। আকাশে মেঘ জমেছে—বাতাস বইছে জোরে—রাত কিন্তু শেষ হয়ে এল। রাত শেষ হবে—এই দীর্ঘ-রাত্রির তপস্যার পর দিন আসবে—সূর্যকরোজ্জ্বল সুন্দর দিন; কিন্তু কাকাকে তখন আর দেখা যাবে না—না, যাবে পাঞ্চালী, এক্ষুনি বেরুবে। উদ্ধার করবে কাকাকে কারাগার থেকে।

যত সত্বর পারে পাঞ্চালী গুছিয়ে নিল; কিন্তু মনে পড়লো আশ্রমের কর্ত্রী ছোটমাসিমাকে একবার বলা দরকার—নইলে তার চরিত্রে কলঙ্ক পড়বে—আর তার চরিত্রে কলঙ্ক—তার অর্থই তার নিষ্কলঙ্ক কাকার আদর্শের অবমাননা।

পাঞ্চালী ছোটমাসির ঘরের দরজায় এসে ডাক দিল—ছোটমাসিমা—ছোটমাসিমা!

অত ভোরে উনি উঠেন না—ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে বললেন—কে—কি চাও?

—আমি পাঞ্চালী—একবার উঠুন ছোটমাসিমা, আমার কাকার আজ ফাঁসী হয়ে যাবে। আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি, এই ভোর চারটে পঞ্চাশের ট্রেনে—ছোটমাসিমা!

পাঞ্চালী এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলো। নিদ্রাকাতর ছোটমাসির কানে সব কথা

পৌঁছলো কিনা কে জানে! ঘুমের ঘোরেই তিনি বললেন—আচ্ছা!

পাঞ্চালী ছুটে বের হয়ে এল—ছোট এ্যটাচি কেশটা হাতে। বৃষ্টি তখন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু মাঠের সোজা পথ পাঞ্চালীর জানা। এক্ষুনি পৌঁছে যাবে স্টেশনে—চারটা পঞ্চাশের ট্রেন ধরবে—ধরবেই!

অন্ধকার আকাশকে বিদীর্ণ করে একটা বিদ্যুৎলেখা ওকে আলো দেখালো—হ্যাঁ, ঐ তো পাঞ্চালীর যোগ্য আলো! স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ তার জন্য নয়—সে বহ্নিকন্যা, প্রলয়ের পথচারিনী!

উৎসব শেষ হয়ে গেছে; অনুভা তার জন্য নির্দিষ্ট কুঠরীটায় এসে শুয়েছে। বাগানের দিকে এই ঘরটা—ঘুমহারা চোখে চেয়ে আছে অনুভা। উদয়নকে সে পেতে পারতো—হয়তো এখনো পারে। তার মত মেয়ের পক্ষে উদয়নকে আকর্ষণ করা খুব কঠিন নয় হয়তো, কিন্তু......অনুভা ভারছে, ঐ যে অগ্নিময়ী বহ্নিকন্যা—হোক সে বিধবা, হোক সে শ্যামলাঙ্গী, হোক সে আশ্রম-বাসিনী—বহ্নি বহ্নিই! চণ্ডালের গৃহেও তার অশুচিতা নেই! ওকে অতিক্রম করে উদয়নের কাছে পৌঁছাবার মত জ্যোতি তার আছে কি? জ্যোতি হয়তো আছে, কিন্তু পবিত্রতা? প্রাণশক্তি? প্রেমধর্ম?—না, অনুভা নিজেই যেন স্বীকার করে বসলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চঞ্চল কণ্ঠে বলল, নেই বা কেন? আছে, থাকা উচিত। উদয়ন যদি সূর্য হয় তো অনুভা তার কিরণ হতে পারবে—অত সহজে পরাজয় স্বীকার করবে

না অনুভা, যা সে কোনোদিন কোনো নারীর কাছেই করে নি। হোক পাঞ্চালী যতই শক্তিমতী, অনুভা দীপ্তিমতী, শ্রীমতী—বুদ্ধিমতী, ধনবতী!—কিন্তু ধনবতী কথাটা ওর মোটে ভাল লাগলো না আজ। ধন দিয়ে উদয়নকে পাওয়া যায় না, মান দিয়েও নয়—ও সূর্য, ওর আলো পাওয়া যায় নিজকে নিরাভরণ করে! নিরাবরণ করে! তাহলে কি ঐ নিরাভরণা বালবিধবার কণ্ঠেই পড়বে ওর বিজয়মাল্য? না, অনুভা এ পরাজয় স্বীকার করতে পারবে না। মনে পড়লো নন্দিতাকে বলা উদয়নের কথা—'অগ্নিময়ী বহ্নিকন্যা—মা সত্যি!'—সত্যিই। কিন্তু অনুভাও জলময়ী মেঘ-কন্যা—আকাশময়ী আলোক-কন্যা—আনন্দময়ী সঙ্গীত-কন্যা!

উত্তেজনায় উঠে পড়লো অনুভা। বাইরে মেঘ, বাতাস, বিদ্যুৎ। অভিসারিকার উপযুক্ত আবেষ্টনী;—ঐ তো ওপাশের কুঠরীটায় শুয়ে আছে উদয়ন—রাস্তার দিকের ঐ কুঠরীটায় তাকে ঢুকতে দেখেছে অনুভা। আস্তে পা-টিপে অনুভা বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে; দেখবে সে, উদয়ন কেমন ঘুমুচ্ছে।

ঘুমুচ্ছে না—পায়চারী করছে ঘরে। লণ্ঠনটা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। কাচটা ফেটে যাবে হয়তো। হোল কি ওর? কার কথা ভাবছে ও? অনুভার কথা? নাকি পাঞ্চালীর কথা—নাকি দেশমাতার কথা? ওর হাতে একখানা ছোট কাগজ—হয়তো চিঠি কারো—হয়তো ভয়ানক কোন সংবাদ!

অনুভা ভয় পেয়ে গেল প্রথমটা; কিন্তু ভয় পাবার কি এমন হয়েছে? ভয়টাকে অল্প পরেই মন থেকে তাড়িয়ে সে

অন্ধকারে দাঁড়ালো—দেখছে। যেন ছটফট করছে উদয়ন। আলোর কাছে গিয়ে আবার পড়লো চিঠিখানা! তারপর বেরিয়ে চলে গেল নন্দিতার ঘরের দিকে। দরজায় গিয়ে ডাকলো,

—মা, ওঠো—ও মা!

—উদয়? কি বাবা—? নন্দিতা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল। উদয়ন বলল,

—ঘরে ঢুকে দেখি, আমার বিছানার উপর এই চিঠি; নিশ্চয় কোনো লোক জানালা দিয়ে গোপনে ফেলে দিয়েছে—; পড়ে দেখ মা।

—তুই পড় বাবা, আমি শুনছি।

—শোন:—

স্নেহের উদয়ন,

অগ্নিমন্ত্রের পূজারী আমি—তোমাকে দেখেই চিনেছিলাম, তোমার মধ্যে ভারতের শাশ্বত পুণ্যাগ্নি আছে, তাই প্রথম দর্শনেই স্নেহ জেগেছিল অগাধ। যাঁর আদর্শে তুমি মানুষ হয়েছ, সেই শঙ্করকে আমি চিনি; তিনি গুরু আমার—তাঁকে আমার কোটি প্রণাম জানিও, আর জানিও তোমার মাকে, যাঁকে না দেখলেও চণ্ডিকার অলক্ষ্য শক্তির অস্তিত্বের মত আমি দেখতে পাই। পাঞ্চালীকে তাঁর আশ্রয়ে পাঠিয়েছি। তিনি তার অভিভাবিকা রইলেন! পাঞ্চালী আমার মানস-কন্যা—আমার অন্তরাগ্নি,—আমার দেহাস্থিগঠিত বজ্র! অসুর নিধনের জন্য তাকে তৈরি করেছি—কিন্তু উদয়ন, সেই বজ্র পরিচালন করবার ইন্দ্র নাই—অভাগী পাঞ্চালী বালবিধবা। তার বাল্যের

বিবাহের অভিশাপ তার জন্মদাতা পিতার আর ঠাকুরদার দান—আমি তখন জেলে ছিলাম।

আগামী কাল মধ্যরাত্রির পর আমাদের কয়েকজনের গলায় রজ্জুর মাল্য দেওয়া হবে—মাল্য মাল্যই; তা রজ্জুরই হোক বা ফুলেরই হোক! তফাত শুধু ফুলের মালা বন্দী করে, এ মালা মুক্ত করে দেয় জীবনকে, জীবনের যন্ত্রণাকে,—তাকে বরণ করে নেব! পাঞ্চালীকে এ খবর গোপন চিঠিতে জানালাম। সে হয়তো কাঁদবে, হয়তো কাঁদাবে না; কিন্তু আমি তাকে আজন্ম চিনি—নিজের হাতে গড়া সে আমার। তাই ভাবছি, সেই শক্তিবজ্র কখন কোথায় কি ভাবে পড়বে, আমার জানা নেই। হয়তো তার নিজের উপরই পড়তে পারে; এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে তোমাকে অনুরোধ করে যাচ্ছি, আপনার আগুনে সে যেন আপনি পুড়ে না যায়,—তাকে রক্ষা করো!

জয় হোক—মাতা ভারতের সঙ্গে তাঁর পাবকরূপী পুত্র-কন্যার জাগ্রত জীবন প্রোজ্জ্বল হোক;—পরিকীর্ণ হোক ধ্বংস আর সৃষ্টির সম্ভাবনার বীজমন্ত্রে!

আশীর্বাদক—রণধীর।

পত্রপাঠ শেষ হোল, কিন্তু কেউ কথা কইছে না—না মা, না বা ছেলে। মিনিটখানেক চুপচাপই কাটলো। অনুভা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল—এগিয়ে এল হঠাৎ। নন্দিতার যেন চমক ভাঙ্গলো—নিজকে সচেতন করে নিল নন্দিতা; বললো,

—পাঞ্চালীও নিশ্চয় চিঠি পেয়েছে; আশ্রমে ওকে কেউ দেখবার নেই উদয়, তুই ওকে আমার কাছে এনে দে।

উদয় দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। নন্দিতা গলায় জোর দিয়ে বলল এবার,

—দাঁড়িয়ে কেন উদয়?—যা, এখুনি যা; কে জানে, কি করে বসবে সে!

—এখনো রাত রয়েছে মা; এ সময় আশ্রমে যাওয়া কি ঠিক হবে?—উদয় আস্তে বলল।

—এখন ওসব ভাববার সময় নয় উদয়—তুমি ওকে এখুনি গিয়ে সঙ্গে আন এখানে।

—চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি—তাহলে রাতে আশ্রমে যাওয়ায় দোষ হবে না।—অনুভা বলল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি অনুভা উদয়নের সাহচর্যের লোভেই কথাটা বলল, কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বলল, অথবা সত্যিই পাঞ্চালীর জন্য সে চিন্তিত, ঠিক বোঝা গেল না।

—তুমি যেতে পারবে না—উদয় বলল—অনেকটা রাস্তা, পথ খুব ভাল নয়, জল-কাদা।

—তা হোক, আমি যেতে পারবো।

অনুভা ছুটে নিজের ঘরে এসে জরীর জুতোজোড়া পায়ে দিল; বলল,

—চলুন, ও যা মেয়ে,—নদীর জলেই বা ঝাঁপিয়ে না পড়ে। কথাটা সকলের মনেই সন্দেহের দোলা দিয়ে গেল। নন্দিতা অস্থির হয়ে বলল—যা উদয়, রাত আর বেশী নেই। অনুভা যদি পারে তো যাক তোর সঙ্গে।

উদয় আর প্রতিবাদ করবার সাহস পেল না। অবসরও

দিল না তাকে নন্দিতা। পায়ে জুতোজোড়া গলিয়ে নিয়েই সে বেরিয়ে পড়লো—পাশে অনুভা। কিন্তু উদয় খুব দ্রুত হাঁটছে; অনুভার অভ্যাস নাই অত জোরে হাঁটা। আস্তে বলল,

—কি আর করবে, হয়তো কাঁদছে, না-হয় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।

—কাঁদবার মেয়ে সে নয় অনুভা, সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত সে কাঁদে না।

—কি সে করতে পারে?—অনুভা প্রশ্ন করলো; একটা কাদাভরা ছোট গর্তে ওর পা ডুবেছে।

—এ্যা—দেখলে তো!—উদয়ন বললো—যাও, তুমি ফিরে যাও অনু; যেতে পারবে না।

—না—আমি যাব—যাকগে জুতো—অনুভার যেন না গেলেই নয়—বলল—কি করবে সে?

—করতে পারে একটা মহাসর্বনাশ।

—আত্মহত্যা?

—না—অত ছোট প্রাণ নয় তার; উদয়ন হাসলো একটু, কিন্তু অনুভাকে নিয়ে যেতে ওর দেরী হচ্ছে। অনুভা হাঁটতে তো পারছেই না উপরন্তু কথা কয়ে কয়ে আরো সময় নষ্ট করছে উদয়নের। অনুভা না এলেই ভাল হোত। কিন্তু অনু বলল,

—আত্মহত্যা নিশ্চয় করবে না—কিন্তু কি আর করবে? কাঁদবে ছাড়া কি আর?

—রণধীরের কাছে শুনেছি, তাঁর তৈরি চণ্ড-সংঘ এখনো গুপ্তভাবে সক্রীয়। এই পত্র সেই সংঘেরই কা[illegible] দ্বারা বাহিত নিশ্চয়। যদি তাদের কাছে গিয়ে পাঞ্চালী পৌঁছাতে পারে, তাহলে ওর নেতৃত্বে তাদের পক্ষে জেল ভেঙে রণধীরকে মুক্ত করতে যাওয়াও অসম্ভব নয়। তাতে ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠতে পারে—উদয়ন কথা বন্ধ করে চলতে লাগলো। বৃষ্টি নেমেছে ফোঁটাফোঁটা। অনুভা কেন এল ওর সঙ্গে?—উদয়ন ভাবছে। পাঞ্চালীর উপর অনুভার এই স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালবাসা কি সত্যি আন্তরিক? হয়তো তাই—হয়তো পাঞ্চালীর জন্য অনুভার অন্তর সত্যি ব্যথিত, বিচলিত হয়েছে! কিংবা—অপর একটা দিক আছে এই অনুগমনের। উদয়নের কাছে নিজের ঔদার্য প্রমাণ করা, নিজকে ঈর্ষা-বিদ্বেষের উপরে বলে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস—কিন্তু না, উদয়ন অকারণ কারো চরিত্রের কু-সমালোচনা করতে চায় না। অনুভা নিশ্চয় খুব ভালো মেয়ে; উদারমনা—মহদন্তকরণবিশিষ্টা—মহীয়সী!

—আর কতখানা? বৃষ্টিতে ভিজে ঢোল হয়ে গেলাম যে!—অনু বলল।

—পাঁচ সাত মিনিটের পথ আর—বলল উদয়ন—বৃষ্টিটা বড় অসময়ে এল দেখছি। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?—উদয়ন সস্নেহে প্রশ্ন করলো।

—তা' হোক—চলুন। পাঞ্চালী খারাপ কোনো কিছু করে না বসলেই হোল।

—না, এমন কিছু সে নিশ্চয় করবে না—উদয়ন আশ্বাস দিল—তোমার খুব ভালো লেগেছে পাঞ্চালীকে, কেমন?

—সত্যিই তো ভাল লাগবার মত মেয়ে ও!—অনুভার ঔদার্যমাখা কণ্ঠস্বর।

—এসো—উদয়ন ওর হাতখানা ধরে ছোট নালাটা পার করে দিল।

যতদূর সম্ভব ত্বরায় চলছে ওরা, উদয়ন একা থাকলে আরো ত্বরা যাওয়া সম্ভব হোত,—কিন্তু মেয়েদের আশ্রমে ভোর রাত্রে উদয়নের একা যাওয়া অন্যায়—অপরাধজনক। অনুভা সঙ্গে এসে ভালই করেছে।

আশ্রমের ফটকে এসে পৌঁছলো ওরা; ফটক খোলা। উদয়ন দ্রুত চলে এল ছোট-মার ঘরের দরজায়; ডাকলো,

—ছোটমা—ছোটমা—উঠুন একটু।

—কে? কেন?—ভেতর থেকে ঘুম-জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কিন্তু মিনিট দুই পরে দরজা খুলে বেরুলেন ছোটমা—বিস্ময়ের কণ্ঠে বললেন,

—উদয়ন? কী ব্যাপার?

—পাঞ্চালীর ঘর কোন্‌টা? তার খবর কিছু জানেন আপনি?

—না,—ছোটমা যেন একটু থমকে চিন্তা করলেন; হ্যাঁ—একটু আগে পাঞ্চালী আমায় কি যেন বলে গেল—ঘুমের ঘোরে ঠিক শুনতে পাইনি। চলতো দেখি—উনিই এগিয়ে চললেন—যেন ছুটে চললেন।

—কি হয়েছে উদয়ন?—চলতে চলতেই প্রশ্ন করলেন ছোটমা।

উত্তর শোনবার পূর্বেই পাঞ্চালীর ঘরের কাছে এসে পড়লেন ওঁরা। ঘরের দরজায় শেকল-টানা; খুলে দেখা গেল ঘরে কেউ নেই। উদয়ন অস্থির হয়ে উঠলো—কোথায় গেল পাঞ্চালী?

—তা তো জানি না বাপু! এ কী রকম শয়তান মেয়ে! আশ্রম থেকে পালিয়ে যাবে? মেয়েটা যে ব... তা ওর কথাবার্তাতেই বোঝা যেত উদয়ন।

—থামুন! উদয়ন ধমক দিয়ে উঠলো—আপনার দায়িত্ব-জ্ঞান কম দেখছি। একটু আগে আপনি বললেন যে, পাঞ্চালী কি যেন বলে গেছে আপনাকে। কী বলেছে, মনে করুন শীঘ্রি।

মনে করা সম্ভব নয় ওঁর পক্ষে। ঘুমের সময় ঘরের বাইরে থেকে কে কি বললো, তা কি মনে থাকে? উনি চুপ করে রইলেন।

—এখন কি ট্রেন আছে? অনুভা বললো—ট্রেন ধরতে যায় নি তো?

—হতে পারে—উদয়ন লাফ দিয়ে নেমে পড়লো বারান্দার নীচে। বলল,

—তুমি এখানেই থাক অনুভা; আমি স্টেশনে যাচ্ছি। যেমন করে পারি, ওকে মরণের পথ থেকে ফেরাবো! সকাল হলে তুমি বাড়ি চলে যেও।

উদয়ন বলতে বলতে গেট পার হয়ে গেল!

* * * * *

চলেছে উদয়ন—মাঠের আঁকাবাঁকা আলপথ ধরে শর্টকাট রাস্তা স্টেশনে যাবার। পাঞ্চালী নিশ্চয় এ পথ চেনে না। আগে গিয়ে উদয়ন তাকে ধরে ফেলবে; দরকার হয়, তার সঙ্গে যাবে, কিন্তু কিছুতেই তাকে ভয়ঙ্কর কিছু করতে দেবে না। জেল ভেঙ্গে যদি উদ্ধার করতে চেষ্টাই করে চণ্ড-সংঘের লোকরা, সেখানে পাঞ্চালীকে থাকতে দেওয়া নিরাপদ নয়। ইংরাজের জেল ভাঙতে যাওয়া অত সহজ হবে না—অনর্থক কতকগুলো মানুষ মরবে!—কিন্তু উদয়নের দেরী হয়ে গেছে।

প্রায় ছুটে চলেছে উদয়ন—ধানগাছগুলো পায়ে পায়ে জড়িয়ে বাধা দিচ্ছে ওর—পিছল পথটাও বাধা দিচ্ছে। পাঞ্চালীকে হয়তো আর ধরা যাবে না; ঐ তো ট্রেনের শব্দ; হ্যাঁ; উদয়ন কান পাতলো শুনতে।

বিদ্যুতের বক্ররেখা চোখ ঝলসে দিয়ে গেল যেন—পরক্ষণেই বজ্রনির্ঘোষ। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা, বাতাসের উদ্দাম গতি,—ধানক্ষেতের তরঙ্গায়িত আলোড়ন—কিন্তু ঐ দূরে স্টেশনের কাছাকাছি যেন একটা মূর্তি দেখা যায়—ঐ কি পাঞ্চালী? বিদ্যুৎটা আর একবার চমকালে উদয়ন দেখতে পাবে।

—পাঞ্চালী! ফেরো—পাঞ্চা-লী-ই!—উদয়ন যথাশক্তি জোরে ডাক দিল।

বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের হাহাকার—হারিয়ে গেল উদয়নের ডাক! কিন্তু তার গতি থামে নি—চলেছে উদয়ন—বিদ্যুৎ বেগে চলেছে! আবার বিদ্যুৎ ঝলকালো; ট্রেনখানা স্টেশনে

এসে দাঁড়িয়েছে, দেখা যাচ্ছে। ছুটলো উদয়ন। ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে পৌঁছলো প্ল্যাটফর্মের উপর—গাড়িটা তখন বেরিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে। উদয়ন এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেইখানে, যেখানটিতে পাঞ্চালী সেদিন তার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে বলছিল, 'ভারতের সর্বস্ব দিলাম আপনার হাতে—!' চমকে উঠলো উদয়ন! গাড়ির পিছনের লাল আলোটা বৃষ্টিধারায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

যেন নিয়তির রোষরক্ত আঁখিতারকা!

৭নং দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীনির্মলকুমার সোম কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ পান কর্তৃক লক্ষ্মীসরস্বতী প্রেস, ২০৯ কর্ণওআলিস স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।